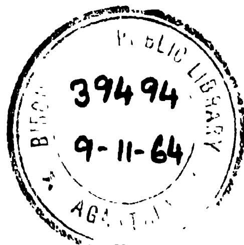
ত্রয়ীস্বরে
ভারতীয়
সংগীত

ত্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত

শ্রীসুধাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



পরিবেশক

বাক্-সাহিত্য

৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীমানিক মুখোপাধ্যায়
শিশুভারতী
সোদপুর, ২৪ পরগণা

প্রথম সংস্করণ :
শ্রাবণ ১৩৬৭, জুলাই ১৯৬০

মূল্য : আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

মুদ্রক . শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

ভূমিকা

সাধারণত শিল্পীমন হয় ভাববিলাসী—কোন কিছুর নিগূঢ়তম তত্ত্বানুসন্ধিৎসার সচেতন প্রয়াস সেখানে থাকে ঘুমিয়ে। যার দৃষ্টির ও সৃষ্টির সাধনা চলে নিবিড়তম অন্তরলোকের নির্জ্জন গুহায়, ডুবে থাকে সে ভাবসমুদ্রে, সমালোচনার ক্ষেত্র এলেই পড়ে পিছিয়ে। কেননা সৌন্দর্য্যানুভূতির বা সৌন্দর্য্য উপভোগের বাধা সৃষ্টি করে বিচার-বুদ্ধি। রসপিপাসু মনের ভাববৃত্তি বিশ্লেষণী চিন্তাধারার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম ত্রুটিবিচ্যুতির গণ্ডী পেরিয়ে সুনির্ম্মল শান্তিসুখ সমাহিত চিত্তে প্রেমমন্দিরে সুন্দরের ধ্যানে থাকে রত। আমি সেই শিল্পীগোষ্ঠীরই অন্যতম। তাই ভূমিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে আসে লজ্জা, ভয়, দ্বিধা ; কারণ যে কোন গ্রন্থের ভূমিকা রচনায় প্রয়োজন প্রচুর পাণ্ডিত্যের ও প্রভূত জ্ঞানের। বিশেষ করে সংগীত বিষয়ক স্বল্প জ্ঞান নিয়ে শাস্ত্রীয় সংগীত গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে প্রবৃত্ত হওয়া যে শুধু দুঃসাহসিকতা তা নয়, দুঃসাধ্য বলেই মনে হয়। তবুও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই গ্রন্থখানির ভূমিকা রচনার ভার গ্রহণ করেছি গর্ব্বানুভূতির দায়িত্বে।

আমার সুযোগ্য প্রিয় শিষ্য শ্রীসুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ত্রিস্বর সম্ভূত ভারতীয় সংগীত পর্য্যায়ক গ্রন্থখানি বিস্তৃত বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সুষ্ঠু সমাধানের মর্য্যাদায় অক্ষুন্ন এবং স্বকীয় চিন্তাধারার পরিচায়ক। সঙ্কলিত গ্রন্থ ও সংগ্রহীতার অভাব নেই, কিন্তু নব নব চিন্তাধারায় প্রসূত নব নব গ্রন্থ এবং নব স্রষ্টার অভাব। এই নবীন গ্রন্থকার ভারতের সুযোগ্য পুত্র সুধাংশুকুমার অভাবনীয়রূপে ভারতীভবনের সে অভাব পরিপূরণ করতে সমর্থ হয়েছেন বলে মনে হয়।

বৈদিক যুগ হতে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত যে সকল সংগীত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় রচিত হয়েছে তার প্রায় সমস্ত গ্রন্থগুলির সঙ্গেই পরিচয় ঘটেছে সামান্যরূপে এবং তা থেকে যতটুকু জ্ঞানার্জ্জনের সুযোগ পেয়েছি বা সংগীত বিষয়ে যতটুকু জেনেছি সেইটুকু নিয়েই এই দুর্জ্জয়, দুরূহ সংগীত গ্রন্থের মর্ম্মকথা প্রকাশে স্রষ্টার নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর বিশদ-দিক উদ্ঘাটন করতে প্রয়াস পাব।

কথিত হয়েছে— "বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিত গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা ॥"

আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহ থেকে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত সংগীত সম্বন্ধীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ দেখতে পাওয়া যায় তা থেকে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকেরই সমর্থন সূচিত হয়। সংগীতের ক্ষেত্রে এই মতানৈক্য এনেছে উচ্ছৃঙ্খলতা, যার ফলে সংগীত চলেছে অনির্দ্দিষ্ট পথে হারিয়ে যেতে। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'—সে পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় পথের সুরু এবং কোথায় শেষ, সে লুকিয়ে আছে চির-অন্ধকারের গুহায়ই। কারণ অতীতের সংগীত-শাস্ত্রীগণ সুস্পষ্টভাবে এমন কোন একটি ইঙ্গিত করে যাননি যার আলোকরশ্মি গুহান্ধকার দূর করে সংগীতকে দেবে মুক্তি। তাই এতকাল ধরে ভারতীয় সংগীত সেই গুহান্ধকারেই পচে মরছে। সংগীতশাস্ত্রের সব কিছুই যেন আলোছায়ার খেলা। যেখানে শাস্ত্র গিয়ে পৌছেচে সেখানে যুক্তি যায়নি, যেখানে যুক্তি গিয়েছে সেখানে শাস্ত্র নেই। তাই সাধারণ সংগীতসমাজ কোনটিকেই বিচারবুদ্ধির দ্বারা ঠিকঠিক মেনে নিতে পারেনি।

বৈজ্ঞানিক উপায়কেই অবলম্বন করে যে ভারতীয় সংগীতের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে এবং শাস্ত্রীয় সংগীতের উল্লিখিত রাগ ও রাগিণী, এ যে শুধু শাস্ত্রকারদের কল্পনাপ্রসূত নয় এ প্রমাণ অদ্যাপিও কোন গ্রন্থে মেলেনি। তাই না-জানা ও না-মানার যুগের অনেক সংগীতগ্রন্থকার এবং সংগীতশিল্পী রহস্য করে বলে থাকেন যে "নারদ" সংগীতকে নিয়ে বেশ একটি মনোরম সংসার পাতিয়ে বসেছেন। কিন্তু অনুভূতি ও অনুসন্ধিৎসা যদি বিজ্ঞানের কোঠায় পা বাড়াত তাহলে তাঁদের এ ভুল ভেঙে যেত। আমার মনে হয় আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান সুধাংশু সে ভুল ভেঙে দিতে চলেছেন।

এই গ্রন্থরচয়িতার মনস্বিতা যে শুধু সাধারণ বর্ত্তমান মানুষের ভুল ভেঙ্গে দিতেই চলেছে তা নয়, সে চলেছে আদি সংগীতস্রষ্টাদের ভিত্তিহীন সংগীতসৃষ্টির দুরপনেয় কলঙ্ক মুছে দিয়ে এক সু-উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সংগীত যে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্প, এই তিনেরই সমন্বয় তাই প্রমাণ করতে। এইখানেই তার মহত্ত্ব ও উদারতা।

বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে বৈদিকোত্তর যুগের সংগীতঋষিদের কারও মতামতকেই সে অমান্য বা ক্ষুণ্ণ করতে চায়নি। সব মত এবং সব পথই যে এক জায়গায় গিয়ে মিলেছে তাই প্রমাণ করতে চেয়েছে। এই গ্রন্থে সে বিশেষ করে প্রমাণ করেছে যে, বৈদিক যুগ উল্লিখিত উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত এই তিনটি স্বরকে অবলম্বন করেই ভারতীয় সংগীতের সৃষ্টি, বিকাশ ও শেষ হয়েছে। যদিও সমস্ত সংগীতশাস্ত্রকারগণই এই ত্রিস্বরকে স্বীকার করেছেন কিন্তু মতানৈক্য ঘটেছে স্বর নির্ণয়ে। বহু শাস্ত্রকারই বলেছেন এই ত্রিস্বর স, ম ও প, এমনকি সংগীতযুগান্তকারী শ্রীবিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে পর্য্যন্তও ঐ মতকেই সমর্থন করেছেন। কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি স্বকীয় বুদ্ধি ও বিচারের দ্বারা এইটুকু ভেবে দেখবার অবকাশ পাননি যে স, ম, প সঙ্গতিতে ভারতীয় সংগীতের সমস্ত রাগ, রাগিণীকে ধরা যায় কিনা এবং ঐ 'স, ম, প' র সাহায্যেই রাগরাগিণীর পৃথকীকরণ সম্ভব কিনা এবং এই তিনটি স্বরেরই সমাবেশে ও পরিবেশে কত সংখ্যক রাগ ও রাগিণী এবং ঠাট উদ্ভবের সম্ভাবনা হতে পারে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও যুক্তিতর্কের অবতারণা করে সমপ সঙ্গতি যে সঙ্গত নয়, সগপ সঙ্গতিই যে সংগীতের মূল সূত্র ও সংগীতের মৌলিক উদাত্তাদি ত্রিস্বর, এই গ্রন্থে এই মতই স্থাপিত হয়েছে।

এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাঠ করে ও বিশদভাবে আলোচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, গ্রন্থরচয়িতা বহু ধৈর্য্য ও সংযমের সহিত গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুসমূহকে বিশদরূপে সুপরিস্ফুট করে তুলে দুর্ব্বোধ্য দুরূহ সংগীতশাস্ত্রের একটি বিশিষ্ট দ্বার উদ্‌ঘাটন করে সংগীতজ্ঞ...ের মঙ্গলসাধন করেছেন। বিশেষ করে "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংগীত" এই তৃতীয় অধ্যায়ে স্বর-সৃষ্টির রহস্য ও কম্পনসংখ্যার মাধ্যমে স্বরপ্রকৃতি, বিকৃত স্বর ও প্রকৃত স্বরের প্রকৃত রূপ ও কম্পনসংখ্যার অনুপাতে প্রাচীন যুগে তিনটি স্বরের স্থান-নির্ণয় এবং উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত এই তিনটি স্বরই যে স, গ, প এবং কম্পন-সংখ্যার অনুপাতে মাতৃকার বিশ্লেষণ ও তাহার গুণাবলী প্রকাশ করেছেন, ইহা একটি অভাবনীয় সৃষ্টি। স্বরাধ্যায় হতে আরম্ভ করে প্রতিটি অধ্যায়ের বিচার-পদ্ধতি দেখে আমি বিস্ময়াভিভূত ও চমৎকৃত হয়েছি। বহু গবেষণা করে, প্রাণান্ত পরিশ্রম করে বৈদিক যুগ থেকে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত যত সংগীতগ্রন্থ বেরিয়েছে তার প্রতিটি গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে

শ্রীমান সুধাংশু যে এই গ্রন্থখানি রচনা করেছেন—এর পেছনে রয়েছে মঙ্গলময়ের মঙ্গলেচ্ছা ও নবযুগের সংগীতের নবারুণালোকে উদ্ভাসিত এক নব প্রভাতের নব অধ্যায়।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংগীতকে উপস্থাপিত করবার মূলমন্ত্র সুধাংশুকুমার কোথা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছেন এবং এর উৎস যে কোথায় তার একটু পরিচয় না দিলে অস্বীকৃতির অপরাধ এসে যায়। তাই অকুণ্ঠ হৃদয়ে আমি বলতে চাই, এই গ্রন্থোক্ত মাতৃকা গঠন প্রণালীর তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন পাণিহাটি নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কাছ থেকেই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির প্রথম আলোকপাত হয়েছিল সেখান থেকেই, একথা আমি জানি। তাই পথপ্রদর্শক হিসাবে তাঁকেও জানাই আমার শ্রদ্ধা। সর্ব্বশেষে কামনা জানাই মঙ্গলময়ের কাছে তাঁর মঙ্গলেচ্ছায় যেন সুধাংশু শতায়ু হয়ে সংগীতসম্বন্ধীয় শত শত গ্রন্থ রচনা করে সংগীতশিল্পীদের মঙ্গলসাধন করেন।

টালিগঞ্জ, কলিকাতা
১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৭

তারাপদ চক্রবর্ত্তী

গ্রন্থকারের নিবেদন

প্রাচীন যুগ হতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল বিষয়ে মানব মনের চিরন্তন অনুসন্ধিৎসা তাকে নিত্য নূতন তথ্য আবিষ্কারের পথে অনুপ্রাণিত করেছে সংগীত তার মধ্যে অন্যতম। সংগীত মানব মনের বিভিন্ন অনুভূতিকে প্রকাশ করার মাধ্যম স্বরূপ। সৃষ্টির প্রেরণায় স্রষ্টা হয় প্রকাশিত। অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশের কমল কোরকটি দল মেলে রূপ পায়, প্রাণ পায় স্রষ্টার নিজস্ব সৃষ্টিতে। আর সৃষ্টির সেই অনবদ্য রূপ দেখে মানব মনে জাগে জিজ্ঞাসা। সন্ধিৎসু মন তাই খোঁজে সৃষ্টিরহস্য। অদম্য জ্ঞানপিপাসা তাকে পথ দেখায় যুগযুগ ধরে। সংগীতশাস্ত্রও এমনি মধুর, বিশাল এবং রহস্যপূর্ণ। প্রাচীন যুগের সংগীতসাধকরা এই শাস্ত্রকে গুহ্য হতে গুহ্যতর বলে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় রাগরাগিণীর স্রষ্টারা এই রাগরাগিণীগুলিকে এমনি কৌশলে সৃষ্টি করে রেখে গেছেন যে এর গুহ্যতত্ত্ব অনুসন্ধানে সকল কালে সকল সময়ে মানব মনে একটা আকুল পিপাসা জেগে থাকবে। বিভিন্ন পথে বিভিন্ন দিকে অনুসন্ধিৎসু প্রাণ তার জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে বেড়াবে, জানতে চাইবে এই বিশাল সংগীতশাস্ত্রের মূল ভিত্তিকে।

বহু বৎসর যাবৎ অসীম আগ্রহে এবং আকুল পিপাসায় বিভিন্ন সংগীত-শিল্পী, গুণী, জ্ঞানী, সাধু এবং সন্ন্যাসীগণের সমধুর সান্নিধ্যে যে শিক্ষা ও জ্ঞান আহরণ করেছি তাহা বহুলপরিচিত এবং স্বল্পপরিচিত ব্যক্তিসকলের একান্ত শুভেচ্ছা এবং আগ্রহ ব্যতীত সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করা কোন দিনই সম্ভব হোত না।

ইংরাজী ১৯৪১ সালে অঙ্কুরিত এই বিষয়বস্তুটির বিশদ আলোচনা হয়েছিল সংগীতগুরু সংগীতনায়ক শ্রীকেশব গণেশ ঢেক্‌নে মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ মৌলিক তথ্য হিসাবে স্বীকার করেন এবং প্রকাশ করার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের কিয়দংশ, ১৩৬১ সালের মাঘ সংখ্যা "ভারতবর্ষে" উচ্চাঙ্গ সংগীতের রূপ ও রূপান্তর নামে প্রকাশিত হয়।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের গভীরে নিহিত কতগুলি প্রাচীন তথ্যাবলম্বনে লিখিত এই গবেষণামূলক মৌলিক প্রবন্ধটির একটি সংক্ষিপ্তসার, যা স্বরত্রয়ের

ভিত্তিতে রাগরাগিণীর পৃথকীকরণ ও ধারাবাহিকতা নামে অভিহিত, সংগীত নাটক আকাদমীর অধ্যক্ষ বিশেষ আলোচনার পর ইংরাজী ২।৪।৫৬ তারিখে গবেষণামূলক প্রবন্ধ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ৮।২।৬১ তারিখে ঐ সংক্ষিপ্তসার, গবেষণাগারের অভাবের কথা জানিয়ে, দুঃখের সহিত ফেরৎ পাঠান। ঐ প্রবন্ধই বর্ত্তমানে গ্রন্থাকারে লিখিত "ত্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত"।

আমার বহুচেষ্টালব্ধ এই বিষয়ের দ্বারা সংগীত-রস-পিপাসু অনুসন্ধিৎসু অন্তরের প্রশ্নের যদি সামান্য সমাধানও সম্ভবপর হয় তবেই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠবে।

এই দুরূহ সংগীত শাস্ত্র আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে বহু প্রাচীন এবং আধুনিক গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে, বলাই বাহুল্য আমি যথাস্থানে এবং যথাসম্ভব তাহা উল্লেখ করেছি।

অনেক জটিল তত্ত্ব মীমাংসার জন্য যাঁরা আমাকে প্রভূত সহায়তা করেছেন, বিশেষ করে পাণিহাটি নিবাসী শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়, এবং যাঁদের অনুপ্রেরণায় এই গ্রন্থপ্রকাশে সচেষ্ট হয়েছি, তাঁদের প্রত্যেককে এবং আমার গুরুস্থানীয় শ্রদ্ধাভাজনদের নিকট আমার অকুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

শ্রীরবি ঘোষ, কন্যাসমা ছাত্রী শ্রীমায়া দেবী এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে এই গ্রন্থ প্রকাশ করবার জন্য বিশেষরূপে সাহায্য করেছেন এবং প্রীতিভাজন শ্রীমান মানিক মুখোপাধ্যায় সুষ্ঠু প্রকাশনার জন্য যেরূপ চেষ্টা এবং পরিশ্রম করেছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত।

পরিশেষে "নাভানা"র কর্মী এবং পরিচালকবৃন্দের সহৃদয় সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সোদপুর
আষাঢ় ১৩৬৭

সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আশীর্ব্বাণী

কলিকাতা লালজী সংগীত মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, অল বেঙ্গল ম্যুজিক কনফারেন্সের উপদেষ্টা সমিতির সদস্য, অল বেঙ্গল ম্যুজিক কনফারেন্স, ন্যাশন্যাল এসোসিয়েশন প্রতিযোগিতা এবং কলিকাতা য়্যুনিভার্সিটী ইন্‌স্টিট্যুট আন্তঃ-মহাবিদ্যালয় প্রতিযোগিতা সমূহের বিচারক, 'রাগ ভূপালী', 'রাগ ভিন্ন ষড়জ', 'ঠুম্‌রি তরঙ্গিণী' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, সংগীত-নায়ক পণ্ডিত কে. জি ঢেক্‌নে মহাশয় 'ত্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীতে'র পাণ্ডুলিপি পাঠ করে নিম্নোদ্ধৃত আশীর্ব্বাণী দিয়েছিলেন :

112 Ashutosh Mukherjea Road
Bhowanipore, Calcutta.
Dated 2nd May 1941.

Music is both art and science. Science establishes the principles and art produces the same on regular lines. Music has a system, science, method and accurate applications both in theory and practice without which no artist could execute the art based on the philosophy of notes in well balanced a way.

Sri Sudhangshu Kumar Banerjee, an ardent student of mine, has studied the art and science of music with me scientifically, systematically, methodically and accurately, for the last eight years and accquainted with the Indian classical music of all spheres of Dhrupad, Kheyāl, Tārānā and all other branches of classical music.

Apart from his musical qualifications he has got an inquisitive brain which has made him to go deeper into the realities of notes and brought out a theory of notes peculiar to the existing system in force.

From cursory examinations of his manuscript which he has shown me in the early part of the year 1941 I could see that he has spent a great deal of time and thought in its

preparations. His investigation, which to me is new, gives great importance to the three notes Sā, Gā, Pā, and establishes the harmonic musical science on the most mathematically systematic basis, his system seems to be an improvement over it. In classical music he has struck to his work in organising it over a long period of years—1934.

Under my advice he has contacted various renowned Ustāds of the day to specialise him for higher study of music. He has got himself benefited in this attempt from the personal contact of no less personalities than Ustād Faiyaz Khan of Baroda, Gharoana of Ostad Mastaque Hossin of Rampore, Sri Krishna Rao Sankar Pandit of Gwalior and Sri Upendra Narayan Ray of Benaras.

Besides this he had been studying classical music from the very tender age with the local Ustāds of fame. He has got special keenness in research works than the actual demonstrations of music.

The work which he has prepared, to my knowledge seems very practical and sound and needs careful examinations by the authorities in this branch of science and encourage him at which he is so richly deserves.

For all his qualifications, I have the great pleasure to confer upon him the honour of "Sangeet Sampanna" of the Lalji Music College, Calcutta.

I wish him a great success in his musical career.

গ্রন্থসূচী

উৎসর্গ

সুমধুর এবং রহস্যপূর্ণ সংগীতশাস্ত্রের মূলভিত্তিকে অনুসন্ধান করার আকাঙ্ক্ষা যাঁহাদের শিক্ষায় এবং আশীর্ব্বাদে চরিতার্থ হইয়াছে তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যে এই পুস্তক অর্পণ করিলাম।

সোদপুর
বৈশাখ ১৩৬৭

সুধাংশু

স্বরাধ্যায়

যোগশাস্ত্রের মতে আমরা জানিয়াছি, সংগীতের প্রাথমিক চিন্তা স্বরজ্ঞান ; স্বর সম্বন্ধে কথিত আছে "স্বরে বেদাশ্চ শাস্ত্রাণি, স্বরে গন্ধর্ব্ব উত্তমঃ স্বরে সর্ব্বঞ্চ ত্রৈলোক্যং স্বরে আত্মা স্বরাপকঃ"। স্বরে বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রসকল এবং গন্ধর্ব্ববেদ উৎপন্ন। এই ত্রিলোকও স্বরে প্রতিষ্ঠিত। স্বর হইতেই আত্মার স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। এই স্বরজ্ঞানতত্ত্ব আহরণ করিতে হইলে প্রথমে স্বরের উৎপত্তি কি ভাবে হইল জানা প্রয়োজন। স্বর বলিতে অবশ্যই সংগীতে ব্যবহৃত স্বরের কথাই বলিতেছি। শাস্ত্রে লিখিত আছে প্রথমে 'ধ্বনির' সৃষ্টি হয়, যাহাকে আমরা 'প্রণব' নামে অভিহিত করি। এই 'প্রণব' ধ্বনিকে 'অনাহত' ধ্বনিও বলা হইয়া থাকে। এই 'ধ্বনি' যখন সূক্ষ্ম পদার্থে আঘাত করে তখন তাহা 'নাদ' নামে কথিত হয়। স্থূল পদার্থে আঘাতজনিত যে শ্রুতিমধুর ধ্বনি উত্থিত হয় তাহাই 'স্বর' নামে অভিহিত। আকাশে মেঘের উৎপত্তি হইলে এবং তাহা বায়ুর দ্বারা চালিত হইলে তাহাদের পরস্পর ঘর্ষণে যে ধ্বনির উৎপত্তি হয় তাহাকেই আমরা নাদ বলি। নাদের প্রকার দুইটি—একটি সুকৃতি অর্থাৎ বর্ণাত্মক, অপরটি অকৃতি অর্থাৎ ধ্বন্যাত্মক। যেহেতু নাদের উৎপত্তি আকাশ হইতে এবং আকাশ সর্ব্ব ঘটেই পরিব্যাপ্ত নাদও তেমনি অনন্ত ও সর্ব্বপরিব্যাপ্ত। মানবকণ্ঠেও নাদের অনন্ত সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য আছে এবং নানা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিভাগও আছে। নাদের তিন প্রকার ভেদ পাই। জাতিভেদ রূপভেদ এবং গুণভেদ অর্থাৎ উচ্চনীচ ভেদ। আহত এবং অনাহত —নাদের এই দুই প্রকার ভেদ পাওয়া যায়। আহত অর্থে যাহা বক্ষ কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থান হইতে উচ্চারিত এবং অনাহত নাদ সাধারণ মানবশ্রুতিগোচর নহে।

ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে সংগীতশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে সংগীতের মূল ভিত্তি নাদ, যাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাদের দেহের নাভি-মূল হ'তে বায়ুর সাহায্যে উত্থিত ধ্বনিই নাদ। 'নারদসংহিতা'য় লিখিত আছে 'ন নাদেন বিনা গীতং স্বরং'। পূর্ব্বতন নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের মতে আকাশই একমাত্র 'শব্দ'গুণসম্পন্ন। তাঁহারা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও গুণাবলীবিশিষ্ট বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একমাত্র আকাশই শুধু শব্দগুণবিশিষ্ট। মরুৎ বা বাতাস শব্দ ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট। তেজ বা অগ্নি শব্দ, স্পর্শ ও রূপগুণ সমন্বিত। অপ্ বা জল রূপ, রস, শব্দ ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট; এবং ক্ষিতি বা মাটি রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধগুণবিশিষ্ট। যে কোন উপায়েই হউক ঘাত-প্রতিঘাতে শব্দের উৎপত্তি। শব্দ বায়ুর তরঙ্গ আশ্রয়ে বাহিত বা চালিত। সেই শব্দপরম্পরা যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম পর্য্যায়ে নিয়ন্ত্রিত হয় তখনই তাহা সুর হইয়া উঠে।

বেদোক্ত সংগীতের আলোচনায়ও স্বর সম্বন্ধে একই তথ্য জানিতে পারি। সংগীত অর্থে যন্ত্রসংগীত, যথা: বীণা বেণু ইত্যাদি এবং কণ্ঠসংগীত অর্থে মানবকণ্ঠ হইতে গীত সংগীতের কথাই জানিতে পারি। নৃত্য বা তালবাদ্য যদিও সংগীতের শ্রেণী হিসাবে গণ্য তথাপি তাহার আলোচনা এই পুস্তকের বিষয়বস্তু নহে।

বেদ চারিটি—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব। বেদ যেমন চারিটি, উপবেদও তেমনি চারিটি প্রচলিত। সংগীত কেবলমাত্র সামবেদেই পাওয়া যায়। এই সামবেদেরই উপবেদ গন্ধর্ব্ববেদ।

গন্ধর্ব্ববেদ বলিতে আমরা গন্ধর্ব্বগণের ইতিবৃত্ত সমন্বিত এক বেদ গ্রন্থ বলিতে পারি। গন্ধর্ব্ব বলিতে আমরা সংগীতব্যবসায়ী, সংগীত অনুরাগী এবং সংগীতে পারদর্শী এক প্রাচীন মানবগোষ্ঠীকে মনে করিতে পারি। ইহারা দেবসভাগায়ক এইরূপ আমাদের

প্রচলিত ধারণা ও কিম্বদন্তীও বটে। ঋগ্বেদে ১০।১৩৯।৫ শ্লোকে কথিত আছে গন্ধর্ব্ব দুই প্রকার। এক প্রকার 'দিব্য' অপর প্রকার 'মর্ত্ত্য'। যাঁহারা কল্পের আদিতে ছিলেন তাঁহারাই দিব্য এবং যাঁহারা পুণ্যবলে গন্ধর্ব্বত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাঁহারাই মর্ত্ত্যগন্ধর্ব্ব নামে পরিচিত। এই দিব্যগন্ধর্ব্ব এগারো প্রকার এবং তন্মধ্যে আটটির নাম প্রচলিত। ইঁহাদের এইরূপ নাম পাইয়াছি। যথা— 'হাহা', 'হুহু', 'চিত্ররথ', 'হংস', 'বিশ্বাবসু', 'গোমায়ু', 'তুম্বুরা' এবং 'নন্দী'। ইঁহাদের নামীয় বংশ অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত আছে (জটাধর —টীকাকার)। "বিষ্ণুপুরাণে" কথিত আছে যে ব্রহ্মা হইতেই ইহাদের উৎপত্তি এবং গান করিতে করিতে ইহাদের জন্ম বলিয়া ইঁহারা গন্ধর্ব্ব নামে অভিহিত। ইঁহাদের বাসস্থান "গুহ্যলোক" ও "বিদ্যাধর" লোকের মধ্যস্থলে। 'ধমন্তো গাং সমুৎপন্না গন্ধর্ব্বাস্তস্য তৎক্ষণাৎ স্তেনতে দ্বিজঃ' (বিষ্ণুপুরাণ)। ইঁহারা গো, (গম্য) গীত, ধমন অর্থাৎ উচ্চারণ করিতে করিতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া গন্ধর্ব্ব। হরিবংশপুরাণে আবার অন্য মতও পাওয়া যায়। বাহুল্য বোধে আর তাহা লিখিত হইল না।

বেদোক্ত সংগীতের শ্রেণীবিভাগকালে দুই প্রকার সংগীতকেই বুঝাইবে। 'মার্গ' এবং 'দেশী', মার্গ অর্থাৎ অন্বেষণ, ব্রহ্মাদি বেদ অন্বেষণ করিয়া যে সংগীত তৎকালীন সমাজের উপকারের নিমিত্ত প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। দেশী সংগীত অর্থে যাহা দেশ কাল পাত্র-ভেদে বিভিন্ন প্রকারে গীত হইয়া থাকে। এই স্থলে স্বভাবতই একটি প্রশ্ন মনে জাগে যে মার্গ সংগীতকে বৈদিক সংগীত বলা যাইবে কিনা এবং কোন্ কোন্ অলংকার ও গুণাবলী মার্গ সংগীতের বিশেষত্ব ?

মার্গ সংগীত বলিতে কি প্রকারের সংগীত অর্থাৎ উচ্চাঙ্গ সংগীতের কোন্ শ্রেণীবিভাগকে বোঝা যাইবে তাহা লইয়া বহু

মতভেদ আছে এবং তাহার কোনও রূপ বিজ্ঞানসম্মত মীমাংসা পাওয়া যায় নাই। যদিও অধুনা সাধারণ উচ্চাঙ্গ সংগীতকেই অনেকে মার্গ সংগীত নামে অভিহিত করিয়াছেন বস্তুত প্রচলিত উচ্চাঙ্গ সংগীতকে মার্গ সংগীতের পর্য্যায়ভুক্ত করা উচিত নহে। যদিও বাদী, সম্বাদী, বিবাদী, অনুবাদী প্রভৃতির যথাপ্রয়োগে এবং আলাপ, তান, গমক, মূর্চ্ছনা, স্বরবিস্তার ইত্যাদির (অলংকার অধ্যায়) প্রয়োগের দ্বারা, ও রাগরাগিণীর রূপপ্রকাশকালীন প্রায় মার্গ সংগীতের ধারাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে তথাপি এই অধুনা-প্রচলিত উচ্চাঙ্গ সংগীতকে মার্গ সংগীত আখ্যা দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।

সামগান হইতেই মার্গ সংগীতের উৎপত্তি। বৈদিক পূর্ব্বযুগে না হইলেও বৈদিক যুগ হইতেই আমরা ইহার পরিপূর্ণ বিকশিত রূপ পাইয়া থাকি। ঋক্‌ছন্দে অর্থাৎ ঋগ্বেদের শ্লোকে ও গাথা-গুলিতে সুরারোপ করিয়া সামগানের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সময়ের ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি হইতে আমরা গাথা, গান, উদ্‌গান উদ্‌গীত, সাম, স্তোভ, স্তোম, উহ, উহ্য ও রহস্য গানের নামের উল্লেখ পাইয়াছি। সামগানের মাধ্যমে আমরা গ্রামগেয় গান ও অরণ্যগানের পরিচয় পাইয়াছি। গ্রামগেয় গান এবং অরণ্যগেয় গান কাহাকে বলে? টীকাকার মধুসূদন স্বামী বলিয়াছেন, 'বেদানাং মধ্যে সাম মাধুর্য্যেনাতিরমণীয়ম্‌, গীতিরূপা মন্ত্রাঃ সামানি'। গীতায় আছে 'বেদানাং সামবেদোঽস্মি'। গীতির উদ্দেশ্যেই গেয় ঋক্‌গুলি সামবেদে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন, 'সামবেদ পাঠের পর অন্য বেদ পাঠের প্রয়োজন হয় না'। সামবেদের সম্পূর্ণ গ্রন্থটি চারিটি ভাগে বিভক্ত, যথা—গেয়, আরণ্যক, উহ উহ্য। গেয়গীতির অপর নাম গ্রামগেয় গান। কেহ কেহ এখনও ইহাকে বেয়গান অর্থাৎ দ্বিতীয় গান বলিয়া

থাকেন। ব্রহ্মযজ্ঞের মন্ত্র আরণ্যক গানে আছে সুতরাং আরণ্যক গান অধ্যয়ন করিয়া পরে সমর্থ হইলে গেয়গান অধ্যয়ন করা হইত। সেই কারণেই গেয়গানকে দ্বিতীয় গান বলা হইয়াছে। সামবেদের আরণ্যক, সামসংহিতার অন্তর্গত আরণ্যক, আর্চ্চিক এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ঋক্ অবলম্বনে যে সমস্ত সাম গীত হইয়াছে তৎসমুদয়ই প্রপাঠক। আরণ্যক, আর্চ্চিক ও তদবলম্বনে গীত আরণ্যগানই সামবেদের আরণ্যক। আরণ্যক গান দ্বারা অরণ্যের নির্জনতায় কণ্ঠসাধনা করিয়া উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত সহযোগে সামগানের রীতি আয়ত্ত করা হইত। যাঁহারা সমগ্র বেদ অধ্যয়নে অসমর্থ তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য কেবল মাত্র আরণ্যগান অধ্যয়ন করিতেন যেহেতু এই আরণ্যগানে বা আরণ্যকেই ব্রহ্মযজ্ঞের মন্ত্র আছে। লোকসমাজের মনোরঞ্জন করিবার জন্যই গ্রামগেয় গান অভ্যাস করিবার রীতি নিরূপণ করা হইয়াছিল। মার্গ সংগীতের উৎপত্তি এবং প্রসার কিরূপে হইয়াছিল সেই আলোচনা প্রসঙ্গে আরণ্যক গান ও গ্রামগেয় গানের তাৎপর্য্য জানা যাইবে। আমরা এইটুকু শুধু জানিয়াছি যে, মার্গ ও দেশী উভয় প্রকার সংগীতই গ্রামগেয় গান হইতে সৃষ্ট এবং আরণ্যক গানই বৈদিক তথা সামগান। মনে হয় যখন উভয় প্রকার গান অর্থাৎ গ্রামগেয় এবং আরণ্যক সামবেদান্তর্গত তখন মার্গ এবং দেশী এই উভয় প্রকার সংগীতরীতিকেই বেদোক্ত সংগীত আখ্যা দেওয়া যাইবে।

সামিক যুগের পূর্ব্বে অর্থাৎ সামবেদের যুগের পূর্ব্বে আমরা পাই আর্চ্চিক এবং গাথিক যুগ। আর্চ্চিক যুগে মাত্র একস্বর সাহায্যে গান করা হইত। ইহা ঈশ্বরচিন্তন, অভিষেককরণ, ঐক্য, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োগ করা হইত। বৈদিক স্বরের নাম প্রথম, লৌকিক স্বরের নাম মধ্যম বলিয়া কথিত।

গাথিক যুগে দুইটি স্বরের সাহায্যে গান করা হইত। ইহা শিবচিন্তন, ধ্যানকরণ, ভজনকরণ, প্রার্থনাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োগ করা হইত। বৈদিক স্বর প্রথম ও ক্রুষ্ট, লৌকিক স্বর মধ্যম ও পঞ্চম বলিয়া কথিত।

সামিক জাতির গান তিন স্বরে গীত হইত। ইহা মায়াবোধ, জীববোধ, উপদেশ, শিবচিন্তন, বৈদিক মন্ত্র, মন্ত্রজাগরণ, আদি প্রসঙ্গ, বৈদিক আশীর্ব্বচন ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োগ করা হইত। বৈদিক স্বর প্রথম, ক্রুষ্ট ও চতুর্থ। লৌকিক স্বর মধ্যম, পঞ্চম ও ষড়জ বলিয়া কথিত।

স্বরান্তর জাতির গানে চার স্বর প্রয়োগ করা হইত। আনন্দ, বিবাহ, বন্ধন, সাবধানতা, মঙ্গলারতি, আদি প্রসঙ্গ বিষয়ে প্রযুক্ত হইত। বৈদিক স্বর প্রথম, ক্রুষ্ট, চতুর্থ, দ্বিতীয়। লৌকিক স্বর মধ্যম, পঞ্চম, ষড়জ ও গান্ধার বলিয়া কথিত।

ঔড়ব জাতির গানে 'পাঁচটি' স্বর ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতে সব রসই সৃষ্ট হয়। বৈদিক স্বর প্রথম, ক্রুষ্ট, চতুর্থ, দ্বিতীয় ও তৃতীয়। লৌকিক স্বর মধ্যম, পঞ্চম, ষড়জ, গান্ধার এবং ঋষভ বলিয়া কথিত।

ষাড়ব জাতির গানে ছয়টি স্বর ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতেও সব রসই সৃষ্টি করা যাইত। বৈদিক স্বর প্রথম, ক্রুষ্ট, চতুর্থ, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও অতিস্বার্য্য। লৌকিক স্বর মধ্যম, পঞ্চম, ষড়জ, গান্ধার, ঋষভ ও নিষাদ বলিয়া কথিত।

সম্পূর্ণ বা সপ্তস্বর্য্য গানের প্রয়োগে সাতটি স্বরই ব্যবহৃত হইত। ইহার দ্বারাও সব রস সৃষ্টি করা যাইত। বৈদিক স্বর প্রথম, ক্রুষ্ট, চতুর্থ, দ্বিতীয়, তৃতীয়, অতিস্বার্য্য ও মন্দ্র। লৌকিক স্বর মধ্যম, পঞ্চম, ষড়জ, গান্ধার, ঋষভ, নিষাদ ও ধৈবত বলিয়া কথিত।

সামিক যুগ হইতেই স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব, সম্পূর্ণ বা সপ্তস্বর্য্য

গানের বিকাশ হইয়াছিল। এই রীতিগুলির গান ধারাবাহিক, নিয়মানুগ, সুসংবদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় ছিল। মার্গ সংগীতের সময় হইতেই দেশী সংগীতের প্রচলন হইয়াছিল। দেশী সংগীত বলিতে যে সংগীত দেশ, কাল, পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লোকের মনোরঞ্জনহেতু গীত হইত এবং নিয়মানুগ ধারাবাহিকতায় সুসংবদ্ধ ছিল না। প্রাচীন যুগে দেশী সংগীতে যদিও শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, জাতি ইত্যাদির প্রয়োগ করা হইত তথাপি তাহাদের ধারাবাহিকতা ও নিয়ম ছিল না। আমরা বর্ত্তমানে প্রচলিত সমস্ত অলংকার প্রয়োগ করিলেও তাহাতে ধারাবাহিকতার এবং নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব পাইতেছি।

পণ্ডিতগণের মতে দুই একজন বলিয়াছেন যে, যে গান আলাপ, তান, লয়, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি অলংকারের সমাবেশে সুসংবদ্ধ ও ধারাবাহিকতায় অক্ষুণ্ণ তাহাই মার্গ সংগীত এবং ইহার অভাবেই হইবে দেশী সংগীত। এক কথায় মার্গ সংগীত বলিতে নিয়মানুগ সংগীত, যাহা বৈদিক সংগীতের ধারা অনুসরণ করিয়া রচিত। সাম-গানের মার্গকে অর্থাৎ স্বরমাধুর্য্য ও গতিকে অনুকরণ করিয়া মার্গ সংগীত সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়াই ইহাকে বৈদিক সংগীত বলা যাইবে। অনুরূপভাবে দেশী সংগীতকেও বেদোক্ত সংগীত বলা যায়।

প্রথমেই বলা হইয়াছে সাত স্বর প্রয়োগে সামগানের যুগেই গান করা হইত এবং সামগানেও তাঁহারা সাতটি স্বরই প্রয়োগ করিয়াছেন। সেই সাত স্বরের নাম ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র ও অতিস্বার্য্য। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম। নারদী শিক্ষায় আমরা বৈদিক স্বরনাম পাইয়াছি, যথা—অভিনিহিত, প্রাশ্লিষ্ট, জাত্য, ক্ষৈপ্র, পাদবৃত্ত, তৈরোব্যঞ্জন ও তৈরবিরাম। মাণ্ডুকী শিক্ষায় আবার অন্য প্রকার নামও পাওয়া যায়, যথা—বিনর্দি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত, মৃদুশ্লক্ষ্ম,

ক্রৌঞ্চ ও অপধ্বাস্ত। দেশী সংগীতেও এই সময়েই আমরা সাতস্বরের প্রচলন পাইয়াছি। তাহাদের নাম ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ।

দেশী সংগীতের বহুল প্রচলন ও জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া এবং সামগানের আয়াসসাধ্য রীতি লোপ পাওয়ার আশঙ্কায় পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের মার্গ সংগীতের স্বরনাম ত্যাগ করিয়া মার্গ সংগীতে অর্থাৎ সামগানে দেশী সংগীতের প্রচলিত স্বরনাম গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই স্বরসমাবেশপদ্ধতি বর্ত্তমানে প্রচলিত স, র, গ, ম, প, ধ, ন দেশী সংগীতে প্রচলিত লৌকিক স্বরের আদ্যক্ষর।

দেশী সংগীতের উল্লিখিত স্বরসমূহ, আমরা বর্ত্তমানে যাহা ব্যবহার করিতেছি, কথিত আছে তাহা ভিন্ন ভিন্ন জীবকণ্ঠধ্বনি হইতে অনুকরণ করা হইয়াছে। এই প্রবাদ কতদূর প্রামাণ্য তাহা বলা কঠিন।

উক্ত আছে,

"ষড়্জর্ষভশ্চগান্ধারোমধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা
ধৈবতশ্চানিষাদশ্চস্বরসপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ময়ূরোবৃষভশ্ছাগ ক্রৌঞ্চকোকিলবাজিনঃ
মাতঙ্গশ্চক্রমেনাহু স্বরানেতান্ সুদর্গমান"।

ময়ূর হইতে 'স', বৃষভ হইতে 'র', ছাগ হইতে 'গ', ক্রৌঞ্চ হইতে 'ম', কোকিল হইতে 'প', অশ্ব হইতে 'ধ', হস্তী হইতে 'ন' স্বরকে অনুকরণ করিয়া স্বরসৃষ্টি হইয়াছে।

আমাদের দেহের কোন্ কোন্ স্থান হইতে স্বর সমুদয় উচ্চারিত হয় তাহারও স্থান প্রাচীন যুগের মনীষীরা নিরূপিত করিয়াছেন। কথিত আছে "নাসাকণ্ঠমূরস্তালুজিহ্বাংদন্তাশ্চ সংস্পৃতষড়্জভ্যসংজ্ঞায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ ষড়্জ ইতি স্মৃতঃ"। যে ধ্বনি নাসা, কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, দন্ত এই ছয় স্থান হইতে উৎপন্ন তাহাকে আমরা সংগীতের আদ্যক্ষর 'স' বলি।

"বায়ু সমুদ্গতোনাভৈঃ কণ্ঠশীর্ষ সমুদ্গতোনদত্বয় ভবদ্ যস্মাতে নৈষ ঋষভস্মৃতঃ"। যে ধ্বনি নাভি হইতে উৎপন্ন বায়ুর সাহায্যে নিম্নাভিমুখী হইয়া পরে কণ্ঠে এবং মস্তিষ্কে গমন করে তাহাকে আমরা 'র' বলি।

"তদাহি বায়ু সমুদ্গতো নাভৈঃ কণ্ঠশীর্ষ সমাহতঃ নানাগন্ধবহ পুণ্যো গান্ধারস্তেন হেতুনা।" যে ধ্বনি নাভি হইতে উৎপন্ন বায়ুর সাহায্যে নাভি হইতে উঠিয়া কণ্ঠে এবং শিরে আশ্রয় লয় এবং যাহা হইতে স্বরান্তরসমূহের গন্ধাদি পাওয়া যায় তাহাকেই 'গ' বলিয়া থাকি।

"তথাহিতদ্বেদেবোত্থিতো বায়ুরুরকণ্ঠসমাহৃতঃ নাভিপ্রাপ্তমহা নাদোমধ্যমস্তেনস্মৃতঃ"। নাভি হইতে উত্থিত বায়ু কণ্ঠ স্পর্শ করিয়া বক্ষে অবস্থান করিয়া যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তাহাকেই আমরা 'ম' বলিয়া থাকি।

"তথাহিবায়ুসমূদ্গতো নাভিরুরহৃৎকণ্ঠে মূর্দ্ধসুবিচরণপঞ্চমস্থান-প্রাপ্তাপঞ্চম উচ্যতে"। নাভি হইতে উৎপন্ন বায়ু নাভি, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, তালু, শির ও বক্ষ এই পঞ্চস্থানে বিচরণ করিয়া নিঃসরণকালে যে ধ্বনি বা স্বরের সৃষ্টি করে তাহাকেই আমরা 'প' বলিয়া থাকি।

"তথাহি অভিসন্ধয়তে যস্মাৎ স্বরাং স্তৈনৈষ ধৈবত্তঃ"। নাভি হইতে উৎপন্ন বায়ু কণ্ঠ, শির ও তালুতে আঘাত করিয়া ললাটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বা ধৃত হইয়া যে ধ্বনি সৃষ্টি করে সেই ধ্বনি বা স্বরকেই আমরা ধৈবত বা 'ধ' বলিয়া থাকি।

"সতুতারৎপ্রধানাত্বাৎ ললাটে ব্যবতিষ্ঠতো নিষাদান্তি স্বরাঅস্মি নিষাদস্তেন হেতুনাং"। নাভি হইতে উৎপন্ন বায়ু কণ্ঠে, তালুতে, পরে শিরে আঘাত করিয়া শিরেই স্থিতাবস্থায় যে ধ্বনি সৃষ্টি করে সেই ধ্বনি বা স্বরকেই আমরা নিষাদ বা 'ন' বলিয়া থাকি।

স্বর ও তাহার গঠনপ্রণালী প্রাচীন যুগে অর্থাৎ বৈদিক যুগে

কি প্রকার ছিল তাহার আলোচনা করিতেছি। একটি স্বর অর্থাৎ প্রথম স্বর না পাইলে অন্য স্বরগুলি পাওয়া সম্ভব নয় বলিয়া প্রথমে প্রথম স্বর কোনটি তাহারই আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি। কেহ কেহ বলিয়াছেন প্রথম স্বর মধ্যম, যুক্তি হেতু তাঁহারা বলিয়াছেন যে "বেনোর্মধ্যম স্বরঃ প্রথম সঃ", দ্বিতীয় পঞ্চম, তৃতীয় ষড়্জ, চতুর্থ গান্ধার, পঞ্চম ঋষভ, ষষ্ঠ নিষাদ এবং সপ্তম স্বর ধৈবত। পরবর্তী যুগে মধ্যম হইতেই পর পর নিম্নাভিমুখী স্বর সমাবেশ আমরা পাইয়াছি যেমন—ম, গ, র, স, ন, ধ, প। কেহ কেহ অর্থাৎ কোন কোন পুস্তক-প্রণেতা বলিয়াছেন প্রথম স্বর পঞ্চম, কেহ বলিয়াছেন প্রথম স্বর নিষাদ, কেহ বলিয়াছেন ঋষভ, কেহ বলিয়াছেন ধৈবত, কেহ বলিয়াছেন ষড়্জ। অন্য মতে বৈদিক স্বর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, অতিস্বার্য্য ও ক্রুষ্ট। এইরূপে বিভিন্ন মত সৃষ্টি হওয়ায় কেবল জটিলতাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। বেণুর মধ্যম স্বরটি আমাদের লৌকিক গানের প্রথম স্বর এই মত বহু পুস্তক-প্রণেতারাও বলিয়াছেন। বেণুর প্রথম স্বরটি কোন্ কম্পন বা আন্দোলন সংখ্যায় ধার্য্য করা হইয়াছিল কিংবা বেণুর মধ্যম-স্বরের কম্পন বা আন্দোলন-সংখ্যা কত তাহা তাঁহারা কেহই বলেন নাই। মধ্যম স্বরের কম্পন কিংবা ষড়জের কম্পন-সংখ্যা তৎকালে ধার্য্য করা থাকিলে আমরা তাহাদের অনুপাত সাহায্যে অপর সবগুলি পাইতে পারিতাম। এই কম্পন-সংখ্যা ধার্য্য না করার ফলেই যত জটিলতা।

কম্পন-সংখ্যা কি? এবং সংগীতে তাহার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তাহারই আলোচনা করা হইতেছে। যে পরমাণু-সমষ্টি আকাশ-উৎপত্তির কারণ তাহার প্রকম্পনেই নাদের উৎপত্তি। আকাশ হইতে নাদ এবং নাদই ব্রহ্মা অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ। প্রণব-পূর্ণনাদ, কেবল সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল এইরূপ আমরা জানিতে

পারিয়াছি। নাদের আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি। এখন তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিভাগগুলির আলোচনা করিতেছি। কোমলতা, মধুরতা, উচ্চতা, উত্থান, পতন, কম্পন, অনুলোম, বিলোম ইত্যাদি বিভাগগুলি আমরা নাদ হইতেই পাইব। এই কম্পন হইতেই স্বরের সৃষ্টি। এই সকল বৈচিত্র্যগুলির নিয়মাবদ্ধপ্রয়োগেই ভাবের প্রকাশ, হৃদয়ের রঞ্জনা এবং চরমে ব্রহ্ম বিদ্যালাভের জন্য সংগীতের সৃষ্টি। যাহাই হউক না কেন অর্থাৎ প্রথম স্বর, মধ্যম পঞ্চম বা অন্য যে কোন স্বরই হউক সকল মতেরই আলোচনা করা প্রয়োজন। পরবর্তী অধ্যায়ে কোনটি প্রথম স্বর তাহা জানা যাইবে। এই যে নাদ ইহার অনুরণনেই শ্রুতির উৎপত্তি হইয়াছে। "শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্যত্বাদ্বানিবেব শ্রুতি ভবেৎ"। শ্রুতি স্বরেরই সূক্ষ্মাংশ। শ্রুতি হইতেই ষড়জাদি স্বর এবং তাহা হইতেই গীত উৎপন্ন হইয়াছে।

বেদ যেমন প্রামাণ্য তেমনই উপবেদ, ভাগবত, পুরাণ সংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থও প্রামাণ্য। বেদের চরম ভাগ বেদান্ত যাহাকে ব্রহ্ম-বিদ্যা উপনিষদ বলা হয় তাহাও একই কারণে প্রামাণ্য। যাহার দ্বারা বেদার্থ স্মরণ হয় অর্থাৎ বেদের অনুসারী যে গ্রন্থ তাহাই 'স্মৃতি' এবং উহাও একই কারণে প্রামাণ্য। সংগীতদর্পণ, সংগীত পারিজাত, সংগীত রত্নাকর প্রভৃতি পুস্তক-প্রণেতাগণ শাস্ত্রকার নহেন এবং নির্ভুলও নহেন। এই কারণেই সংগীতশাস্ত্র এত জটিলতা ও অসামঞ্জস্যে পরিপূর্ণ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ জ্ঞান ও বিদ্যামত সংগীতশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন।

বৈদিক যুগে যখন পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অজ্ঞানতার অন্ধকারে মগ্ন, তখন ভারতের পর্ব্বতগুহায় গুহায় মুনিঋষিগণ সামগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়াছেন। মুনিবালকগণ গোচারণে যাইয়া গোরক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এবং উদাত্তাদি এই ত্রয়ী স্বরের সাধনা ও অনুশীলন করিতেন। তখন হইতেই আর্য্যরা সংগীতের

মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। হর্ষ, বিষাদ, নৈরাশ্য, বৈরাগ্য প্রভৃতি ভাবসকল সংগীতের দ্বারাই ব্যক্ত করা হইত। বেদেই পাওয়া যায় "উচ্চৈরুচ্চারণাদুদাত্ত, নীচৈরনুদাত্ত, সমাহারঃ স্বরিতঃ।" যাহা উচ্চ করিয়া উচ্চারণ করা যায় তাহাকে উদাত্ত সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে, পাঠ করা বা কথা বলাকে উদাত্ত সংজ্ঞা দেওয়া ঠিক নহে। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থানের উচ্চাংশ হইতেই উচ্চারিত স্বরকেই উদাত্ত বলাই বোধ হয় ঠিক। সেইরূপ 'মৃদুস্বরে' পাঠ করা বা কথা বলাকেও অনুদাত্ত বলা ঠিক নহে। যাহা উচ্চ করিয়া উচ্চারণ করা যায় না তাহাকেই অনুদাত্ত অর্থাৎ উচ্চারণস্থানের নিম্নভাগ হইতে স্বর উচ্চারণ করাকেই অনুদাত্ত বলাই যুক্তিযুক্ত। যাহা লঘু এবং গুরু মিলিত স্বর অর্থাৎ উচ্চারণস্থানের মধ্যভাগ হইতে উচ্চারিত স্বরকেই স্বরিত বলা যাইতে পারে। এই উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিতই অর্থাৎ এই 'ত্রয়ী স্বরই সংগীতের মূল মন্ত্র এবং বীজ। বহু মনীষী এবং পণ্ডিতগণ উদাত্তাদি সম্বন্ধে নানা তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কেহ কাহারও সহিত একমত নহেন।

পাণিনির স্বর বিচারে আমরা পাই উদাত্তাদি, স্বর ও বর্ণের ধর্ম। সংগীতপারিজাত স্বরোদয়ে দুই শ্রুতিবিশিষ্ট অর্থাৎ গ ও ন স্বরকে উদাত্ত, তিনশ্রুতি স্বর অর্থাৎ র ও ধ-কে অনুদাত্ত এবং চারশ্রুতি বিশিষ্ট স্বরকে অর্থাৎ স, ম, প-কে স্বরিত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। প্রায় অধিকাংশ পুস্তক-প্রণেতাগণই স্বরের পরিমাণকে অর্থাৎ শ্রুতিকে একই রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন পুস্তক-প্রণেতা উদাত্তাদি স্বরকে গ্রাম আখ্যা দিয়াছেন। কোন কোন মনীষী স, ম, প-কে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত আবার কেহ কেহ প, ম, ও স-কে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত বলিয়াছেন। সংগীত রত্নাকরে আবার স, ম, এবং প-কে স্বয়ম্ভু অর্থাৎ যাহা আপনি সৃষ্ট, বলিয়াছেন।

প্রত্যেক পুস্তক-প্রণেতারাই স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রাচীন কালে বেদগানে তিনটি স্বর ব্যবহৃত হইত যদিও কোন তিনটি স্বর তাহা তাঁহারা কেহই ধার্য্য করিতে পারেন নাই। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে বেদের যুগেই সাতটি স্বরের প্রচলন হইয়াছিল এবং এই সপ্তস্বর্য্য গায়ন রীতি প্রচলিত হওয়ার পর হইতেই তিনস্বরের সাহায্যে গান করার রীতি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তৎকালে তিনটি হইতে সাতটি এবং সাতটি হইতে কি কৌশলে বর্তমানে প্রচলিত স্বর কয়টি গঠন করা হইয়াছিল বা হইয়াছে তাহা কেহই বলেন নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বেদের যুগে তিনটি হইতে সাতটি স্বরে সামগান করা হইত এবং শিক্ষাও দেওয়া হইত। এই সাত স্বর যুক্ত গানকেই তৎকালে সপ্তস্বর্য্য গান বলা হইত এবং এই সপ্তস্বর্য্য গানই লৌকিক গানের বীজ। এখন তিন স্বর হইতে সাতস্বর এবং সাতস্বর হইতে বারটি স্বর যুক্ত সংগীতের পরিপূর্ণ অবয়ব পাই। একমাত্র ধ্বনির সাহায্যে বা ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়া উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত প্রভেদ করার যে কৌশল, ঠিক সেই একই প্রকার রীতিতে সাত স্বর হইতে বারটি স্বর সৃষ্টির বা প্রভেদের একই কৌশল। এই রীতি বা কৌশল কি. তাহা পরে আলোচিত হইবে।

অলংকারাধ্যায়

[এই অধ্যায়ে বৈদিক যুগে ব্যবহৃত অলংকার ও বিভিন্ন পুস্তক রচয়িতার মত, অলংকারাদির নাম ও লক্ষণ ; বৈদিক এবং অধুনা ব্যবহৃত তান, শ্রেণী ও জাতির পরিচয়, ভরতের যুগে জাতি ও শ্রুতির পরিচয়, শ্রুতির অনুপাতে বিকৃত স্বর ; বৈদিক, পৌরাণিক এবং আধুনিক যুগের শ্রুতির বিচার, মূর্চ্ছনার পরিচয়, গীতরীতি, দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের স্বরনাম ও ঠাট পদ্ধতির পরিচয়।]

রাগরাগিণীর রূপ ও রস পূর্ণরূপে প্রকাশ বা প্রচার করিবার প্রয়াসেই অলংকারের কল্পনা, তথা সৃষ্টি। বৈদিক যুগের বিভিন্ন পুস্তকাদি হইতে আমরা কতগুলি অলংকার পাইয়াছি তাহারই আলোচনা করিতেছি। বায়ুপুরাণ (১ম—২য় শতাব্দী) রচিত। ইহাতে ৩০০ (তিনশত) অলংকারের পরিচয় আছে। নারদীয় শিক্ষায় (২য়—৩য় শ.) আমরা গণনার হিসাব না পাইলেও কিছু কিছু অলংকারের পরিচয় পাই। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আমরা (৩য়—৫ম শ.) ৩৩ (তেত্রিশ) প্রকার অলংকার পরিচয় পাই। সংগীত মকরন্দেও (.৭ম—৯ম শ.) আমরা কিছু কিছু অলংকার পরিচয় পাই। বৃহদ্দেশীতেও (৯ম শ.) কিছু কিছু অলংকার পাওয়া যায়। সংগীত রত্নাকরেও (১২শ—১৩শ. শ.) আমরা ৬৩ (তেষটি) প্রকার অলংকারের পরিচয় পাই। বৃহদ্দেশী ও সংগীত মকরন্দে অলংকার প্রয়োগের নাম মাত্র পাওয়া যায় কিন্তু সংখ্যা এবং লক্ষণ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাই না। প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থকারই কিছু কিছু অলংকারের কথা বলিয়াছেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্র রচনার কালকে আমরা বৈদিক এবং তৎপরবর্ত্তী কালকে আমরা প্রাচীনকাল মনে করিতে পারি। বর্ত্তমানে আমরা যে সকল অলংকার ব্যবহার করিতেছি তাহার সহিত বৈদিক যুগের অলংকারের বহুল সাদৃশ্য আছে। এই সকল অলংকার অধিকাংশই বৈদিক এবং

প্রাচীন যুগ হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে আমরা যে সমস্ত অলংকার প্রয়োগ করি তাহার কল্পনা বৈদিক যুগেই করা হইয়াছিল এবং প্রাচীনকালেও সেই নাম ও লক্ষণ গ্রহণ করা হইয়াছিল।

(সপ্তক, গ্রাম, শ্রুতি, জাতি, শ্রেণী, মূর্চ্ছনা, আলাপ, তান, আশ, গমক, গিট্‌কারী, প্রক্ষেপ, বিক্ষেপ, কম্পন, অনুলোম, বিলোম, তাল, লয়, স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ, ভোগ, বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, বিবাদী, বর্জ্জিত, জোড়, মীড়, প্রকৃত স্বর, বিকৃত স্বর, মুখ্যস্বর, গ্রহ স্বর, অংশ স্বর, ন্যাস স্বর, অপন্যাস, সন্ন্যাস, বিস্তার ইত্যাদি) ক্রম অনুসারে স্বর রচনাকেও অলংকার বলে এবং এই অলংকার বহু প্রকার হইতে পারে।

• **স্বর ও সুর** ঃ—যাহা মনুষ্যকণ্ঠ হইতে নির্গত হয় তাহাই স্বর। স্বরকে যখন নিয়মানুগ পদ্ধতিতে সংগীতে ব্যবহৃত বর্ণের দ্বারা পরস্পর উচ্চারণ করা হইয়া থাকে তখনই তাহাকে সুর বলা হয়।

• **সপ্তক** ঃ—সাতটি স্বরের (প্রকৃত) একত্র সমাবেশকে সপ্তক বলা হয়।

• **অক্টেভ** ঃ—ইংরাজী বা পাশ্চাত্ত্য সংগীত মতে আটটি প্রকৃত স্বরের একত্র সমাবেশকে অক্টেভ বলা হয়।

• **গ্রাম** ঃ—শ্রুতি ও মূর্চ্ছনার সমষ্টিকে গ্রাম কহে। হিন্দু ভারতীয় সংগীতে ব্যবহৃত স্বরসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এই বিভাগের এক একটিকে গ্রাম কহে। ইহা তিন প্রকার উদারা, মুদারা, তারা অর্থাৎ নিম্ন সপ্তক, মধ্য সপ্তক, উচ্চ সপ্তক। একটি স্বরকে 'স' ধার্য্য করিয়া ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী গতিতে নীচে নামিতে নামিতে পরস্পর যে সাতটি প্রকৃত স্বর পাওয়া যায় তাহাকেই উদারা সপ্তক বা গ্রাম বলা হয়। একটি স্বরকে 'স' ধার্য্য করিয়া পর পর সাতটি পর্য্যন্ত স্বর উচ্চাভিমুখে গমনকালে

আমরা যে সপ্তক পাই তাহাকেই মুদারা সপ্তক বা গ্রাম বলা হয়। মুদারা সপ্তক শেষ হওয়ার পর পুনরায় যে 'স' পাওয়া যায় তাহা হইতে ক্রমশঃ উচ্চাভিমুখে আরোহণ করিলে পর পর যে সাতটি প্রকৃত স্বর পাওয়া যায় তাহাই তারা সপ্তক বা গ্রাম। সাঙ্কেতিক চিহ্নের দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের স্বরগুলিকে চিহ্নিত করিয়া পার্থক্য বোঝানো হয়। উদারা গ্রামের স্বরের নীচে বিন্দু কিংবা হসন্ত চিহ্ন দেওয়া হয় এবং তারা গ্রামের স্বরের উপরে বিন্দু কিংবা রেফ্ চিহ্ন দ্বারা পরিচিত করা হয়। মুদারা গ্রামের স্বরের কোনরূপ চিহ্নের প্রয়োজন হয় না। বৈদিক যুগে উদারা গ্রামকে মন্দ্র, মুদারা গ্রামকে মধ্য এবং তারা গ্রামকে তার নামে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

• **কম্পন ঃ** কোন এক স্বরকে বারবার দ্রুত ভাবে ধ্বনিত করার নাম কম্পন। ইহা তিন প্রকার মৃদু, মধ্য, এবং দ্রুত।

• **আশ ঃ** এক স্বরকে কেন্দ্র করিয়া তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী কোন এক স্বর হইতে অন্য কোন এক স্বরে যাতায়াত কালে মধ্যবর্ত্তী স্বরসমূহকে হাল্কা ভাবে স্পর্শ করিয়া অবিচ্ছেদে যাতায়াত করার নাম আশ।

• **মীড় ঃ** ঘন সংযুক্ত আশের নাম মীড়।

• **গিট্‌কারী ঃ** আশ সহকারে কিন্তু আশ অপেক্ষা দ্রুত গতিতে যাতায়াত করাকে গিট্‌কারী বলা হয়। আরোহণ ও অবরোহণ ক্রমকে, মিশাইয়াও গিট্‌কারী হইতে পারে। ইহা দুই প্রকার এক 'নির্গমকা', গমকবিহীন, অপরটি 'সগমকা' অর্থাৎ গমক সহ।

• **প্রক্ষেপ ঃ** কোন এক স্বর হইতে উপরে অবস্থিত চার কিংবা পাঁচ স্বর পরবর্ত্তী কোন এক স্বরে যাওয়াকে প্রক্ষেপ বলে।

• **বিক্ষেপ ঃ** কোন এক স্বর হইতে চার কিংবা পাঁচস্বর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন এক স্বরে আসাকে বিক্ষেপ বলে।

অনুলোমঃ 'স' হইতে 'ন' অবধি এই সাতটি স্বরের একটি হইতে অপরটিতে উর্দ্ধ গতিতে আরোহণ করাকে বা যাওয়াকে আরোহী, আরোহণ বা অনুলোম বলা হয়।

বিলোমঃ 'ন' হইতে 'স' অবধি সাতটি স্বরের যে কোন একটি হইতে অপরটিতে নিম্নাভিমুখী গতিতে নামিয়া আসাকে বিলোম, অবরোহী বা অবরোহণ বলা হয়।

প্রকৃত স্বর বা সুরঃ 'স' হইতে 'ন' অবধি এই সাতটি শুদ্ধ স্বরকে প্রকৃত স্বর বা সুর বলে।

বিকৃত স্বর বা সুরঃ প্রকৃত স্বর স্থানচ্যুত হইলেই বিকৃত স্বর হয়।

গ্রহস্বরঃ রাগ রাগিণীর আলাপচারী কিংবা বিস্তারকালে যে স্বর হইতে প্রথম আরম্ভ করার রীতি ধার্য্য করা হয় তাহাই গ্রহস্বর।

অংশস্বরঃ আলাপচারী বা বিস্তারকালে যে স্বরে বিশ্রাম করা যায় বা ক্ষণিক স্থায়ী হওয়া যায় তাহাই অংশস্বর।

ন্যাসস্বরঃ স্বরবিস্তার বা আলাপ সমাপ্ত করা হয় যে স্বরে তাহাই ন্যাসস্বর।

অপন্যাসঃ অংশ অপেক্ষা অল্পকাল যে স্বরে স্থায়ী হওয়া যায় তাহাই অপন্যাস।

সন্ন্যাসঃ অপন্যাস অপেক্ষা অল্পকাল স্থায়ী স্বরকে সন্ন্যাস বলে।

বিকৃত স্বরের প্রচলিত সাঙ্কেতিক চিহ্নঃ বিকৃত স্বর বলিতে আমরা চলিত ভাষায় যাহাকে কড়ি কোমল বলিয়া থাকি। বর্ত্তমানে 'স' ও 'প' এই দুইটি স্বরের কোন বিকৃত রূপ পাওয়া যায় না বলিয়া ইহাদের অচল স্বর বলা হয়। র, গ, ম, ধ, ন এই পাঁচটি স্বরের বিকৃত রূপ পাওয়া যায়, সেই কারণে ইহাদের সচল স্বর বলা হয়। যে যে চিহ্ন দ্বারা স্বরগুলি বোঝা যাইবে তাহার উদাহরণ

দেওয়া হইতেছে। এই সাঙ্কেতিক লিপি অর্থাৎ স্বরলিপির প্রথমটি শ্রীভাতখণ্ডে প্রণীত রীতি, দ্বিতীয়টি শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত আকারমাত্রিক প্রণালী এবং তৃতীয়টি প্রাচীন দণ্ডমাত্রিক প্রণালী।

Δ Δ । ⌐
বিকৃত র—র, ঋ, র ; বিকৃত গ—গ, জ্ঞ, গ। বিকৃত ম—ম, হ্ম, ম ;

Δ Δ
বিকৃত ধ—ধ, দ, ধ ; বিকৃত ন—ন, ণ, ন। বিকৃত ম স্বরের রূপকে কড়ি ম বা তীব্র ম বলা হয়।

রাগ রাগিণী ঃ প্রকৃতির এক এক সময়ের এক একটি ভাবের রস গ্রহণ করিয়া তাহা প্রকৃত ও বিকৃত স্বর ও নানারূপ অলংকার সহযোগে রঞ্জিত করিয়া, মানব মন মোহিত করিতে, প্রকাশ করার নাম রাগ রাগিণী।

তুক্ বা কলি ঃ রাগ রাগিণীর মধ্যে ব্যবহৃত চরণ বা পাদকে চলিত ভাষায় তুক বা কলি বলা হয়।

ছন্দ ঃ যাহা পরিমিত অক্ষরে বদ্ধ, শ্রুতিসুখকর বা প্রীতিপ্রদ তাহাই ছন্দ। ইহা দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক, চতুর্মাত্রিক, সমমাত্রিক ও অসমমাত্রিক হইতে পারে। এই অলংকার দ্বারা বৈচিত্রের সৃষ্টি হয়।

গীত ঃ ছন্দাদির সহযোগে সাংগীতিক স্বরাদির দ্বারা মনের ভাব প্রকাশকে গীত কহে।

আলাপচারী ঃ গীতের প্রারম্ভে রাগ রাগিণীতে ব্যবহৃত স্বরসমূহকে আকারাদির সহযোগে কিংবা তা, না, তুম্, রি, রেনা, তে ইত্যাদির দ্বারা রাগ রাগিণীর প্রকৃষ্ট রূপ প্রদর্শন করার রীতিকে আলাপচারী বলা হয়। আলাপে মীড়, গমক, আশ, মূর্চ্ছনা, কম্পন, প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। আলাপচারী চার তুকেরই হইতে পারে। মৃদু, মধ্য, এবং দ্রুত গতিতে আলাপ করা যায়। আলাপের যে বাণী নে, তে, তুম্ ইত্যাদি তাহা প্রকৃত শুদ্ধ বাণী নহে। এই বাণীগুলি পরিবেশন পরম্পরায় অর্থহীন এবং বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

আলাপকালীন প্রকৃত বাণী 'ওঁ অনন্ত হরি নারায়ণ তুম্', কেহ কেহ এই শেষের তুম্ পদটি তোম্ বলিয়া থাকেন।

বিস্তার ঃ আলাপ গীতের বা গতের মাত্রার শাসনে শাসিত করিলেই তাহাকে স্বর বিস্তার বলা যায়। স্বর বিস্তার গীতের বা গতের সহিত একত্র পরিবেশিত হইয়া থাকে।

পাদ বা চরণ ঃ গীত দুইটি বা চারিটি পাদের হইতে পারে। ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ, কীর্ত্তন, বাউল, শ্যামাসংগীত, দেহতত্ত্ব প্রভৃতিতে চারিটি পাদ পাওয়া যায়। সাধারণত খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী গানের দুইটি করিয়া তুক্ পাওয়া যায়। দুইটি পাদের ধ্রুপদও কিছু কিছু পাওয়া যায় তাহাকে তুক্ ধ্রুপদ বলে। চারিটি পাদের বা চরণের নাম স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। চারিটী তুকের বা পাদের অধিক পাদ বা চরণ থাকিলে তাহাকে ভোগ কহে। স্থায়ী এবং সঞ্চারী এই দুইটিকে যখন বর্ণালংকার বলা হয় তখন ইহার প্রকৃতি ভিন্ন।

ওজন ঃ স্বরের পরিমাপের নাম ওজন। ইহা গম্ভীর বা মোটা হাল্কা বা সরু উভয় প্রকারই হইতে পারে।

যতি ঃ উচ্চারণের বিচ্ছেদরূপ বিশ্রামস্থানকে যতি কহে। এই বিশ্রামকে আদি করিয়া মাত্রার উৎপত্তি।

মাত্রা ঃ সমবিভাগজনিত সময়কে মাত্রা কহে। ইহা চারিপ্রকার যথা দীর্ঘ, হ্রস্ব, প্লুত, অণু বা ব্যঞ্জন। দুই তিন বা ততোধিক মাত্রা একস্বরে ব্যবহৃত হইলে তাহাকে দীর্ঘ মাত্রা বলা যায় যেমন —সা। । । । এক মাত্রা কালকে হ্রস্বমাত্রা বলা যায় যেমন সা। অর্দ্ধমাত্রার কালকে প্লুত মাত্রা বলা যায় যেমন সসা। সিকি মাত্রার কালকেও প্লুত মাত্রা বলা যায় যেমন সসসসা। প্লুত অপেক্ষা অল্পকালস্থায়ী মাত্রাকে অণু বা ব্যঞ্জন মাত্রা বলে যেমন সসসসসসা।

তালঃ কতগুলি মাত্রার সমষ্টিকে তাল বলে। তাল দুই প্রকার।

সমপদী তালঃ যাহার তালের ভাগগুলি সমান সমান মাত্রায় বিভক্ত, যেমন সাসা। রারা। গাগা। মামা॥ সাসাসা। রারারা। গাগাগা। মামামা॥ ইত্যাদি।

বিষমপদী তালঃ যাহার তালের অন্তর্গত মাত্রার ভাগগুলি সমান সমান নহে, যেমন সাসা। রারারা। গাগাগাগা। মামামামামা॥ এই প্রকার।

ছন্দ ও তালঃ সংগীতের কালকে ক্রমান্বয়ে সমভাগে ভাগ করিলে এক ভাব হওয়াতে বৈচিত্র্য হয় না, সেইজন্য এই ত্রুটি পরিহার করার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন তাল ও ছন্দ ব্যবহৃত হয়। ছন্দ ও তালের এই বৈচিত্র্যময় রীতির জন্যই সংগীত শ্রুতিমধুর।

লয়ঃ গীতের ছন্দের পরিমাণ-কালকে আদ্যোপান্ত এক পরিমাণে রাখার নাম লয়। লয় তিন প্রকার—বিলম্বিত, যাহাতে বা যেই লয়ে স্বরের স্থায়িত্ব বেশীকাল পর্য্যন্ত, যেই লয়ে বা যাহাতে স্বরের স্থায়িত্ব বিলম্বিত বা দ্রুত নহে তাহাই মধ্য লয়, যাহাতে বা যেই লয়ে স্বরের স্থায়িত্ব স্বল্পকাল তাহাই দ্রুত।

প্রস্বনঃ গীতের কথার উপর ঝোঁক দিয়া বা জোর দিয়া উচ্চারণ করাকে প্রস্বন বলে।

বাঁটঃ গীতের কথার প্রস্বনগুলিকে স্বাভাবিক অধিকৃত মাত্রায় না বলিয়া আগে বা পিছে বলাকে বাঁট বা বাঁটোয়ারা বলে।

অঙ্গপ্রাধান্যঃ সপ্তকের স্বরবিভাগকে অঙ্গপ্রাধান্য বলে। ইহা দুই প্রকার, একটি পূর্বাঙ্গ অপরটি উত্তরাঙ্গ। ‘স’ হইতে ‘ন’ অবধি সাতটি স্বরকে দুইভাগে ভাগ করিলে সরগম একটি এবং মপধন অপর ভাগটি পাই। প্রথম ভাগটিকে পূর্বাঙ্গ এবং দ্বিতীয় ভাগটিকে উত্তরাঙ্গ বলা হইয়া থাকে।

মুখ্যস্বর ঃ রাগ রাগিণীর রূপ প্রকাশের রীতি বজায় রাখার জন্য যে স্বরসমষ্টির প্রয়োজন তাহাকেই মুখ্যস্বর বলা হয়। সমপ্রাকৃতিক রাগ রাগিণীর রূপ প্রকাশের সময় যাহাতে রাগ রাগিণীর শুদ্ধতা রক্ষা পায় সেইজন্যই ইহার প্রয়োজনীয়তা। হিন্দুস্থানী বা পশ্চিম-দেশীয় ওস্তাদগণ মুখ্যস্বরকে পকড় নামে অভিহিত করিয়াছেন।

শ্রুতি ঃ শ্রুতি অর্থে যাহা শ্রবণযোগ্য বা শোনা হইয়াছে। সংগীতে ব্যবহৃত শ্রুতির অর্থ স্বরের সূক্ষ্মাংশ। অতি সূক্ষ্ম স্বরাংশকেও শ্রুতি বলা যাইবে। এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্বরাংশ হইতেই স্বরের সৃষ্টি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে নাদ হইতে শ্রুতি এবং শ্রুতি হইতে স্বর। শ্রুতির মূল্য এবং মর্য্যাদা সংগীতে অত্যন্ত। 'স' হইতে 'ন' অবধি সাতটি স্বরের মধ্যে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিভাগ আছে তাহাকেই সংগীতের শ্রুতি বলা হয়। এই শ্রুতির সংখ্যা নারদীয় শিক্ষার রচনাকালে তথা নাট্যাচার্য্য ভরতের সময়েই সৃষ্ট হইয়াছিল। কথিত মতে ইহার সংখ্যা ২২টি। অতি প্রাচীন কালেই স্রষ্টারা শ্রুতির নামকরণ করিয়াছিলেন। শ্রুতির সংখ্যা প্রতিটি স্বরের এক নহে। কোন কোন স্বরের ৪টি, কোন কোন স্বরের ৩টি, কোন কোন স্বরের ২টি। বর্ত্তমানে প্রচলিত প্রকৃত স্বরের কোনটির কত শ্রুতি এবং সেই শ্রুতিগুলির কি নাম পাইয়াছি তাহারই উল্লেখ করিতেছি। বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হইবে।

'স' স্বরের ৪টি ঃ—ছন্দোবতী, মন্দা, কুমুদ্বতী, তীব্রা ॥

'র' স্বরের ৩টি ঃ—রতিকা, রঞ্জনী, দয়াবতী ॥

'গ' স্বরের ২টি ঃ—ক্রোধা, রুদ্রা ॥

'ম' স্বরের ৪টি ঃ—মার্জ্জনী, প্রীতি, প্রসারিণী, বিজরেখা বা বজ্রিকা ॥

'প' স্বরের ৪টি ঃ—আলাপিনী, সন্দীপনী, রক্তা, ক্ষিতি ॥

'ধ' স্বরের ৩টি ঃ—রম্যা, রোহিণী, মদন্তী ॥

'ন' স্বরের ২টি ঃ—ক্ষোভিণী, উগ্রা ॥

মূর্চ্ছনা ঃ গ্রামসমূহের যে আরোহ ও অবরোহ তাহাকেই মূর্চ্ছনা বলে। কোন এক স্বর হইতে অন্য এক বা ততোধিক স্বরে কোনরূপ বিশ্রাম না করিয়া যাতায়াত করার নামও মূর্চ্ছনা। বৈদিক যুগের ঠিক পর হইতেই আমরা মূর্চ্ছনা নাম পাই। মনীষীরা মূর্চ্ছনার সংখ্যা ২১টি ধার্য্য করিয়াছেন। এক এক গ্রামের ৭টি হিসাবে মূর্চ্ছনা। প্রাচীন যুগে তিনটি গ্রাম, যথা—মধ্যম, গান্ধার ও ষড়জ। বৈদিক যুগের পর হইতে আমরা গ্রাম বলিতে মন্দ্র, মধ্য ও তার জানিয়াছি। অধুনা পণ্ডিতগণের মতে মধ্যম এবং গান্ধার গ্রাম লুপ্ত কেবলমাত্র ষড়জ গ্রামই প্রচলিত। পণ্ডিতগণ এই মূর্চ্ছনা সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন, যাহার বিস্তৃত আলোচনা পরে করিব।

শ্রেণী ঃ বৈদিক যুগ হইতেই শুদ্ধ, সালগ বা সালঙ্ক, সঙ্কীর্ণ এই তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগ রাগ রাগিণীর ক্ষেত্রে পাইয়াছি। শুদ্ধ শ্রেণী তাহাকেই বলা যাইবে যে রাগ বা রাগিণী অপর কোন রাগ বা রাগিণীর মিশ্রণ হইতে উদ্ভূত নহে। সালগ বা সালঙ্ক শ্রেণী বলিতে যে রাগ বা রাগিণী দুইটি রাগ রাগিণীর মিশ্রণ হইতে জাত তাহাকেই বুঝিব। সঙ্কীর্ণ শ্রেণী বলিতে বুঝিব, যে রাগ বা রাগিণীর উৎপত্তি তিন বা ততোধিক রাগ রাগিণীর সমন্বয় হইতে। এই তিন প্রকার বিভাগকেই প্রাচীন কালে জাতি বলা হইত এবং বর্ত্তমানেও তাহাই বলা উচিত।

গমক ঃ এক স্বরকে কেন্দ্র করিয়া তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী স্বরের সহিত উচ্চারণ করাকে গমক বলে। উদাহরণস্বরূপ সংগীত-রত্নাকর এবং সংগীতপারিজাত বর্ণিত কয়েকটি বিখ্যাত গমকের নাম ও লক্ষণ বলিতেছি। আমরা বর্ত্তমানে প্রচলিত রাগ

রাগিণীগুলিতে এই গমক প্রয়োগ করিতে বা আয়ত্ত করিতে পারি।

চ্যাবিতঃ যে স্বরগুলি বিচ্যুত বা স্বাভাবিক অবস্থা হইতে চ্যুত। একবার মাত্র আঘাত হইতে যে স্বর সৃষ্টি তাহাকে চ্যাবিত গমক বলে। রত্নাকরে আমরা চ্যাবিত গমক পাই না। পারিজাত বলেন, একটি আঘাত হইতে সৃষ্ট কোন স্বর যখন ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতে থাকে তখন সেই স্বরের কম্পন ক্রমশঃ স্থানচ্যুত হইয়া অন্য স্বর সৃষ্ট করে, এই স্থানচ্যুত স্বরকে চ্যুত বা চ্যাবিত গমক বলে। এই চ্যুত স্বরকে আবার শারীর বলা হয়।

কম্পিতঃ এক স্বরে দুইবার আঘাত করিলেই কম্পিত গমক হয়। রত্নাকর বলিয়াছেন, দ্রুত মাত্রার অর্দ্ধেক পরিমাণ সময়ের গতিতে সৃষ্ট গমক কম্পিত।

প্রত্যাহতঃ একবার আঘাতে দুইটি স্বর উৎপাদন করিলে তাহাকে প্রত্যাহত গমক বলে।

দ্বিরাহতঃ এক স্থানে দুইবার আঘাত করিলে যে স্বর সৃষ্ট হয় তাহা দ্বিরাহত।

স্ফুরিতঃ যে গমকে দুইটি স্বর অত্যন্ত জোরে আঘাত করা হয় তাহাকে স্ফুরিত বলে। রত্নাকর বলেন, $\frac{1}{8}$ ভাগ পরিমিত সময়ে বেগে আন্দোলিত গমকই স্ফুরিত গমক।

শান্তঃ একটি আঘাতের পর পুনরায় কম্পিত না হইয়া যদি স্বস্থানেই স্বরটি স্থায়ী হয় তবে তাহাই শান্ত গমক।

তিরিপঃ দ্রুত মাত্রার সিকি পরিমিত সময়ে কম্পিত স্বরকে তিরিপ গমক বলে।

ঘর্ষণঃ এক স্থানে আঘাত করিয়া যদি ৮টি স্বর বাহির হয় তবে তাহাই ঘর্ষণ। এই গমক তার-বাদ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

***বিকর্ষণ*ঃ** অপর স্বরকে আঘাত দ্বারা স্থায়ী স্থানে লইয়া আসা।

পুনঃ স্বস্থানঃ যে স্বরটি পরবর্ত্তী স্বরে আঘাত করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসে।

অগ্র স্বস্থানঃ যে স্বরটি পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরে আঘাত করিয়া স্বীয় স্থানে ফিরিয়া আসে।

কর্ত্তরীঃ যে গমকে স্থায়ী, আরোহী প্রভৃতি বর্ণ উচ্চারিত হয় তাহাকেই কর্ত্তরী গমক বলে। যথা সরস, রগর ইত্যাদি।

সুঢালুঃ দুইটি স্বরকে পরিস্ফুট করার জন্য যে গমক তাহাকে সুঢালু বলে।

মেরু ও খণ্ডমেরুঃ বৈদিক যুগে ও পৌরাণিক যুগে ৭টি স্বরের সমাবেশকে মেরু বলা হইত। সেই যুগে ৭টি মাত্র স্বরই প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে আমরা প্রকৃত ৭টি এবং বিকৃত ৫টি স্বর—একত্রে বারটি স্বর পাইতেছি। সেইজন্য এই ১২টি স্বর সমাবেশকে আমরা মেরু বলিব। ১২টি অপেক্ষা কম স্বরযুক্ত সমাবেশকে আমরা খণ্ড-মেরু বলা উচিত মনে করি। পারিজাতে এবং রত্নাকরে মেরু ও খণ্ডমেরুর বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। পরে মেরু সম্বন্ধে উদাহরণ সহ বিস্তৃত আলোচনা করিব।

তানঃ গীতে ব্যবহৃত সাংগীতিক স্বরসমূহ পরিত্যাগ করিয়া স্বরবর্ণ সাহায্যে অর্থাৎ অকার, আকার, ইকার, উকার ইত্যাদির সাহায্যে অনুলোম বিলোম গতি দ্বারা গমক, মূর্চ্ছনা সহকারে রাগ রাগিণীর বিস্তার করাকে তান কহে। কমপক্ষে তানে তিনটি স্বর থাকা প্রয়োজন। ইহা মৃদু, মধ্য ও দ্রুত হইতে পারে। এই তান করার রীতি বৈদিক যুগ হইতেই প্রচলিত। সেই যুগের মনীষীগণ ভিন্ন ভিন্ন তানসমূহ রচনা করিয়া ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। অধুনা ব্যবহৃত তানের নাম ও লক্ষণ হিসাবে আমরা কয়েকটি তান সাধারণভাবেই করিয়া থাকি। পারিজাত এই অধুনা ব্যবহৃত

তানের নামগুলি গমক আখ্যা দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখন বৈদিক ও আধুনিক তানের নামগুলি দিতেছি।

বৈদিক তান ঃ অশ্বক্রান্তা, অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, অত্যাগ্নিষ্টোম, আতোছা, আমুষ্যায়ণ, ইজ্জ্যাশীল, ইঙ্গুদ, ইত্থম্ভুত, উদ্ভিদ্‌যাগ, উপাংশু, ক্রতুধ্বংসী, ক্রতূত্তম, গোসব, গজক্রান্তা, চাতুর্মাসিক, তৃংবাহু, দীক্ষা, প্রাজপত্য, পুণ্ডরীক্ষ, বাজপেয়ী, বহুযজ্ঞ, বিষ্ণুক্রান্তা, বিশ্বজিত, বৈকুণ্ঠবারণ, মহাব্রত, রাজসূয়, ষোড়শী, সর্ব্বতোভদ্র, সাবিত্রী, সুবর্ণ, সূর্য্যক্রান্তি, সোম, সৌত্রামাণ, স্বাহাকার, সূত্ররোচিষ ইত্যাদি।

আধুনিক তান ঃ আরোহ তান, অবরোহ তান, ঢালু তান, স্ফুরিত তান, কম্পিত তান, আহত তান, প্রত্যাহত তান, ত্রিপু তান, মূর্চ্ছনা তান, আন্দোলন তান ইত্যাদি। মূর্চ্ছনা তানের আলোচনা করা যাইতেছে।

মূর্চ্ছনা তান ঃ মূর্চ্ছনার সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে যে এক স্বর হইতে অন্য এক বা ততোধিক স্বরে অবিচ্ছেদে অর্থাৎ কোনরূপ বিশ্রাম না করিয়া যাতায়াত করার নাম মূর্চ্ছনা। এইরূপ অলংকার হইতে আমরা প্রকৃত স্বর সমাবেশের সাহায্যে পাই ৫০৪০টি তান, অর্থাৎ ৭টি স্বর হইতে ৫০৪০, ৬টি স্বর হইতে ৭২০, ৫টি স্বর হইতে ১২০, ৪টি হইতে ২৪, ৩টি স্বর হইতে ৬, ২টি স্বর হইতে ২, ১টি স্বর হইতে ১। সংগীতপারিজাত রচয়িতা অহোবল বলিয়াছেন যে আমরা শুদ্ধ এবং বিকৃত স্বর সমন্বয়েও মূর্চ্ছনা পাইতে পারি। তিনি বলিয়াছেন, কেবলমাত্র ষড়জ গ্রামে ১৮,৬৪৮টি মূর্চ্ছনা পাওয়া যাইবে। এই সংখ্যাকে ৭ দ্বারা বিভাগ করিলে আমরা এক একটি স্বরের মূর্চ্ছনা পাই ২৬৬৪। এই মূর্চ্ছনাসংখ্যাকে আমরা কূটতান সংখ্যা ৫০৪০ দ্বারা গুণ করিলে ১৩,৪২,৬, ৫৬০টি অর্থাৎ ১৩ কোটি ৪২ লক্ষ ৪ হাজার ৫ শত ৬০টি এক একটি মূর্চ্ছনার সম্পূর্ণ কূটতান-সংখ্যা পাই। এক্ষণে সাতটি স্বরের মূর্চ্ছনার কূটতান-সংখ্যা

হইতেছে ৯৩,৯৮,৫,৯২০ অর্থাৎ ৯৩ কোটি ৯৮ লক্ষ ৫ হাজার ৯ শত ২০। ওড়ব, ষাড়ব ও বিকৃত স্বর সাহায্যে আরও মূর্চ্ছনা তান পাওয়া যাইবে।

বর্ণালংকার ঃ মধ্যযুগে আমরা যে সমস্ত অলংকারের নাম ও লক্ষণ পাই বর্ণালংকার তাহার মধ্যে অন্যতম। অলংকারের বহুপ্রকার নাম ও গুণাবলী পাওয়া সত্ত্বেও বর্ত্তমানে সবগুলির প্রয়োগ সম্ভব নহে। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি অলংকার প্রয়োগবিধি সমেত লিখিতেছি। প্রথমে জানা প্রয়োজন বর্ণালংকার কয় প্রকারের—ইহা চারিপ্রকার যথা—স্থায়ী, সঞ্চারী, আরোহী এবং অবরোহী। গানের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকে বর্ণ বলা হয়।

স্থায়ী বর্ণ ঃ গীত কিংবা বাদ্যে সময়ে সময়ে কোন স্বরকে বারংবার উচ্চারণ করা কিংবা ধ্বনিত করাকেই স্থায়ী বর্ণ বলে। যথা সসস ইত্যাদি।

আরোহী বর্ণ ঃ নিম্নের কোন স্বর হইতে ক্রমানুসারে উপরের কোন স্বরের প্রয়োগ করিলে তাহাকে আরোহী বর্ণ বলে যথা—সরগম, মপধন।

অবরোহী বর্ণ ঃ উপরের কোন স্বর হইতে ক্রমানুসারে নিম্নের কোন স্বর প্রয়োগ করিলে তাহাকে অবরোহী বর্ণ বলে যথা—নধপম, ধপমগ ইত্যাদি।

সঞ্চারী বর্ণ ঃ স্থায়ী, আরোহী এবং অবরোহী বর্ণের মিশ্রণ, যথা—সররগমগরস।

অলংকার ঃ বিশিষ্ট বর্ণ রচনাকে অলংকার বলে। একই প্রকৃতির স্বর বা স্বরসমূহ যখন আরোহণ বা অবরোহণ ক্রমে অথবা উভয়তই প্রয়োগ করা হয় তখনই অলংকারের সৃষ্টি হয়। নানাবিধ অলংকারের প্রয়োগে গীত, বা বাদ্য সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হয়। বর্ণগত অলংকারের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

স্থায়ী বর্ণগত অলংকার ঃ সাত প্রকার। প্রসন্নাদি, প্রসন্নান্ত, প্রসন্নমধ্য, প্রসন্নাদ্যান্ত, ক্রমরোচিত, প্রস্তার এবং প্রসাদ। পারিজাত মন্দ্র স্বর সম্বন্ধে নীরব, তিনি মন্দ্র স্বরকে প্রসন্ন বলিয়াছেন। কিন্তু রত্নাকর মূর্চ্ছনার প্রথম স্বরকে মন্দ্র স্বরে উচ্চারণ করাকেই যুক্তিযুক্ত বলিয়াছেন এবং তাহার দ্বিগুণে তার স্বর উচ্চারণ করার রীতি ধার্য্য করিয়াছেন। এই সাতটি অলংকারের আবার ভিন্ন ভিন্ন নামও পাওয়া যায়। মুনিগণ কর্ত্তৃক ধার্য্য বা কল্পিত এই নামগুলি ভদ্র, নন্দ, জিত, সোম, গ্রীব, ভাল ও প্রকাশক। যথা—

ভদ্র ঃ প্রথম স্বর হইতে দ্বিতীয় স্বর উচ্চারণ করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব স্বর উচ্চারণ করা 'ভদ্র'। যথা—সরস, রগর, গমগ ইত্যাদি ক্রম। ইহা হনুমন্ত মত বলিয়া প্রচলিত।

নন্দ ঃ 'নন্দ' নামক অলংকার ভদ্রের ন্যায় কিন্তু স্বরগুলি দ্বিগুণিত। যথা—সসররসস,ররগগরর ইত্যাদি ক্রম।

জিত ঃ আদি ও অন্ত্যস্বর দুইটি স্বল্পকালে উচ্চারণের ফলে মন্দ্র হওয়ায় যে অলংকার সৃষ্ট হয় তাহা 'জিত' অলংকার। যথা—সগরস, রগমর, গপমগ ইত্যাদি ক্রম।

গ্রীব ঃ যে স্বর রচনায় দ্বিতীয় স্বরটি পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সেই পরিত্যক্ত স্বর ও তাহার পরবর্তী স্বর গ্রহণ করিয়া পুনরায় চতুর্থ স্বর পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া আদি স্বরে অর্থাৎ প্রথম স্বরে অবরোহণ করিয়া যে অলংকার শেষ হয় তাহাই 'গ্রীব'। যথা—সগরগমগরস, রমগমপমগর ইত্যাদি ক্রম।

সোম ঃ আদ্যন্ত স্বরগুলি দীর্ঘকালে উচ্চারিত হইলে বা দ্বিগুণিত করিলে 'সোম' অলংকার হয়। যথা—সসগগররসস, ররমমগগরর ইত্যাদি ক্রম।

ভাল ঃ যে স্বর রচনার আদি এবং অন্ত্যস্থিত স্বর দুইটি স্বল্প

সময়ে উচ্চারিত তাহা 'ভাল'। যথা—সগরমমগরস, রমগপপমগর ইত্যাদি ক্রম।

প্রকাশক বা প্রসাদ ঃ যে স্বর রচনার প্রথম তিনটি স্বর দ্বিগুণ এবং চতুর্থ, তৃতীয় ও দ্বিতীয় স্বর স্বাভাবিক ভাবে উচ্চারণ করিয়া পুনরায় তৃতীয় স্বর হইতে আদি স্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে যে অলংকার হয় তাহা 'প্রকাশ' বা 'প্রসাদ'। যথা—সসররগগমগরগরস ইত্যাদি ক্রম।

বিস্তীর্ণ ঃ মূর্চ্ছনার আদি স্বর দীর্ঘ সময়ে উচ্চারণ করিতে করিতে যথাক্রমে আরোহণ করিলে তাহা 'বিস্তীর্ণ' অলংকার। যথা—সা া, রা া, গা া, মা া, পা া, ধা া, না া ইত্যাদি ক্রম।

নিষ্কর্ষ ঃ মূর্চ্ছনার আদি স্বর হইতে স্বরগুলি দ্বিগুণ করিয়া স্বল্পকালে ক্রমিক আরোহণ করিলে তাহা 'নিষ্কর্ষ' অলংকার। যথা —সস, রর, গগ, মম, পপ ইত্যাদি ক্রম। নিষ্কর্ষ অলংকার তিনগুণ বা চারগুণ করিয়া উচ্চারণ করিলে তাহাকেই 'গাত্রবর্ণ' বলা হয়। নিষ্কর্ষ অলংকারের গাত্রবর্ণ নামের দুইটি ভেদ পাওয়া যায়। যথা—

ত্রিগুণ গাত্রবর্ণ ঃ সসস, ররর, গগগ, মমম ইত্যাদি ক্রম (স্থায়ী বর্ণের ন্যায়)।

চতুর্গুণ গাত্রবর্ণ ঃ সসসস, রররর, গগগগ, মমমম ইত্যাদি ক্রম (স্থায়ী বর্ণের ন্যায়)।

বিন্দু ঃ প্রথম স্বরকে তিনবার দীর্ঘ সময় উচ্চারণ করিয়া দ্বিতীয় স্বরকে স্বল্পকালে একবার উচ্চারণ করিলে 'বিন্দু' অলংকার হয়। যথা—সাসাসারঃ, রারারাগঃ, গাগাগামঃ ইত্যাদি ক্রম (আকার ১ মাত্রা, বিসর্গ ½ মাত্রা)।

অভ্যুচ্ছ্রয়ঃ ঃ একটি অন্তর অপর স্বরের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের আরোহণ ক্রমকে অভ্যুচ্ছ্রয়ঃ অলংকার বলে। যথা—সগ, রম, গপ ইত্যাদি ক্রম।

হসিত : যে অলংকারে আরোহণকালে উচ্চারিত স্বরগুলি একটি একটি ক্রমিক অনুসারে বাড়িয়া যায় তাহাকে 'হসিত' অলংকার বলে। ইহা শিবপ্রিয়া (শার্ঙ্গদেব) মত। যথা—সা, সরা, সরগা, সরগমা; রা, রগা, রগমা, রগমপা ইত্যাদি কিংবা সারারাগাগাগা, রাগাগামামামা ইত্যাদি।

প্রেঙ্খিত : প্রথম ও দ্বিতীয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুক্তভাবে উচ্চারিত স্বরের ক্রমিক আরোহকে 'প্রেঙ্খিত' অলংকার বলে। যথা—সর, রগ।

আক্ষিপ্ত : দুইটি স্বর একান্তরিত করিয়া প্রতিটি স্বরকে দ্বিগুণ করিয়া উচ্চারণ করিলে তাহাকে 'আক্ষিপ্ত' অলংকার বলে। যথা—সাসাগাগা, রারামামা, গাগাপাপা ইত্যাদি ক্রম।

সন্ধিপ্রচ্ছাদন : প্রথম ও দ্বিতীয় স্বরকে স্বল্পকালে এবং তৃতীয় স্বরকে দীর্ঘকালে উচ্চারণ করাকে 'সন্ধিপ্রচ্ছাদন' অলংকার বলে। যথা—সরাগা, রগামা, গমাপা, মপাধা ইত্যাদি ক্রম।

উদ্‌গীত : প্রথম স্বরটি দুইবার, দ্বিতীয় স্বরটি একবার স্বল্প-কালে এবং তৃতীয় স্বরটি একবার দীর্ঘকালে উচ্চারণ করাকে 'উদ্‌গীত' অলংকার বলে। যথা—সসারগা, ররাগমা, গগামপা ইত্যাদি ক্রম।

উদ্‌বাহিত : প্রথম স্বর ৪ বার, দ্বিতীয় স্বর ২ বার, তৃতীয় ও চতুর্থ স্বর ১ বার করিয়া দীর্ঘকালে উচ্চারণ করাকে 'উদ্‌বাহিত' অলংকার বলে। যথা—সাসাসাসারারাগামা, রারারারাগাগামাপা ইত্যাদি ক্রম।

ত্রিবর্ণ : প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর একবার করিয়া এবং তৃতীয় স্বর তিনবার একত্রে দীর্ঘকালে বলিলে 'ত্রিবর্ণ' অলংকার হয়। যথা—সারাগাগাগা, রাগামামামা, গামাপাপাপা ইত্যাদি ক্রম।

বেণী বা পৃথস্‌বেণি : প্রথম স্বর ৩ বার, দ্বিতীয় স্বর ৩ বার,

তৃতীয় স্বর ৩ বার একত্রে বলিলে যে অলংকার হয় তাহা 'বেণী' বা 'পৃথস্‌বেণি'। যথা—সাসাসারারারাগাগাগা ইত্যাদি ক্রম।

এখন সঞ্চারী 'অলংকারের নাম ও লক্ষণ লিখিত হইতেছে। সঞ্চারী অলংকারের স্বরগুলি মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন স্থানে বা গ্রামে সঞ্চরণশীল। এই কারণেই এই প্রকৃতিজাত অলংকারকে সঞ্চারী অলংকার বলা হয়।

যে আরোহের অন্ত্যস্বর ছুইটি গুরুবর্ণ অবশিষ্ট চারিটি ক্রমে সারি ইত্যাদি স্বরসমূহের স্থানে পরবর্তী স্বরসমূহের ব্যবহার হয়, যাহার প্রারম্ভে মন্দ্র স্বরও তিন স্থানেই বিচরণশীল তাহাকে 'মন্দ্রাদি' অলংকার বলে। যথা—সারিগমমগরসা সারিগারি-সারিগামা ইত্যাদি প্রকার।

সাগারগামগরগরগরসসরগম, এই স্বরগুলির অর্থাৎ তিনটি স্বরের মধ্যস্বর গুরু এবং আদি ও অন্ত্যের লঘুস্বর প্রয়োগকে "মন্দ্র মধ্য" বলে।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর দ্বিগুণ ও চতুর্থ স্বর দ্বিতীয় স্বর পর্য্যন্ত অবরোহণ করিয়া পুনর্ব্বার তৃতীয় স্বর হইতে আদি স্বরে ফিরিয়া আসিলে "মন্দ্রান্ত" অলংকার হয়। ইহার অন্ত্যের স্বরসমূহ মন্দ্রভাবে উচ্চারিত। যথা—সসররগগমগরগরস ইত্যাদি।

প্রথম স্বরটি উচ্চারণ করিয়া ছুইটি স্বর বর্জ্জন করিয়া চতুর্থ স্বর উচ্চারণ করিয়া যে স্বর যুগল হয় অনুরূপ ভাবে দ্বিতীয় স্বর উচ্চারণ পূর্ব্বক মধ্যবর্তী স্বর ছুইটি বর্জ্জন করিয়া পঞ্চম স্বরের সহিত মিশ্রণে যে যুগল হয় এইরূপ ক্রমিক পাঁচটি যুগলের উচ্চারণকে "প্রস্তার" কহে। যথা—সম, রপ, গধ ইত্যাদি।

প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর তিন বার উচ্চারণ করিয়া তৃতীয় ও দ্বিতীয় স্বর একবার উচ্চারণ করিলে "প্রসাদ" অলংকার বলে। সরসরসরগর, রগরগরগমগ ইত্যাদি।

আদি স্বর উচ্চারণ করিয়া দ্বিতীয় স্বর বর্জ্জন করিয়া পুনরায় দ্বিতীয় স্বরকে উচ্চারণ করিয়া তৃতীয় স্বর বর্জ্জন করিয়া চতুর্থ স্বর উচ্চারণ করিয়া আরোহণ করিলে যে স্বর সঙ্গতি আমরা পাই তাহার সহিত অনুরূপ অবরোহে আদি স্বর পর্য্যন্ত প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় স্বাভাবিক ভাবে চতুর্থ স্বর পর্য্যন্ত গমন করিলে এই প্রকৃতিগত বারোটি স্বর যুক্ত যে অলংকার হয় তাহাকে “চালিত” অলংকার বলে। যথা—সগরমমরগসসরগম ইত্যাদি।

সগরমসরগম, রমগপরগমপ, গপমধগমপধ ইত্যাদি আট স্বরের প্রয়োগযুক্ত অলংকারকে “ব্যাবৃত্ত” অলংকার বলে।

সগমর, রমপগ ইত্যাদি ক্রমের যে অলংকারে প্রথম ক্রম ১ম, ৩য়, ৪র্থ ও ২য় স্বর দ্বারা রচিত এবং দ্বিতীয়াদি অপর পাঁচটি ক্রমও এইরূপে পর পর স্বর দ্বারা রচিত, তাহাকেই “পরিবর্ত্ত” বলে।

সরগ, রগম, গমপ ইত্যাদি ক্রমে যে অলংকারে ক্রমিক তিনটি স্বরের উচ্চারণ হয় তাহাই “আক্ষেপ” অলংকার।

সসসরসগ, রররগরম এই প্রকৃতির অলংকারের প্রথম ক্রমটির প্রথম স্বর দীর্ঘ সময়ে তিন বার উচ্চারণ করিয়া তৎপরে ২য় স্বরটি স্বল্পকালে উচ্চারণ করিয়া পুনরায় ১ম স্বর ও ৩য় স্বরটি দীর্ঘ সময়ে উচ্চারণ করিলে তাহা “বিন্দু” অলংকার।

সরগর এই প্রকৃতির ১ম ও ২য় এবং ৩য় ও ২য় স্বর একযোগে উচ্চারণ করিলে “উদ্‌বাহিত” অলংকার হয়।

সমমমসম, রপপপরপ এই প্রকার ১ম স্বর একবার ৪র্থ স্বর তিনবার এবং প্রথম ও চতুর্থ স্বর একত্রে একবার বলিলেই “ঊর্ম্মি” অলংকার হয়।

সরগমমগরসসরগম এই প্রকার ৪টি স্বর একত্রে আরোহী পরে অবরোহী তৎপর পুনরায় আরোহী করিলে যে অলংকার হয় তাহা “সোম”।

সসমমররপপ, এই প্রকার আদিস্বর ২বার, ৪র্থ স্বর ২বার একত্রে উচ্চারণ করিয়া ২য়, ৫ম স্বর ২বার, ২বার করিয়া যে যুগল করা হয় তাহার ক্রমিক আরোহণে যে অলংকার পাওয়া যায় তাহা "প্রেঙ্খ"।

সমসমসরগম এইরূপ ১ম ও ৪র্থ স্বরের মিলিত অবস্থা ২বার আবৃত্তি করিয়া পুনরায় আদিস্বর হইতে ৪র্থ স্বর পর্য্যন্ত স্বরগুলি আবৃত্তি করার প্রণালীকে "নিষ্কুজিত্" বলে।

সরসগসমসপ ইত্যাদি প্রকৃতির অলংকারে প্রথম স্বরটি পরবর্ত্তী সমস্ত স্বরগুলির এক একটিকে স্পর্শ করিয়া ক্রমিক পদ্ধতিতে চলিতে থাকে। ইহা "শ্যেন" অলংকার।

সররগগম এই প্রকৃতির অর্থাৎ ১ম ও ২য়, ২য় ও ৩য় এই ক্রমানুসারে "চলিত" অলংকারক্রম।

সগসগসরগম এই প্রকৃতির অলংকারে ১ম ও ৩য় দুইবার একত্রে এবং ১ম, ২য়, ৩য় ও চতুর্থ একত্রে উচ্চারণ করা হয়। এই অলংকার আন্দোলন সহযোগে উচ্চারিত হইলে শোভন হয়। ইহা "উদ্ঘাটিত"।

সগরগসরগম এই স্বর রচনা ১ম, ৩য় এবং ২য় ৩য় একত্রে ও প্রথম হইতে ৪র্থ স্বর পর্য্যন্ত একত্রে উচ্চারিত করিলে "রঞ্জিত" অলংকার হয়।

সরগরগমগরসরগম এই ক্রমিক প্রকৃতির অলংকার "সন্নিবৃত্ত"।

সরসরগম ইত্যাদি স্বরসমূহ যে অলংকারে দ্বিগুণ করিয়া ব্যবহৃত হয় তাহাকে "প্রবৃত্তক" বলে।

সমগমসরগম এই ক্রমিক প্রয়োগকে "বেণু" বলে।

সসমমগগরসসরগরসরগম এই প্রকার ক্রমিক স্বররচনা অর্থাৎ ১ম, ৪র্থ ও ৩য় স্বর দ্বিগুণ করিয়া ব্যবহার করার পর রসসরগর-সরগম এই স্বর সমাবেশে রচিত ক্রমকে "ললিত" অলংকার বলে।

সসপপররধধ ইত্যাদি ক্রমিক স্বর রচনা যাহাতে সমবাদী স্বর দ্বিগুণ করিয়া ৪টি ক্রম রচিত হয় তাহা "হুঙ্কার"।

সমগররপমপ ইত্যাদি ক্রমিক স্বর রচনায় যে অলংকার পরপর পরবর্ত্তী স্বরগুলি বিন্যাস করিয়া সৃষ্ট হয় তাহা "হ্লাদমান"।

সসসমমম, রররপপপ এই ক্রমিক প্রয়োগকে "অবলোকিত" বলে।

আরোহ এবং অবরোহ ক্রমে এই সঞ্চারী অলংকার প্রয়োগ হইয়া থাকে। গীতজ্ঞগণ এইরূপ আরও সাত প্রকার অলংকার ব্যবহার করিয়া থাকেন, যথা—ইন্দ্রনীল, মহাবজ্র, নির্দ্দোষ, সীর, কোকিল, আবর্ত্ত, সদানন্দ। এই প্রকৃতির অলংকারগুলি সাধারণত গীতে ব্যবহৃত হয়।

সরগমগরসরগরসরগম এইরূপ ক্রমিক প্রয়োগে যে অলংকার সৃষ্ট তাহাই "ইন্দ্রনীল"।

সরগরসরসরগম এই ক্রমিক প্রয়োগ "মহাবজ্র" নামে বিখ্যাত।

সরসরগম এই প্রয়োগে "নির্দ্দোষ" নামে খ্যাত।

স, র, সরগ, সরগম ইহা "সীর" নামে খ্যাত।

সরগসরগম এই প্রকৃতির প্রয়োগ "কোকিল" নামে বিখ্যাত।

সরগরসরসরসরগম এই প্রয়োগ "আবর্ত্ত" নামে খ্যাত।

সরগম, রগমপ প্রকৃতির প্রয়োগ "সদানন্দ" নামে খ্যাত।

পারিজাতকার বলিয়াছেন, ইন্দ্রনীল "ধ্রুবতালে," মহাবজ্র "মণ্ঠ তালে", নির্দ্দোষ "রূপক তালে", সীর "ঝম্পতালে", কোকিল "ত্রিপুট তালে" আবর্ত্ত "অড্ডা তালে" সদানন্দ "লঘুকাল তালে" গীত হইলে শ্রুতিমধুর ও শোভন হয়।

গীতের উপযোগী আরও পাঁচটি অলংকার পাওয়া যায়—চক্রাকার, জব, শঙ্খ, পদ্মনিভ, বারিদ।

ররবর সররর, গগগগ রগগগ,—এই প্রকার অলংকার 'চক্রাকার'।

সরগমপধনর্স নধপমগরস এই প্রকার অলংকার "জব"।

র্সর্সনধ, ননধপ, এই প্রকার অলংকার "শঙ্খ"।

সরসসসরগগ, রগররগমম, এই প্রকার অলংকার "পদ্মনিভ"।

সননন, সধধধ, সপপপ এই প্রকার অলংকার "বারিদ"।

পারিজাতের মতে উপরিউক্ত বর্ণগত অলংকারের সমষ্টি বহু। কিন্তু তন্মধ্যে ৬৮ প্রকার অলংকারই মাত্র পাওয়া যায়।

জাতিঃ স্বরসমষ্টি, শ্রুতিসমষ্টি, গ্রহাংশকন্যাস ও রসানুভূতির সমন্বয়কেই রাগরাগিণীর জাতি বলা যাইবে। রাগরাগিণী রচনায় জাতি একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। শার্ঙ্গদেব ও অন্যান্য পুস্তক প্রণেতাগণেরও একই রূপ মত। জাতির পরিচয়েই রাগরাগিণীর বিশিষ্টতা সমধিক উপলব্ধি করা যায়। রত্নাকর প্রণেতা এই মতই পোষণ করেন। তিনি প্রতিটি জাতির লক্ষণ বর্ণনা কালে কোন্ জাতির রাগরাগিণীর কোন্‌টি অংশ স্বর, কোন্‌টি বর্জ্জিত স্বর হইবে অর্থাৎ ষাড়ব অবস্থায় অথবা ঔড়ব অবস্থায় কোন্ কোন্ স্বর বর্জ্জনীয়, কোন্ স্বরের সহিত কোন্ স্বরের পরস্পর সঙ্গতি, সেই সেই জাতির রাগরাগিণী কোন্ কোন্ তালের উপযোগী, কোন্ কোন্ মূর্চ্ছনার অন্তর্ভুক্ত, কোন্ কোন্ গীতির অন্তর্ভুক্ত, প্রয়োজনানুসারে কোন্ কোন্ জাতির রাগরাগিণী কিরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার বিশদ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

পারিজাত প্রণেতা অহোবল জাতি বিচারে রত্নাকর প্রণেতা শার্ঙ্গদেবকে বিশেষরূপে অনুকরণ করিয়াছেন। পারিজাত মতে সাতটি শুদ্ধ জাতি সাতটি শুদ্ধস্বরের নামেই রচিত, যথা—ষাড়্‌জী, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী ও নিষাদী। কিন্তু বৈদিক যুগে ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে ১৮ প্রকার জাতিগানের পরিচয় দিয়াছেন, যথা—মধ্যমোদীচ্যবা, নন্দয়ন্তী, গান্ধারপঞ্চমী, ধৈবতী-

পঞ্চমী, গান্ধারাদীচ্যবা, আর্ষভী, নিষাদী, মধ্যমা, ষড়জকৌশকী, ষড়জোদীচ্যবতী, কম্পারবী, আন্ধ্রী, গান্ধারী, রক্তগান্ধারী, ষাড়জী, কৌশিকী, ধৈবতী, ষড়জমধ্যমা। এই জাতিগুলির নামকরণ হইতেই আমরা কতগুলি শুদ্ধ ও কতগুলি মিশ্রজাতি পাইতেছি। সংগীত-রত্নাকর ও সংগীত পারিজাত এই মতই পোষণ করেন কিন্তু তাঁহারা কেহই জাতির সংখ্যা কয়টি বলেন নাই। বর্ত্তমানে আমরা ১০টি জাতি প্রচলিত পাইতেছি, কিন্তু বর্ত্তমানেও আমরা ভরত মতানুসারেও ১৮টি জাতি পাইতে পারি। কিরূপে পাওয়া যাইবে তাহা পরে উল্লেখ করিব। ভরতের যুগকে আমরা সামিক যুগ মনে করিতে পারি। ভরতের আগে আমরা আরও দুইটি যুগ পাই, একটি আর্চ্চিক অপরটি গাথিক। এখন আমরা বর্ত্তমানে প্রচলিত রাগ-রাগিণীর মধ্যেও ৪ স্বরের সমন্বয়ে সৃষ্ট রাগরাগিণী পাইয়াছি। চারিটি, পাঁচটি, ছয়টি এবং সাতটি পর্য্যন্ত স্বরসমূহের দ্বারা সৃষ্ট অথবা রচিত রাগরাগিণীগুলি হইতে আমরা নিম্নলিখিত জাতিগুলি পাইতেছি।

পূর্ব্বে বৈদিকযুগের স্বর নাম ও লৌকিক স্বরনামের আলোচনায় ৭টি জাতিগানের বিষয় বলিয়াছি। ১ স্বরযুক্ত জাতিগান আর্চ্চিক, ২টি স্বরযুক্ত জাতিগান গাথিক, ৩টি স্বরযুক্ত জাতিগান সামিক, ৪টি স্বরযুক্ত জাতিগান স্বরান্তর, ৫টি স্বরযুক্ত জাতিগান ঔড়ব, ৬টি স্বরযুক্ত জাতিগান ষাড়ব, ৭ স্বরযুক্ত জাতিগান সম্পূর্ণ বা সপ্তস্বর্য্য। স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ এই জাতি কয়টির আরোহণ এবং অবরোহণক্রমকে মিলাইলে আরও কয়েকটি জাতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিরূপে জাতিগুলির পরিচয় পাওয়া যাইবে তাহার নাম, উদাহরণ ইত্যাদির আলোচনা করিতেছি। ইহাদের মধ্যে শুদ্ধ ও মিশ্রজাতির সমন্বয় পাওয়া যাইবে যাহা পূর্ব্বোক্ত ভরত মতে আমরা পাইয়াছি। এক্ষণে তাহার বিবরণ দিতেছি।

স্বরান্তর ঔড়ব ঃ যে কোন ৪ স্বরের আরোহী এবং ৫ স্বরের অবরোহী।
ঔড়ব স্বরান্তর ঃ যে কোন ৫ স্বরের আরোহী এবং ৪ স্বরের অবরোহী।
স্বরান্তর ষাড়ব ঃ যে কোন ৪ স্বরের আরোহী এবং ৬ স্বরের অবরোহী।
ষাড়ব স্বরান্তর ঃ যে কোন ৬ স্বরের আরোহী এবং ৪ স্বরের অবরোহী।
স্বরান্তর সম্পূর্ণ ঃ যে কোন ৪ স্বরের আরোহী এবং ৭ স্বরের অবরোহী।
সম্পূর্ণ স্বরান্তর ঃ ৭ স্বরের আরোহী এবং ৪ স্বরের অবরোহী।
ঔড়ব ষাড়ব ঃ যে কোন ৫ স্বরের আরোহী এবং ৬ স্বরের অবরোহী।
ষাড়ব ঔড়ব ঃ যে কোন ৬ স্বরের আরোহী এবং ৫ স্বরের অবরোহী।
ঔড়ব সম্পূর্ণ ঃ যে কোন ৫ স্বরের আরোহী এবং ৭ স্বরের অবরোহী।
সম্পূর্ণ ঔড়ব ঃ ৭ স্বরের আরোহী এবং ৫ স্বরের অবরোহী।
ষাড়ব সম্পূর্ণ ঃ যে কোন ৬ স্বরের আরোহী এবং ৭ স্বরের অবরোহী।
সম্পূর্ণ ষাড়ব ঃ ৭ স্বরের আরোহী এবং ৬ স্বরের অবরোহী।

এই প্রকার জাতিগুলি মিশাইয়া সর্ব্বসমেত ২০টি জাতি পাওয়া যাইবে, যথা—(১) আর্চ্চিক (২) গাথিক (৩) সামিক (৪) স্বরান্তর (৫) ঔড়ব (৬) ষাড়ব (৭) সম্পূর্ণ (৮) স্বরান্তরঔড়ব (৯) ঔড়ব-স্বরান্তর (১০) স্বরান্তরষাড়ব (১১) ষাড়বস্বরান্তর (১২) স্বরান্তর-সম্পূর্ণ (১৩) সম্পূর্ণস্বরান্তর (১৪) ঔড়বষাড়ব (১৫) ষাড়বঔড়ব (১৬) ঔড়বসম্পূর্ণ (১৭) সম্পূর্ণঔড়ব (১৮) ষাড়বসম্পূর্ণ (১৯) সম্পূর্ণ-ষাড়ব (২০) বক্র।

যদি আমরা বৈদিক পূর্ব্ব যুগের জাতি দুইটি গ্রহণ না করি তবে আমরা কথিত ১৮টি জাতি পাইতেছি। বৈদিক পূর্ব্ব যুগের জাতি দুইটি গ্রহণ না করার হেতু স্বরূপ বলা যায় যে ঐ সময়ে সুষ্ঠু গায়নরীতির কোনরূপ ইতিহাস আমরা পাই নাই। সামিক যুগেও বেদগানের পরিচয় পাইয়াছি যদিও তাহা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং কেবলমাত্র ঈশ্বর আরাধনায় ব্যবহৃত হইত। স্বরান্তর জাতি গান সাধারণের মনোরঞ্জন উপযোগী এবং অদ্যাপিও

ঐ জাতির স্বরসমূহ দ্বারা রচিত রাগ রাগিণী প্রচলিত। সামিক জাতির সহিত অন্যান্য মিশ্রণ না করার হেতু, যে সামিক গান কেবলমাত্র ভগবৎ আরাধনার জন্য ব্যবহৃত এবং স্বরসমূহের প্রাচুর্য্য-বর্জ্জিত। এই কারণে অন্যান্য জাতির সহিত তাহার কোন মিশ্রণ করা হয় নাই। এক্ষণে 'বক্র' জাতির লক্ষণ বলা যাইতেছে। বর্ত্তমানে আমরা প্রচলিত বহু রাগ রাগিণীর আরোহীর এবং অবরোহীর, স্বাভাবিক ওঠানামার ব্যতিক্রম দেখিতে পাইতেছি, তাহাকেই 'বক্র' জাতির রাগ রাগিণী বলা হইয়াছে। যেমন আরোহণকালে পর পর তিনটি স্বর পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া পুনরায় একটি কিংবা দুইটি স্বর আরোহণ করিয়া পুনরায় উচ্চাভিমুখে আরোহণ করে এবং অবরোহণের সময়েও ক্রমানুসারে অবরোহণ না করিয়া, কয়েকটি স্বর মাত্র অবরোহণ করিয়া পুনরায় ২।৩টি স্বর আরোহণ করিয়া অবরোহণ সমাপ্ত করে তাহাকেই বক্রজাতির রাগ বা রাগিণী বলা যাইবে। বক্রজাতির রাগ রাগিণীতে যে-কোন জাতির স্বর সমাবেশ হইতে পারে।

শ্রুতি অনুপাতে স্বর স্থাপনা ঃ— বর্ত্তমানে আমরা দুই প্রকার স্বর স্থাপনা, পাইতেছি। এক প্রকার শ্রুতির নিম্ন গতিতে স্বর স্থাপনা, অপরটি উচ্চাভিমুখীগতি করিয়া স্বর স্থাপনা। এই শ্রুতি স্থাপনার বিষয় পরে বিশদভাবে আলোচনা করা যাইবে। আমরা বর্ত্তমানে ১২টি স্বর সাহায্যে রাগ রাগিণীর রূপ প্রকাশ করিতেছি। তাহার প্রবর্ত্তক 'নন্দিকেশ্বর', তিনিই মূর্চ্ছনার সাহায্যে এই পাঁচটি বিকৃত স্বর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমানে 'স' ও 'র' স্বরের মধ্যে বিকৃত 'র', 'র' ও 'গ' স্বরের মধ্যে বিকৃত 'গ', 'ম' ও 'প' স্বরের মধ্যে বিকৃত 'ম', 'প' ও 'ধ' স্বরের মধ্যে বিকৃত 'ধ', 'ধ' ও 'ন' স্বরের মধ্যে বিকৃত 'ন' পাইয়া থাকি। এই প্রথায় আমরা বর্ত্তমানের বিকৃত স্বরগুলিকে দেখিতে পাই।

ঠাট ঃ যে স্বরসমূহের দ্বারা রাগরাগিণীর গোষ্ঠীর স্বর সমাবেশকে বিশেষ রূপের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায় তাহাকেই মেল বা ঠাট বলা যায়। শ্রীভাতখণ্ডে ঠাটকে রাগের জনক আখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ঠাট হইতে রাগের উৎপত্তি। রাগগুলিকে তিনি 'জন্য' অর্থাৎ 'জাত' এই কথা বলিয়াছেন। এই মতের পরে বিশদ আলোচনা দ্বারা, অযৌক্তিকতা দেখান হইবে। শ্রীভাতখণ্ডের প্রচলিত যে ১০টি ঠাট বর্ত্তমানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহার পরিচয় দিতেছি। এই জন্য জনক ' সম্বন্ধ রত্নাকরেও পাওয়া যায়, তবে ঠাট নামে নহে।

বেলাবল ঃ—সব প্রকৃত বা শুদ্ধ স্বর।

খাম্বাজ ঃ—প্রকৃত ও বিকৃত 'ন'

কল্যাণ ঃ—প্রকৃত ও বিকৃত 'ম'

কাফি ঃ—প্রকৃত 'গ', 'ন' ও বিকৃত 'গন'

ভৈরব ঃ—বিকৃত 'র' ও বিকৃত 'ধ'

মারোয়া ঃ—বিকৃত 'র' ও বিকৃত 'ম'।

আশাবরী ঃ বিকৃত গ, ধ, ন।

পূরবী ঃ বিকৃত র, ম, ধ।

ভৈরবী ঃ বিকৃত র, গ, ধ, ন।

টৌড়ি ঃ বিকৃত র, গ, ম, ধ। ["বেঙ্কটমুখী" ষোড়শ শতাব্দীতে ৭২টি ঠাট রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে ১৫শ শতাব্দীতে রামামাত্য ২০টি মেল রচনা করিয়াছিলেন। ঠাটের আলোচনায় সমস্ত বিষয়গুলির বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যাইবে।]

বাদী ঃ রাগরাগিণীতে ব্যবহৃত স্বরসমূহের মধ্যে যে স্বরটির বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাকেই বাদী স্বর বলা হয়। ঐ স্বর, অংশরূপে ব্যবহৃত হয়। বাদী স্বরই রাগরাগিণীতে ব্যবহৃত স্বর সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান স্বর।

সমবাদী ঃ বাদী স্বর অপেক্ষা অল্পব্যবহৃত স্বরই সমবাদী।

অনুবাদী ঃ সমবাদী স্বর অপেক্ষা অল্পব্যবহৃত স্বরই অনুবাদী।

বিবাদী ঃ বিবাদী স্বর রাগ রাগিণীর স্বর সমাবেশে ব্যবহৃত হইবে কিন্তু কোনরূপেই প্রধান প্রধান প্রয়োজনীয় স্বর অর্থাৎ বাদী, সমবাদী, অনুবাদী স্বরের স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। বিবাদী স্বর, প্রধান স্বরগুলির স্থান অধিকার করিলেই রাগরাগিণীর ধারাবাহিকতা নষ্ট হইয়া যাইবে।

বৰ্জ্জিত স্বর ঃ যে স্বর রাগরাগিণীর স্বরসমাবেশে ব্যবহৃত হয় না।

বাদী সমবাদী ইত্যাদি স্বরের আলোচনা পরে বিশদভাবে করা হইয়াছে।

আকারমাত্রিক স্বরলিপি ঃ রাগরাগিণীর রূপপ্রকাশক বিশেষ সংকেতলিপি ঃ

(১) স, র, গ, ম, প, ধ, ন এই সাতটি স্বর মুদারা সপ্তকের, স্‌র্‌গ্‌ম্‌প্‌ধ্‌ন্‌ এই সাতটি স্বর উদারা সপ্তকের, র্সর্র্গর্মর্পর্ধর্ন এই সাতটি স্বর তারা সপ্তকের। বর্ত্তমানে সপ্তককে গ্রাম বলা হয়। উদারা স্বরের নিম্নে হসন্ত (্) এবং তারা গ্রামের স্বরের উপরে রেফ্ (´) চিহ্ন দেওয়া হয়।

(২) সাতটি শুদ্ধ স্বরের মধ্যে পাঁচটি স্বরের বিকৃত বা কড়ি কোমল রূপ পাওয়া যায়, যথা—বিকৃত বা কোমল র = ঋ, বিকৃত বা কোমল গ = জ্ঞ, বিকৃত, কড়ি বা তীব্র ম = হ্ম, বিকৃত বা কোমল ধ = দ, বিকৃত বা কোমল ন = ণ, স ও প স্বরের বিকৃত স্বররূপ হয় না।

(৩) **মাত্রা ঃ** । (আকার) ১ মাত্রা জ্ঞাপক। যথা সা = ১ মাত্রা, সা । = ২ মাত্রা, সা । । = ৩ মাত্রা। দুইটি স্বর একত্রে যুক্ত করিয়া যদি শেষের অক্ষরে আকার দেওয়া হয় তবে দুইটি স্বর একত্রে উচ্চারিত হইলে ১ মাত্রা, যথা সরা = ১ মাত্রা, এইরূপ এক

মাত্রায় ৩টি স্বর—সরগা, ১ মাত্রায় ৪টি স্বর—সরগমা। দুই স্বর ১ মাত্রায় উচ্চারিত হইলে প্রতিটি স্বর ½ মাত্রা, তিনটি স্বর ১ মাত্রায় উচ্চারিত হইলে প্রতিটি স্বর ⅓ মাত্রা, চারিটি স্বর ১ মাত্রায় উচ্চারিত হইলে প্রতিটি স্বর ¼ মাত্রা হিসাবে জানিতে হইবে এবং স্বরগুলি উচ্চারণ করিতে সমান সময় ব্যয় করিতে হইবে।

(৪) **অৰ্দ্ধ মাত্রা :** একক ½ মাত্রার চিহ্ন ঃ (বিসর্গ) যেমন সঃ, রঃ অর্থাৎ এক একটি স্বর ½ মাত্রা। ১½ মাত্রার স্বর, যথা—সাঃ, এইরূপে সঃ রঃ = প্রতিটি ½ মাত্রা হিসাবে ১ মাত্রা, সাঃ রঃ এইরূপে ১½ মাত্রা এবং ½ মাত্রা মিলাইয়া ২ মাত্রা, সরগাঃ এইরূপে প্রতিটি স্বর ½ মাত্রা করিয়া ১½ মাত্রা জানিতে হইবে।

(৫) **স্পর্শস্বর বা ভূষিকা :** যখন কোন আনুষঙ্গিক স্বর প্রধান স্বরকে স্পর্শ করিয়া যায় তখন সেই স্বরকে স্পর্শস্বর বা ভূষিকা বলা হয়। এই স্পর্শস্বরকে প্রধান স্বরের কিছু উপরে ছোট অক্ষরে লিখিতে হয় যথা—গ^ম মপ , প^ধ , ইত্যাদি।

(৬) **তালবিভাগ :** তালসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া ১, ২, ৩, ৪, ০ ইত্যাদি সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ভাগেই একটি সম অর্থাৎ যে স্থানে বিশেষ একটি ঝোঁক বা প্রস্বন থাকে। ০ (ফাঁক) ১, ২, ৩ বা ততোধিক থাকিতে পারে। ´ (রেফ) চিহ্নটি যে সংখ্যার মাথার উপরে থাকিবে সেই স্থানকে সম এবং যে স্থানে ০ (ফাঁক) চিহ্ন থাকে সেই স্থানকে ফাঁক বলা হয়। প্রতিটি তাল বিভাগের পর "।" (ছেদ) এইরূপ চিহ্ন বসিবে এবং তালের একটি ফের অর্থাৎ মাত্রাসমষ্টি সমাপ্ত হইলে সেইখানে '।' (স্তম্ভ) চিহ্ন বসিবে।

(৭) স্থায়ীর প্রারম্ভে যেই স্থান হইতে গীত বা গতের তাল-বাদ্যের সূচনা সেই স্থানে ও প্রত্যেক কলির শেষে '॥' (যুগল স্তম্ভ) চিহ্ন বসিবে।

(৮) যেইখানে গীত বা গত এককালীন শেষ হয় সেই স্থানে "।। ।।" এইরূপ জোড়া যুগল স্তম্ভ বসিবে। স্থায়ীর আরম্ভে এই যুগল চিহ্নের বাহিরে যে স্বর রহিবে তাহা একবার মাত্র গান বা গত আরম্ভ করার সময় গাহিতে বা বাজাইতে হইবে।

(৯) কলির শেষ অংশ " " (কোটেশনের) মধ্যে পুনঃ পুনঃ লিখিত থাকে।

(১০) { সর } এই চিহ্নকে পুনরাবৃত্তির চিহ্ন বলে অর্থাৎ এই { সর } অংশ তুইবার বলিতে হইবে।

(১১) ( ) এই প্রথম বন্ধনীর চিহ্নকে পুনরাবৃত্তি লঙ্ঘনের চিহ্ন বলে, যথা { সরা (গমা) পা } গমা, এই অংশ পুনর্ব্বার গাহিবার সময় গমা এই অংশ বাদ দিয়া সরাপাগমা এই অংশটুকু মাত্র বলিতে হইবে। পুনরাবৃত্তিকালে যে স্থানের স্বরের পরিবর্ত্তন ঘটে সেই স্থলে পরিবর্ত্তিত স্বর পূর্ব্বব্যবহৃত স্বরের মাথার উপর তৃতীয়

[গমাপমা]

বন্ধনীর চিহ্নের মধ্যে লিখিত হয়, যথা—সরাগমা।

কোনও একটি কলি বা তুক শেষ করিয়া স্থায়ীতে ফিরিবার সময় যখন স্থায়ীর কোন স্বরের পরিবর্ত্তন হয় তখন পরিবর্ত্তিত স্বর পূর্ব্বোক্ত রূপে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে লিখিত হয়। এই কলির শেষে যদি যুগল স্তম্ভ থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে স্থায়ীতে ফিরিয়া যাইয়াই কোনও পরিবর্ত্তিত স্বর গাহিতে হইবে।

(১২) সাধারণত যুক্ত স্বরগুলি পরস্পর সংযুক্তভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে। যদি কোন স্থানে উহার প্রত্যেক স্বর পৃথকভাবে উচ্চারণ করিতে হয় তাহা হইলে ঐসকল স্বরের মাথায় বিন্দু চিহ্ন দেওয়া থাকে। যথা—সা, রা, গা, ইত্যাদি।

(১৩) কোনও এক স্বর যখন আর এক স্বরে বিশেষরূপে

গড়াইয়া যায় তখন স্বরের নীচে ‿ এইরূপ মীড় চিহ্ন থাকে, যথা—সাপা, মাসা।

(১৪) স্বরবর্ণ অবলম্বনে স্বরের গতায়াত হইয়া থাকে, তাহাকে আশ বলে, আশের চিহ্ন স্বরাক্ষরগুলির মধ্যে ছোট ছোট কসি বা হাইফেন। গানের পঙ্‌ক্তিতে ০ বসে, যথা—

সা—রা—গা—মা—। পা—মা—রা—গমা ॥

কা ০ ০ হে হো ০ ০ ০

(১৫) স্বরের ক্ষণিক বিশ্রাম বা নিস্তব্ধতার নাম বিরাম। বিরামের চিহ্ন - (হাইফেন)।

(১৬) বর্জ্জিত আকার, যথা—। । । ।, যেখানে এই আকার থাকিবে এবং যে কয়টি আকার থাকিবে সেই কয় মাত্রা থামিয়া যথারীতি পরবর্ত্তী স্বরগুলি গাহিতে বা বাজাইতে হইবে। স্মরণ রাখা দরকার, স্বরের বিরাম হইতে পারে কিন্তু কোনো অবস্থায়ই মাত্রার বিরাম হইতে পারে না বা হয় না।

(১৭) স্থায়ী যে পর্য্যন্ত গাহিয়া অপর কোন কলি আরম্ভ করিতে হইবে সেই স্থানে স্বরের শিরোদেশে "॥" যুগল ছেদচিহ্ন থাকিবে, যথা—সারাগামা।

(১৮) স্থায়ী অন্তরা এবং আভোগ গাহিবার পর পুনরায় যেরূপ স্থায়ীতে ফিরিতে হয় সেইরূপ সঞ্চারী গাহিবার পর স্থায়ীতে ফিরিতে হয় না। সেইজন্য স্থায়ীর, অন্তরার ও আভোগের শেষে (**II II**) এইরূপ দুই জোড়া স্তম্ভ চিহ্ন দেওয়া হয়। সঞ্চারীর শেষে এইরূপ চিহ্ন হয় না।

(১৯) একই রকম স্বরের দুই কিংবা ততোধিক কলি থাকিলে কেবলমাত্র প্রথম কলিতে স্বর, তাল, মাত্রাদির চিহ্ন দেখিয়া তাহার নীচে গানের অপর কলিগুলি লেখা চলে।

রাগালাপঃ যে আলাপে রাগরাগিণীর পরিচয়জ্ঞাপক ১০টি লক্ষণই বিদ্যমান।

রূপালাপঃ যে আলাপে রাগরূপের লক্ষণাদি স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ এই চারিটি তুক বা কলিতে পৃথক পৃথক ভাবে গীত হয়।

রাগলক্ষণঃ যদিও স্বরসমূহদ্বারা মানব মনের রঞ্জনাকেই রাগ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে তথাপি ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য কতকগুলি নিয়মাবলী প্রচলিত। ইহার কোন একটির অভাবে রাগের রূপ ও রস সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। রাগরূপ প্রকাশ করিতে যে যে অলংকার ব্যবহৃত হয় তাহাই রাগলক্ষণ নামে কথিত। বর্ত্তমানে আমরা আরোহী, অবরোহী, জাতি, শ্রেণী, ঠাট, বাদী, সমবাদী, বিবাদী, অনুবাদী, বর্জ্জিত স্বর, গ্রহ, অংশ, ন্যাস, সময়, রস, অঙ্গ, রাগবাচক মুখ্যস্বর বা পকড়, সন্ন্যাস, অপন্যাস, বিন্যাস, বহুলত্ব, অল্পত্ব প্রভৃতি এই লক্ষণ বা অলংকারগুলিকে রাগরূপ প্রকাশ করিবার লক্ষণ বলিতে পারি।

প্রাচীনকালে রাগলক্ষণ বলিতে মেরু, মূর্চ্ছনা, শ্রেণী, জাতি, গ্রহাংশকন্যাস, বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, বিবাদী, বর্জ্জিত স্বর, অঙ্গপ্রাধান্য, সময়, রস, রাগবাচক মুখ্যস্বর পাইয়াছি। বর্ত্তমানে এই সমস্ত অলংকার অপেক্ষা অধিক অলংকার প্রয়োগ করিয়াও রাগরূপের এবং রসের সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

রাগরাগিণী-পদ্ধতি বলিতে, আমরা উত্তরভারতীয় সংগীতে তিনপ্রকার রীতির দ্বারা তাহাকে পৃথক পৃথক ভাবে বিচার করিবার রীতি মনে করিতে পারি।

(১) **মেল বা ঠাট পদ্ধতিঃ** মেল বা ঠাট বর্ত্তমানে ১০টি প্রচলিত। ভারতীয় অর্থাৎ উত্তরভারতীয় সংগীতের প্রচলিত সমস্ত রাগরাগিণীগুলিকে এই ১০টি ঠাটের অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা

প্রকাশ পাইলেও তাহা ধারাবাহিক ও নিয়মানুগভাবে করা হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ পটদীপ, যোগ ইত্যাদি বলা যায়। বৈজ্ঞানিক ও ধারাবাহিক যুক্তিদ্বারা ঠাট রচনা করিলে ১০টির স্থলে ১০২৪টি হইবে, যাহা ঠাট বা মেলের আলোচনায় বলা হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে রাগের সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়।

(২) **রাগাঙ্গ পদ্ধতি ঃ** এই পদ্ধতিতে রাগ রাগিণীগুলিকে প্রাচীন প্রথামত বিভাগ করিতে হয়—রাগ, উপরাগ, অন্তররাগ, ভাষারাগ, বিভাষারাগ ক্রিয়ারাগ ইত্যাদি। ইহাকেই রাগ-বিবেকাধ্যায়ের ২য় প্রকরণে শার্ঙ্গদেব তাঁহার সংগীতরত্নাকরে রাগাঙ্গ, উপাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ইত্যাদি ভাগে প্রকাশ করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে রাগরূপের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়।

(৩) **রাগরাগিণী পদ্ধতি ঃ** এই পদ্ধতিতে কতিপয় প্রাচীন মনীষীদিগের মতে অর্থাৎ ভরতমতে ৬ রাগ, ৩৬ রাগিণী, হনুমন্ত-মতে ৬ রাগ, ৩০ রাগিণী, প্রতিটি রাগিণীর ১টি করিয়া পুত্র, পুত্রবধূ, পুত্রসখা, পুত্রবধূসখী পাইয়াছি। আবার অনেক মতে যথা সংগীতসার, শ্রীভাতখণ্ড অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সংগীত-পদ্ধতির মতে, দশ লক্ষণ প্রযুক্ত সকল স্বর সমাবেশকেই রাগ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, যাহা সমীচীন নহে। এই পদ্ধতিতে রাগ এবং রাগিণীর পার্থক্য বজায় রাখিয়া প্রকাশ করিবার রীতি সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত।

বিদারী ঃ গীত ও আলাপের ভিন্ন ভিন্ন ছোট বড় বিভাগ বিদারী নামে প্রচলিত। প্রাচীন নিবদ্ধ গীত, যাহার আলোচনা পরে করিয়াছি, তাহা এই বিদারীর অন্তর্ভুক্ত।

রাগের তিরোভাব এবং আবির্ভাব ঃ রাগরাগিণীর পরিবেশন করিতে করিতে সেই পরিবেশিত রাগরাগিণীর স্বরসমূহের সাহায্যে এমন মাধুর্য্যমণ্ডিত স্বরসমূহ প্রয়োগ করা হয় যাহাতে পূর্ব্ব-

পরিবেশিত রাগরাগিণীর রূপটি বা ধ্যানটি হঠাৎ শ্রোতার মন হইতে দূরে সরিয়া যায় এবং তৎস্থানে একটি নূতন রাগরূপ শ্রোতার মনে জাগিয়া উঠে। যে স্বরসমাবেশের সমন্বয়ে পূর্ব্বপরিবেশিত রাগের রূপকে শ্রোতার মন হইতে দূর করিয়া দেয়, সেই স্বরসমাবেশকে তিরোভাবকারী স্বরসমাবেশ বলা হয় অর্থাৎ স্বরসমষ্টির দ্বারা পূর্ব্বপরিবেশিত রাগের তিরোভাব ঘটিয়াছে মনে করা হয়। পরক্ষণেই যে স্বরসমূহের দ্বারা পূর্ব্বপরিবেশিত রাগরূপ যথাযথ প্রকাশ করিয়া শ্রোতার মনে পূর্ব্ব পরিবেশিত রাগ রূপ প্রতিষ্ঠা করা যায়, সেই স্বরসমূহকে আবির্ভাবকারী স্বর সমাবেশ বলা হয়।

তালবিভাগ ঃ সম, তালি, খালি এইরূপ পৃথক পৃথক নামকরণ করিয়া, গীত বা গতকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

সম ঃ যে মাত্রা হইতে তালের প্রথম মাত্রা গণনা করা হয়, তাহাই সম। সমের পরিচয়কালে সংক্ষিপ্তরূপে ×(গুণন) কিংবা +(যোগ) এই দুই প্রকার চিহ্ন দেওয়া হয়। গীত বা গত যে-কোন মাত্রা হইতে আরম্ভ হইতে পারে, কিন্তু তালযন্ত্র সম হইতে আরম্ভ করার রীতি ধার্য্য করা হইয়াছে।

তালি ও খালি ঃ তালির আঘাত জনিত শব্দ তালি এবং উহার বিরতিবোধক অনাঘাতকে খালি বা ফাঁক বলা হয়।

ঠেকা ঃ যে সাঙ্কেতিক শব্দ বা ভাষার সাহায্যে তালপ্রদর্শনকারী যন্ত্র বাজানো হয় তাহাকে ঠেকা বলে।

আবর্ত্ত ঃ যে স্বরগুলির পুনঃপুনঃ প্রয়োগে তালের নির্দ্দিষ্ট মাত্রা-সমষ্টির সমাপ্তি ঘোষণা করে তাহাকে আবর্ত্ত বা কথিত ভাষায় আওর্‌দা বা ফের বলে।

চলন ঃ রাগের স্বরবিস্তারকালীন অলংকারসমূহকে চলন বলে, পকড়, আরোহী, অবরোহী ও অন্যান্য স্বর সমুদয় চলনের অন্তর্গত।

মুখচালন ঃ বিভিন্ন অলংকার অর্থাৎ মীড়, গমক ইত্যাদির

দ্বারা রাগের বিস্তারকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া পরিবেশন করাকে মুখচালন বলে।

স্থায়ঃ রাগবিস্তারের ছোট ছোট যুগল বিন্যাসকে স্থায় বলে।

উঠানঃ যে স্বরসমষ্টি হইতে রাগ আরম্ভ হয়, তাহাই রাগের উঠান বা উত্থান। প্রকৃত উত্থান হইতে রাগ আরম্ভ না করিলে রাগরূপ নষ্ট হয়। ইহা প্রায় গ্রহস্বরের সমপ্রাকৃতিক।

পরমেল-প্রকাশক রাগঃ এক ঠাটের রাগ হইতে অপর কোন ঠাটের রাগ প্রকাশ করিতে হইলে উভয় ঠাটের রাগেরই কিছু কিছু সমতা থাকা দরকার। যে সমস্ত রাগের দ্বারা এইরূপ ভাবে এক ঠাটের রাগ হইতে সামান্য সামান্য স্বরগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া অপর এক ঠাটের রাগ গান করা বা বাজান যায়, তাহাকেই পরমেলপ্রকাশক রাগ বলে। ভারতীয় হিন্দুস্থানী সংগীতে এত প্রভূত পরিমাণ রাগ রাগিণী আছে যে, এই প্রকৃতির রাগরাগিণীর কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না।

সন্ধিপ্রকাশক রাগঃ যে সমস্ত রাগরাগিণী দিবা এবং রাত্রির কিংবা রাত্রি এবং দিবার সংযোগ-মুহূর্ত্তে গীত হয় বা বাজান হয় তাহাই সন্ধিপ্রকাশক রাগরাগিণী।

আক্ষিপ্তিকাঃ তাল, স্বর ও সুরের পূর্ণ রচনাকে আক্ষিপ্তিকা বলে।

আশ্রয় রাগঃ শ্রীভাতখণ্ডের মতে প্রচলিত ঠাটগুলি যে রাগের নামধারী, সেই রাগকে আশ্রয় রাগ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু রত্নাকরে রাগ ব্যবহৃত হইয়াছে ঠাটের পরিবর্ত্তে। আশ্রয়, জন্য এবং জনক পরিচয় মত ঠিক নহে।

জনক রাগঃ শ্রীভাতখণ্ডের মতে ঠাট হইতে রাগ। ঠাট নাম বিশিষ্ট রাগগুলি জনক রাগ। এই মতও ঠিক নহে।

জন্য রাগঃ যেহেতু শ্রীভাতখণ্ডের মতে ঠাট হইতে রাগ সেই-

হেতু রাগগুলিকে তিনি জন্যরাগ বলিয়াছেন। এই মতও ঠিক নহে। রাগ এবং ঠাটের আলোচনায় ইহা জানা যাইবে।

গাহিবার সময়ঃ বিভিন্ন পুস্তক-প্রণেতারা রাগরাগিণীর পরিবেশন সময় কিরূপে নিরূপিত হইবে এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কাহারও মতের অনুসরণ না করিয়াই, সকলেই নিজ নিজ মতে এবং বুদ্ধিতে অটল। এই বিষয়বস্তুর বিশদ আলোচনা করিতে হইলে একটি বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করা দরকার। সেইজন্য সহজ এবং সরল একটি মত দেওয়া হইতেছে। পূর্ব্বাঙ্গ-প্রধান রাগরাগিণী অর্থাৎ যাহাদের বাদী স্বর স, র, গ, ম এই চারিটির কোন একটি, সেই সমস্ত রাগরাগিণী দিবা বারোটা হইতে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত গাওয়া উচিত। যে সমস্ত রাগরাগিণীর বাদী ম, প, ধ, ন এই চারিটি স্বরের যে কোন একটি অর্থাৎ উত্তরাঙ্গ-প্রধান, সেই সমস্ত রাগরাগিণী রাত্রি বারোটা হইতে বেলা বারোটা পর্য্যন্ত গাওয়া উচিত। এইরূপ পদ্ধতিতে শ্রীভাতখণ্ডে বলিয়াছেন যে, স হইতে প পূর্ব্বাঙ্গ, এবং ম হইতে র্স উত্তরাঙ্গ হিসাবে গণ্য করা উচিত। তিনিই অঙ্গপ্রাধান্য ধার্য্য করিবার কালে সরগমকে পূর্ব্বাঙ্গ এবং মপধন-কে উত্তরাঙ্গ স্বর হিসাবে ধার্য্য করিয়াছেন। এখানে দেখা যাইতেছে তিনি নিজেই নিজের মতের বিরোধিতা করিতেছেন।

রধ, ঋদ ও জ্ঞণ যুক্ত রাগরাগিণীর গাহিবার সময়ও শ্রীভাতখণ্ডে ধার্য্য করিয়াছেন। র, ধ যুক্ত স্বরসমাবেশগুলি দিবা ৭টা হইতে দিবা ১২টা এবং রাত ৭টা হইতে রাত ১২টার মধ্যে গেয়। (হিঃ সঃ পঃ)

ঋদ যুক্ত স্বরসমাবেশগুলিকে তিনি সন্ধিপ্রকাশক রাগরাগিণী বলিয়া প্রাতঃ ৪টা হইতে ৭টা এবং বৈকাল ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত গাহিবার রীতি ধার্য্য করিয়াছেন। (হিঃ সঃ পঃ)

জ্ঞণ যুক্ত স্বরসমাবেশগুলিকে তিনি দিবা ১২টা হইতে ৪টা

এবং রাত্রি ১২টা হইতে ভোর ৪টা পর্য্যন্ত সময় গাহিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। (হিঃ সঃ পঃ)

রাগ ও ঠাটের সমতা ও বিভিন্নতা ঃ ঠাটের আরোহী অবরোহী ৭ স্বর যুক্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ জাতীয় কিন্তু রাগের আরোহী অবরোহী যেকোন জাতির হইতে পারে। ঠাটে রাগরূপ প্রকাশ হয় না কিন্তু রাগ গাহিবার কালে রাগের রূপের প্রকাশ করা প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য। ঠাটে বক্রস্বরের প্রয়োগ হয় না, কিন্তু রাগে হয়। ঠাট নামধারী রাগরাগিণীগুলিও রাগরূপ প্রকাশে অক্ষম, কিন্তু যে কোন রাগরাগিণী নিজ নিজ রূপ প্রকাশে সক্ষম। ঠাট বহু রাগের গোষ্ঠী নিরূপণ করিতে পারে, যাহা রাগ পারে না। রাগের মনোরঞ্জনের ক্ষমতা আছে, কিন্তু ঠাটের নাই। প্রতিটি রাগই ঠাটের অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত।

গায়কী ও নায়কী ঃ শ্রুতির সাহায্যে অথবা গুরুদিগের নিকট হইতে কিংবা পুস্তকাদি হইতে সংগীত শিক্ষা করিয়া নিজ প্রতিভা বা সৃজনী শক্তিদ্বারা জনসাধারণের মন রঞ্জিত করিবার রীতিই গায়কী। এই গায়কীসম্পন্ন ব্যক্তিকে, বিশেষরূপে শিল্পীমনোভাবাপন্ন হইতে হইবে। যিনি পরিবেশিত সংগীত দ্বারা শাস্ত্রমত অমান্য করিয়াও কেবল প্রয়োগকুশলী হইয়া বা প্রয়োগকৌশলদ্বারা মানব মনকে মুগ্ধ ও মোহিত করিতে সক্ষম তিনিই গায়কী গুণসম্পন্ন কৃতী শিল্পী। গোয়ালিয়র ঘরোয়ানার শিল্পিগণ এই প্রয়োগ-নৈপুণ্যের জন্য সমধিক বিখ্যাত। এই গায়কী প্রথাই গায়ন রীতি রূপে প্রচলিত। যাঁহাদের সংগীত-প্রতিভা শাস্ত্রজ্ঞানে সমুজ্জ্বল এবং যাঁহারা শাস্ত্রসম্মত উপায়ে তথা শাস্ত্রকথিত মতে সংগীত পরিবেশন করিতে সক্ষম তাঁহারাই নায়কী গুণসম্পন্ন। এই নায়কী গুণসম্পন্ন শিল্পিগণই উৎকৃষ্ট সংগীত-শিক্ষক হইতে পারেন। প্রাচীনকাল হইতেই "ধার" প্রদেশের গায়কগণ নায়কী গুণসম্পন্ন

এবং এই কারণেই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই নায়কী প্রথাই ধারা-বাহিক শাস্ত্রীয় মতের পরিপোষক।

গায়নশৈলী : সংগীত পরিবেশনের রীতিকেই গায়নশৈলী বলে।

সংগীত : নৃত্য, গীত, বাদ্য এই তিনটি কলার একত্র সমাবেশই সংগীত নামে খ্যাত। গীতকে শ্রাব্য এবং বাদ্য ও নৃত্যকে দৃশ্য-সংগীত বলা হয়।

সংগীতের জাতি : সংগীতকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা ১২ প্রকার জাতি পাই। আমরা, যাহাদ্বারা সংগীতের আভ্যন্তরীন পার্থক্য বুঝিতে পারি তাহাকেই সংগীতের জাতি বলা হয়। গীত, বাদ্য, নৃত্য, গীত ও বাদ্য, বাদ্য ও নৃত্য, গীত ও নৃত্য, গীত প্রধান নৃত্য অপ্রধান, গীত প্রধান বাদ্য অপ্রধান, নৃত্য প্রধান বাদ্য অপ্রধান, নৃত্য প্রধান গীত অপ্রধান, বাদ্য প্রধান নৃত্য অপ্রধান, বাদ্য প্রধান গীত অপ্রধাম, আমরা এই ১২ প্রকার সংগীতের জাতি পাইতেছি।

মুখ্যসংগীতপদ্ধতি : ইহা দুই প্রকার, একটি উত্তরভারতীয় অপরটি দক্ষিণভারতীয়।

দক্ষিণ পদ্ধতি ও উত্তর পদ্ধতির সংগীতের তুলনা : উভয় প্রকার রীতি বা পদ্ধতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। উভয় পদ্ধতিতে এক একটি সপ্তকে প্রকৃত ও বিকৃত স্বর একত্রে ১২টি। উভয় পদ্ধতিতে ৭টি শুদ্ধ ও ৫টি বিকৃত স্বরের সাহায্যে ঠাট রচনা করা হইয়াছে। উভয় পদ্ধতিতে ঠাট রাগ অর্থাৎ জন্য-জনক সম্বন্ধ স্বীকৃত (হিঃ সঃ পঃ)। উভয় পদ্ধতির গায়নরীতিতে আলাপ তান ইত্যাদির প্রয়োগ হয়। উপরি উক্ত তুলনাগুলি উভয় পদ্ধতির গায়নশৈলীর সাদৃশ্য এবং নিম্নোক্তগুলি বৈসাদৃশ্য।

স্বর নাম

উত্তরভারতীয় স = দক্ষিণভারতীয় স।

উত্তরভারতীয় ঋ = দক্ষিণভারতীয় র।

উত্তরভারতীয় র = দক্ষিণভারতীয় ৪ শ্রুতি র বা গ।

উত্তরভারতীয় জ্ঞ = দক্ষিণভারতীয় ৬ শ্রুতি র বা সাধারণ গ।

উত্তরভারতীয় গ = দক্ষিণভারতীয় অন্তর গ।

উত্তরভারতীয় ম = দক্ষিণভারতীয় ম।

উত্তরভারতীয় হ্ম = দক্ষিণভারতীয় প্রতি ম।

উত্তরভারতীয় প = দক্ষিণভারতীয় প।

উত্তরভারতীয় দ = দক্ষিণভারতীয় ধ।

উত্তরভারতীয় ধ = দক্ষিণভারতীয় ৪ শ্রুতি ধ বা ন।

উত্তরভারতীয় ণ = দক্ষিণভারতীয় ৬ শ্রুতি ধ বা কৌশিক ন।

উত্তরভারতীয় ন = দক্ষিণভারতীয় কাকলী ন।

উভয় পদ্ধতির স্বরের নাম ভিন্ন এবং উচ্চারণপদ্ধতি ভিন্ন।

উভয় পদ্ধতির তালপ্রকার ভিন্ন এবং ভাষা ভিন্ন।

উভয় পদ্ধতির রাগনাম ভিন্ন, গান ও গমক ক্রিয়ার পদ্ধতি ভিন্ন।

দাক্ষিণাত্য পদ্ধতির সংগীতে ম ও প স্বর একত্রে বর্জ্জন করা যায়, কিন্তু উত্তরভারতীয় সংগীতে যায় না।

উভয় পদ্ধতির ঠাট রচনার প্রকৃতি ভিন্ন।

উভয় পদ্ধতির ঠাটের সংখ্যা ভিন্ন, যথা—শ্রীভাতখণ্ডে প্রণীত উত্তরপদ্ধতিতে ১০টি ঠাট প্রচলিত এবং বেঙ্কটমুখী প্রবর্ত্তিত দাক্ষিণাত্য পদ্ধতিতে ৭২টি ঠাট প্রচলিত। ১০টি ঠাটের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে ৭২টি ঠাটের পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

৭২টি ঠাট পদ্ধতিঃ রচয়িতা বেঙ্কটমুখী (১৬শ শতাব্দী)। ইহাকে কর্ণাটক ঠাট পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে ৭টি প্রকৃত ও ৫টি বিকৃত স্বরকে ২ ভাগে ভাগ করিয়া ৬ × ৬ = ৩৬ ঠাট রচনা করা হইয়াছে। উদাহরণের দ্বারা বলা যায় সরগম, সঋগম, সরজ্ঞম, সঋজ্ঞম, সঋরম, সজ্ঞগম, এই ৬টি পূর্ব্বার্দ্ধে এবং পধনস, পদনস, পধণস, পদণস, পদধস, পণনস, এই ৬টি পাই অপরার্দ্ধে। এখন

পূর্ব্বার্দ্ধের একটির সহিত অপরার্দ্ধের ৬টির যোগে পাই ৬টি, এইরূপে প্রতিটির সহিত যদি অপরার্দ্ধের ৬টি যোগ করা হয় তবেই আমরা পাই ৩৬টি।

এখন শুদ্ধ ম স্বরের স্থলে হ্ম প্রয়োগ করিয়া আমরা আরও ৩৬টি ঠাট একই প্রকারে পাইব। বেঙ্কটমুখী এই প্রকারে ৭২টি ঠাট রচনা করিয়াছেন।

বেঙ্কটমুখী রাগের সংখ্যা নিম্নলিখিত উপায়ে রচনা করিয়া ৪৮৪টি রাগসংখ্যা ধার্য্য করিয়াছেন। উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে ঃ সম্পূর্ণ= ১, ষাড়বসম্পূর্ণ=৬, সম্পূর্ণষাড়ব=৬, সম্পূর্ণঔড়ব=১৫, ঔড়ব-সম্পূর্ণ=১৫, ষাড়বষাড়ব=৩৬, ষাড়বঔড়ব=৯০, ঔড়বষাড়ব= ৯০, ঔড়বঔড়ব=২২৫=মোট ৪৮৪।

এক্ষণে প্রাচীন যুগের গীতরীতির আলোচনা করিতেছি।

নিবদ্ধগান ঃ দেশী সংগীতের অন্তর্ভুক্ত এই গীতরীতি প্রাচীন কালের গায়নশৈলী। বর্ত্তমানে আমরা এই প্রকার গীতরীতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রূপ পাইয়াছি। ধ্রুবপদ অর্থাৎ ধ্রুপদ বর্ত্তমানে যাহা প্রচলিত, তাহাও ঐ প্রকার গীতরীতির অন্তর্ভুক্ত। সুবিন্যস্ত স্বর-সাহায্যে গীত হয় বলিয়াই নিবদ্ধ সংগীতের নাম গীত। কথিত আছে লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই সংগীত সামবেদ হইতে সঙ্কলন করিয়া দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি ভরত ইত্যাদিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি তাল, স্বর, মাত্রা এবং গণ দ্বারা এই গীতকে সুশোভিত করিয়া পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রসিদ্ধ গীতের ৫টি প্রসিদ্ধ নাম পাওয়া যায়, যথা—রূপ, রূপক, বস্তু, প্রবন্ধ ও গেয়। এই প্রসিদ্ধ গানের অর্থাৎ নিবদ্ধ গানের ৫টি ভাগ নির্দ্দেশিত। ১ম উদ্‌গ্রাহ—যে ভাগের অবলম্বনে গীতের আরম্ভ, ২য় মেলাপক—যে ভাগটি মধ্যবর্ত্তী হইয়া গীতের ১ম অংশের সহিত ৩য় অংশকে মিলাইয়া দেয়। এই প্রথম অংশকে বর্ত্তমানে স্থায়ী এবং ২য় অংশকে অন্তরা

বলা হইয়া থাকে। ধ্রুব—ইহা ৩য় অংশ, যে ভাগটি সকল গীতেই ব্যবহৃত হয়। অন্তর—ইহা ৪র্থ ভাগ, বর্ত্তমানে আমরা ইহাকে ২য় স্থানে পাই এবং প্রাচীনকালের গীতে ধ্রুব এবং ৫ম ভাগের পার্থক্য বজায় রাখার জন্যই এই অংশের প্রয়োজন হইয়াছিল। ৫ম অংশের নাম আভোগ অর্থাৎ যে ভাগ পূর্ণতার জন্য ব্যবহৃত হয়।

নিবদ্ধ গানের ৬টি অঙ্গ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে: পদ—অর্থ-বাচক শব্দ, তাল—প্রাচীনকালের প্রচলিত মাত্রাসমষ্টি, স্বর—ষড়জ, ঋষভ ইত্যাদি ৭টি স্বর, পাট—বাদ্যসমুদ্ভূত অক্ষরাদি, তেন—মাঙ্গলিক শব্দবিশেষ, বিরদ—দেবতা বা রাজার গুণবাচক শব্দ।

নিবদ্ধ গানের ৫টি জাতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পদ, তাল প্রভৃতি ৬টি অঙ্গই যে গীতে বিদ্যমান তাহা মেদিনী জাতীয়া, ৫টি অঙ্গযুক্ত বিদিনী জাতীয়া, ৪ অঙ্গযুক্ত দীপিনী জাতীয়া, ৩ অঙ্গ-যুক্ত বিলম্বিনী জাতীয়া এবং ২ অঙ্গযুক্ত তারাবলী জাতীয়া নামে কথিত।

নিবদ্ধ গীতের গণ ৮টি। ছন্দ ও গীতশাস্ত্রে ৩টি অক্ষর একত্রে রচিত হইলে তাহাকে গণ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ম গণ, ন গণ, ভ গণ, জ গণ, য গণ, ত গণ, স গণ ও র গণ এই ৮ প্রকার গণ আমরা পাইয়াছি। মানবসমাজের দেবত্বলাভ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, সম্মান, ঐশ্বর্য্য, মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ বা প্রাপ্তির পথনির্দ্দেশের জন্যই এই গণ কল্পনা করা বা প্রয়োগ করা হইত। পৃথক পৃথক ভাবে গণের গুণাবলীর বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমানে নিষ্প্রয়োজন।

অনিবদ্ধ গান: ইহাও একপ্রকার দেশী সংগীতের অন্তর্ভুক্ত গীতরীতি। ইহাও নিবদ্ধ গানের ন্যায় প্রাচীনকালেরই একরূপ গীতপদ্ধতি। উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক প্রভৃতি অংশ, পদ, তাল প্রভৃতি অঙ্গ, মেদিনী, বিদীনী প্রভৃতি জাতি এবং ম গণ, ন গণ প্রভৃতি গণ

যে রীতিতে ব্যবহৃত হয় না বা হয় নাই তাহাই অনিবদ্ধ গান বলিয়া কথিত। রত্নাকর এই সমস্ত প্রকৃতির গানকেই অনিবদ্ধ বা আলপ্তি গান বলিয়াছেন।

এখন বর্ত্তমানে গীতরীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

স্বরমালিকাঃ কোন রাগে ব্যবহৃত স্বরসমুদয়কে তালবদ্ধ করিয়া গাওয়ার নাম। উহা রাগবিশেষের রূপ প্রকাশ করে এবং দুই তুক সম্পন্ন।

লক্ষণ গীতঃ যে গীতে রাগবিশেষের ১০ লক্ষণ বাক্য রচনায় প্রকাশ করিয়া তালবদ্ধ করিয়া গাওয়া হয় তাহাই লক্ষণ গীত। ইহা ২ তুক বা ৪ তুকের হইতে পারে।

টপ্পাঃ ইহা লঘু প্রকৃতির গীতরীতি। ইহার বাণী সাধারণ মানবসমাজের প্রেম ভক্তি আশ্রয় করিয়া রচিত। ইহা সাধারণত দুই তুকে গীত হইয়া থাকে। ইহাতে তান, বাণীর বিস্তার সহযোগে তান, মীড়, গমক, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি অলংকার ব্যবহৃত হয়। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে গিট্‌কারী সমন্বিত দ্রুত তানই অধিক ব্যবহৃত হয়। রাগরাগিণী শুদ্ধভাবে পরিবেশন করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা গোলাম নবীকে ইহার প্রবর্ত্তক বলিয়া জানি। শোরী মিঞাঁ, রমজান মিঞাঁ প্রভৃতি উত্তরভারতীয় এবং রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), লালচাঁদ বড়াল, জিতেনবাবু (কালোবাবু), কালীপদ পাঠক প্রভৃতি বাংলার গুণীদিগকে এই শ্রেণীর গায়ক হিসাবে সমধিক বিখ্যাত বলিয়া মনে করি।

ঠুংরীঃ ইহা একপ্রকার লঘু প্রকৃতির অলংকারযুক্ত গায়ন পদ্ধতি। যদিও ইহাতে মীড়, আশ, গমক ইত্যাদি ধ্রুপদের, এবং তান, গিট্‌কারী ইত্যাদি খেয়ালের অলংকারাদি প্রয়োগ করা হয় তথাপিও ইহার রীতি চটুল। রাগরাগিণীর মিশ্রণেই এই গায়ন রীতির বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। শুদ্ধ রাগরাগিণীর মাধ্যমে এই রীতির

গীত পরিবেশিত হইলেও রাগরাগিণীর শুদ্ধতা রক্ষা করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য নহে। এই রীতিতে নব নব রস সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণকে মোহিত করাই প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। বহু প্রাচীনকাল না হইলেও কয়েক শত বৎসর হইতেই ইহা প্রচলিত। এই শ্রেণীর গায়ক হিসাবে উত্তরভারতের গায়ক তথা বাংলার বহু বিশিষ্ট গায়কগণের মধ্যে বর্ত্তমানে গোলাম আলি এবং শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি গুণিগণ সমধিক প্রসিদ্ধ। গোলাম আলির গায়কীতে চটুলতা দ্বারা মানুষ আকৃষ্ট, কিন্তু তারাপদবাবুর গায়কীর ধীর স্থির সংযত ভাবের মাধ্যমে পরিবেশিত রস মানুষকে শুধু মুগ্ধ করে না, এক গভীর অনুভূতির সন্ধান দেয়।

খেয়াল : এই গায়ন পদ্ধতির আলোচনায় প্রথমেই জানা দরকার কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা এই রীতি প্রবর্ত্তিত। কে এই রীতির প্রবর্ত্তক তাহা লইয়া নানারূপ মতভেদ আছে। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, পারসিক পণ্ডিত আমীর খস্রু পাঠানবংশীয় বাদশাহ আলাউদ্দিন খিল্জীর সভাগায়ক এবং মন্ত্রী ছিলেন। তিনি কাওয়াল নামক, যাহাদের গীত অদ্যাপিও কাওয়ালী নামে পরিচিত, এইরূপ প্রকৃতির গায়ক পারস্যদেশ হইতে আনাইয়া দরবারে তাহাদের গান করাইয়াছিলন। ঐ প্রকৃতির গীতে তৎকালে তান ইত্যাদি ২।৪ প্রকার অলংকার থাকা সত্ত্বেও তাহা খেয়াল অ্যাখ্যা প্রাপ্ত হয় নাই এবং বিশেষ সমাদরও লাভ করে নাই। আমীর খস্রু প্রচলিত এই রীতির গায়ন পদ্ধতি যদি সমাদর লাভ করিত, তবে আমরা ঠিক তৎপরবর্ত্তী সময়ে, তানসেনের যুগেও এই প্রকৃতির গানের পরিচয় পাইতাম। যেহেতু আমরা তাহা পাই নাই সেই-হেতু ঐ গীতরীতির স্রষ্টা বা প্রবর্ত্তক হিসাবে আমরা আমীর খস্রুকে গ্রহণ করিতে পারি না।

আমীর খস্রুর পর আমরা পাই জৌনপুর নিবাসী সিরকী-

বংশীয় রাজা সুলতান হোসেন সিরকী। তিনি ১৫শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার সৃষ্টি জৌনপুরী টৌড়ি, একথা সর্ব্ববাদি-সম্মত। ঐ রাগ প্রাচীন প্রচলিত ধ্রুবপদের কোনও গীতে পাওয়া যায় নাই। তানসেন-বংশের রবাবী মহম্মদ আলি খাঁ জৌনপুরীর স্বরসমাবেশকে আশাবরী ও গান্ধারী মিশ্রণজাত একপ্রকার দ্রুত বা ধূন পদ্ধতির রাগ বলিতেন। তিনি এইরূপ আরও দুই চারিটি লঘুপ্রকৃতির কাওয়াল গানের গীতরীতির সমপর্য্যায়ভুক্ত ধূন সৃষ্টি করিয়াছিলেন যাহা খেয়াল গায়নরীতির পর্য্যায়ে ধরা যায় না। এই মত রামপুরের বীণকার উজির খাঁ সাহেবেরও। উইলার্ড সাহেব তাঁহার 'Treatise of Hindu Music' পুস্তকে হোসেন সিরকীকে খেয়াল গায়নরীতির স্রষ্টা হিসাবে মানিয়া লইলেও তৎসাময়িক অন্য কোন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি এবং পুস্তক প্রণেতারা তাহা স্বীকার করেন নাই।

আমীর খস্‌রু এবং সুলতান হোসেন সিরকীর পরে আমরা পাই নিয়ামত খাঁকে, যিনি পরে শাহ সদারঙ্গ উপাধি গ্রহণ করেন। পুস্তকাদি হইতে জানা যায়, সম্রাট আকবরের সভার বীণকার মিশ্রী সিংহ, যিনি পরে নৌবাৎ খাঁ নাম ধারণ করিয়া তানসেনের মুসলমান স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা সরস্বতীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহারই ঔরসে সরস্বতীর গর্ভে নিয়ামৎ খাঁর জন্ম। এই নিয়ামৎ খাঁর পিতা বীণকার এবং মাতা গায়কবংশীয় হওয়ায় তিনি উভয় প্রকার সংগীতেই পারদর্শী ছিলেন। নিয়ামৎ খাঁর সময়ে জানা যায় যে, তৎকালীন বাদশাহ মহম্মদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮ খৃঃ অঃ) নর্ত্তকীগণের চটুল নৃত্যগীতের আকর্ষণে উচ্চাঙ্গ সংগীতের যোগ্য সমাদর করিতেন না। তাঁহার সভাসদবর্গও একই মোহে আবিষ্ট হইয়া উচ্চাঙ্গ সংগীতের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। মহম্মদ শাহের দরবারেই তানসেনের

দৌহিত্র নিয়ামৎ খাঁ বীণকাররূপে সভাসদ ছিলেন। তিনি তৎকালে দরবারে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি ঐরূপ অবহেলা দেখিয়া কয়েকটি সুকণ্ঠ সুবেশসম্পন্ন কাওয়াল গায়ককে প্রাচীন নিবদ্ধগান, তৎকালে বা বর্ত্তমানে যাহাকে ধ্রুপদ বলা হইত এবং হয়, তাহা অপেক্ষা কিছু লঘুতালের গীতরীতি সৃষ্টি করিয়া এবং তাহাদের দ্বারা ঐ সংগীত দরবারে এবং জনসমাজে পরিবেশন করাইয়া যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করেন। এই প্রকারের গীতরীতি তিনি নিজবংশের কাহাকেও শিক্ষা দিলেন না। নিজ বংশধরদের শিক্ষা না দেওয়ার একমাত্র হেতু এই যে, এই রীতির গায়নশৈলীতে রাগের বিশুদ্ধতা বিশেষরূপে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। যেহেতু রাগরাগিণীসকল পরিবেশনকালে অশুদ্ধরূপে পরিবেশিত হইয়া জনসমাজের ক্ষতি করিবে এবং নিজ বংশের সুনাম নষ্ট হইবে এইরূপ চিন্তায় এবং আশঙ্কায় ঐ রীতি নিজ বংশধরগণকে শিক্ষা দেন নাই। তৎকালীন ধ্রুপদ গায়কগণও সদারঙ্গ অর্থাৎ নিয়ামৎ খাঁকে খেয়ালের স্রষ্টা হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন। তৎকালীন গুণিগণ আরও বলিয়াছেন যে তানসেনবংশীয় গায়ক গুলাব খাঁয়ের সহিত তাঁহার মনোমালিন্যের ফলেই তিনি ঐ প্রকার গীতরীতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে, গায়কগণই তৎকালে বাদক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিতেন। তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বীণকার হওয়া সত্ত্বেও গুলার খাঁ-এর গানের সহিত তাঁহাকে সঙ্গত করিতে হইত এবং পশ্চাতের আসনে বসিতে হইত। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের ভাব যথেষ্ট পরিমাণ ছিল এবং এই রেষারেষির ভাব মিশ্রী সিং-এর সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই প্রকৃতির গায়কী রীতিতে নিয়ামৎ খাঁ তান, বাট, মীড়, গমক, আশ, গিট্‌কারী, স্বর বিস্তার প্রভৃতি সমস্ত প্রকার অলংকারই ব্যবহার করিয়াছেন। ধ্রুপদে ব্যবহৃত তাল অপেক্ষা লঘুতালের

ব্যবহার করিয়া ধ্রুপদ হইতে ইহার পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া মানব সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

গোয়ালিয়রের প্রাচীনতম খেয়াল গায়ক মহম্মদ খাঁ এই রীতির ধারক এবং বাহক। তাঁহার শিষ্য হিসাবে হস্‌সু খাঁ, হদ্দু খাঁ ও নত্থু খাঁ সমধিক প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে আমরা গোয়ালিয়রের শ্রীকৃষ্ণ রাও, মুস্তাক হোসেন, বেহেরুবুয়া, শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তীদিগকে সমধিক বিখ্যাত শিল্পীরূপে পাইতেছি।

ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ ঃ বর্ত্তমানে প্রচলিত ভারতীয় সংগীতে আমরা প্রধানত চারিপ্রকার গীতরীতি পাইয়া থাকি। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী এই চারিপ্রকার রীতি। গজল, বেক্তা, গজাই ও রুবাই আদি প্রাদেশিক গীতি টপ্পা ও ঠুংরীর অঙ্গীয় বলা যাইতে পারে। ইহারা বিদেশ হইতে এদেশে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার গীতির নিম্নেই নিজেদের কিঞ্চিৎ স্থান করিয়া লইয়াছে।

প্রাচীন গ্রন্থে বর্ত্তমান প্রণালীর ধ্রুপদ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ তো দূরের কথা ধ্রুপদ নামটিরও উল্লেখ পাওয়া যায় না। ধ্রুবপদ বলিয়া একটি শব্দের উল্লেখ কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় কিন্তু তাহার গীতরীতি সম্বন্ধে কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। বোঝা যায় ভগবৎ আরাধনার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ গীতি সেকালে প্রচলিত ছিল।

ধ্রুপদ গানের প্রথম প্রচলন আমরা দেখিতে পাই ১৩শ শতাব্দীতে। ১২৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঠান বংশীয় বাদশাহ আলাউদ্দিন রাজত্ব করেন। এই সময়ে তাঁহার দরবারে বৈজ বাওয়া নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ গায়ক এবং গোপাল নায়ক নামক জনৈক সংগীতবিশারদ দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান ছিলেন। সেই সময়ে আমীর খস্‌রু নামক জনৈক পারস্যদেশীয় সংগীতকলাবিদও মন্ত্রীরূপে ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

তিনি অতিশয় চতুর ও স্বদেশের শিক্ষা ও সভ্যতার অভিমানী ছিলেন এবং নানা শাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি তদানীন্তন প্রসিদ্ধ গায়ক গোপাল নায়ককে পরাভূত করিবার জন্য প্রথমে তাঁহাকে সম্রাটের দরবারে গান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করাইয়া নিজে সম্রাটের সিংহাসনের নীচে লুকাইয়া তাঁহার গান শুনিয়া পরে পারস্যদেশীয় সংগীতের ও হিন্দুস্থানী সংগীতের মিশ্রণে নানারূপ রাগরাগিণী রচনা করিয়া দরবারে গান করিয়া অন্যায়ভাবে গোপাল নায়ককে পরাভূত করিয়া নিজের এবং নিজ দেশের সুনাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ঘটনা নানা পুস্তক হইতেও পাওয়া যায়।

এলফিন্‌ষ্টোনের ভারত ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ১২৫৬ খৃঃ গয়াসুদ্দিন তুঘ্‌লকের পুত্র মহম্মদ তুঘ্‌লক আমীর খস্‌রুকে পারস্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আনাইয়াছিলেন। অন্যান্য ইতিহাসবেত্তা বলেন, ১২৫৬—১২৮৭ খৃঃ পর্য্যন্ত গয়াসুদ্দিন বলবন এবং গয়াসুদ্দিন তুঘ্‌লক ১৩২০—১৩৪৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই দুই প্রকার মতভেদের যাহাই সত্য হউক না কেন, এই ১৩শ শতাব্দীতেই সংসারবিবাগী বৈজু বাওয়া ও গোপাল নায়ক এই উভয়ের মধ্যে কাহারও কৃতিত্বে ধ্রুপদ রচিত ও প্রচলিত হইয়াছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। বৈজু বাওয়া ও গোপাল নায়ক রচিত বহু ধ্রুপদ গীত, যাহা অদ্যাপিও সুপ্রচলিত, তাহা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্য প্রমাণাভাবে ধ্রুপদের জন্মদাতা ও জন্মকাল আমরা কথিত রূপেই মানিয়া লইতে বাধ্য। কথিত আছে গোপাল নায়ক তৎকালে আলাউদ্দিনের দরবারে গায়ক হিসাবে বসবাস করিতেছিলেন। বৈজুর সহিত গোপালের দরবারেই প্রথম সাক্ষাৎ। সেইকালেই তিনি স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারি তুক বিশিষ্ট কতকগুলি ধ্রুপদ রচনা করিয়া দরবারে গাহিয়াছিলেন। মনে হয় এই সময় হইতে ধ্রুপদের প্রথম প্রচলন। অহোবল,

ইহার প্রায় ৪০০ বৎসর পর অর্থাৎ ১৭শ শতাব্দীতে সংগীত-পারিজাত রচনা করেন। ১৩শ শতাব্দীতে গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহের স্ত্রী মৃগনয়নী, যিনি গুর্জ্জররাজের কন্যা, সংগীতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন এবং গুর্জ্জরী হইতে মালবগুর্জ্জরী, মঙ্গলজর্জ্জরী, বংগালগুর্জ্জরী এই তিনটি মিশ্র রাগিণীর সৃষ্টি করিয়া বিশেষ যশস্বিনী হইয়াছিলেন। মাননীয় পপ্‌লি সাহেব তাঁহার Music in India নামক পুস্তকে অম্বরাধিপতি মানসিংহ, যিনি আকবরের সেনাপতি ছিলেন, তাঁহাকেই মহারাজ মানসিংহের পরিচয়ে পরিচিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইতিহাসেই পাওয়া যায় গোয়ালিয়র অধিপতি মানসিংহের সময়ে আকবর শাহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সংগীতসার পুস্তকে ধ্রুবক নামে ধ্রুপদের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা অন্য কোন পুস্তকে পাওয়া যায় নাই এবং তিনি কোথা হইতে এই নামটি পাইয়াছেন তাহার কোন বিবরণ না দেওয়ায় এটি প্রামাণ্য বলিয়া মনে করা যায় না। সাধারণত চারিটি তুক বিশিষ্ট গীতকেই ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ বলা হইয়াছে এবং এই নামগুলিই আমরা ১৩শ শতকে রচিত সংগীতরত্নাকর পুস্তক হইতে জানিয়াছি, যদিও সেই সময়ের ও এই সময়ের নামগুলির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

গীতের বা প্রবন্ধের প্রারম্ভিক অংশের নাম উদ্‌গ্রাহ। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এবং অন্যান্য অংশগুলিরও পরিচয় দিয়াছি। পারিজাতের মতেও আমরা গীতের যে ৫টি ভাগ পাইয়াছি, অর্থাৎ উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, অন্তর, আভোগ। ইহাদের পরিচয় বিশদরূপেই দিয়াছি। মনে হয়, গুণী ব্যক্তিগণ ইহা হইতেই চারিটি অংশ গ্রহণ করিয়া চারি পাদ বা তুক বিশিষ্ট ধ্রুপদ রচনা করিয়াছেন। সংগীতপারিজাত পাঠে জানা যায় যে, তিনি সংগীত-রত্নাকরকে বহু ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়াছেন। ধ্রুবপদ নামক

গীতরীতির ক্ষেত্রেও আমরা তাহা দেখিতে পাইব। সংগীতরত্নাকর, ভারতীয় এবং পারসীয় মতের সমন্বয়ে রচিত। এই সংগীত-রত্নাকর প্রথামত ধ্রুবপদ গান ও রাগালাপের পদ্ধতি নানা দোষত্রুটিপরিপূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। এই সময়ের পরে অর্থাৎ ১৬শ শতাব্দীতেই তানসেনের জন্ম। তিনি এই সময়ে রত্নাকর-প্রচলিত গায়ন প্রথাকে মার্জ্জিত করিয়া ধ্রুবপদ ও রাগালাপকে অনুশীলন দ্বারা রাগবিস্তার ভিত্তিকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে, তিনিই স্থায়ী ও সঞ্চারীর মিশ্রণে অন্তরার সৃষ্টি করেন এবং আজও স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারিটি তুক বা পাদসমন্বিত ধ্রুবপদ গীত হইতেছে। আমরা বৈজু বাওয়াকে তানসেনের বহু পূর্ব্বে পাইয়াছি এবং তাঁহার রচিত গীত হইতে আমরা চারিটি তুক বিশিষ্ট ধ্রুপদের পরিচয় জানিয়াছি। কতিপয় ইতিহাসবেত্তারা তানসেনকে এই চারিটি তুকের প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে তাহা জানা নাই।

বাংলার কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে ছন্দ, প্রবন্ধ, যুগলবন্ধ এবং ধারু এই ৪ প্রকার গায়ন রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই চারিটি রীতি ধ্রুপদ গায়ন রীতির অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে ইহাদের পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

ছন্দঃ যে ধ্রুপদের বাণীর মধ্যে ছন্দ এই শব্দটি ব্যবহৃত হয় তাহাকেই ছন্দরীতির ধ্রুপদ বলা হইয়াছে।

প্রবন্ধঃ যে ধ্রুপদের বাণী নানা প্রকার তালে পরিবর্ত্তিত করিয়া গাওয়া হয় তাহাকে ধ্রুপদে প্রবন্ধ বলে।

যুগলবন্ধঃ—যে ধ্রুপদ গায়নে একজন সুর ও মাত্রাসহযোগে রাগ বর্ণনা করেন, অপর ব্যক্তি রাগরূপ শুদ্ধ রাখিয়া স্বরপ্রয়োগে তাল-যোগে স্বরের বর্ণনা করেন সেই প্রকৃতির গীতরীতিকেই যুগলবন্ধ ধ্রুপদ বলে।

ধারু ঃ যে ধ্রুপদে ধারু এই শব্দটি ব্যবহৃত হয় তাহাকেই ধারু রীতির ধ্রুপদ বলা হয়।

ধ্রুপদের নাম প্রবন্ধ, ইহা পাওয়া যায় রত্নাকরের যুগে। রত্নাকর ও পারিজাত প্রবন্ধের ৬টি অঙ্গ নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহারা বলিয়াছেন যে ৬টি অঙ্গ স্বীকৃত হইলেও প্রতিটি গীতে ৬টি অঙ্গই থাকিবে বা না থাকিলে সেই গীত বা প্রবন্ধ গীতযোগ্য হইবে না এরূপ নহে। দুইটি অঙ্গ হইতে ৬টি অঙ্গ পর্য্যন্ত রচিত বিভিন্ন জাতির শাস্ত্রীয় গীত অদ্যাবধি প্রচলিত।

বর্ত্তমানে আমরা ধ্রুপদের গায়নরীতির চারিপ্রকার ভেদ পাইতেছি।

গৌড়হার ঃ ইহার প্রবর্ত্তক তানসেন বলিয়া কথিত। ইঁহার পিতার নাম মকরন্দ পাঁড়ে। ইনি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রবাদ যে তিনি বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামীর শিষ্য। ইঁহারই রচিত বা পরিবেশিত গায়নশৈলী গৌড়হার নামে খ্যাত।

ডাগুর বা ডাগর ঃ ইহার প্রবর্ত্তক বৃজচান্দ, ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। দিল্লীর নিকট ডাগুর নামক স্থানে ইঁহার জন্ম। ইঁহার রচিত বাণীর নাম ডাগর বাণী।

খাণ্ডার ঃ ইহার প্রবর্ত্তক রাজা সম্মুখন্ সিংহ। ইঁহার অপর নাম মিশ্রী সিং। ইনিই পরে তানসেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া নৌবাদ খাঁ নাম গ্রহণ করেন। ইঁহার বাসস্থান খাণ্ডার এবং ইঁহার রচিত বাণীই খাণ্ডার বাণী নামে প্রচলিত।

নওহার ঃ ইহার প্রবর্ত্তক শ্রীচান্দ, ইনি জাতিতে রাজপুত, ইঁহার প্রচলিত বাণী নওহার বাণী নামে খ্যাত।

বর্ত্তমানে আমরা এই চারি প্রকার বাণী এবং গীতরীতি মহম্মদ দবীর খাঁর নিকট শুনিতে পাই। এই ৪ প্রকার গীতে বাণীর যে তারতম্য এবং গায়ন রীতির যে পার্থক্য পাইয়াছি তাহাতে মনে

হয় পূর্ব্বোক্ত বাণীগুলির পূর্ব্বোক্ত রূপ ব্যাখ্যা ঠিক নহে। হইতে পারে উঁহারাই এই প্রকার বাণীর প্রবর্ত্তক, কিন্তু প্রত্যেকের জাতি এবং বাসস্থানের নামেই যে গায়ন রীতি প্রচলিত তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। অথচ এইরূপ উদাহরণও বিরল নয়। নিজ দেশ বা জন্মভূমির প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা বা মোহ থাকা অন্যায় নহে। আমার ধারণাপ্রসূত মত এ সম্বন্ধে কিরূপ তাহাই শুধু জানাইতেছি। প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন চিন্তা করার অবকাশ আছে, কিন্তু জনসাধারণ এ সম্বন্ধে নিজ ইচ্ছামত চিন্তা বা মত দ্বারা ইহা গ্রহণ বা বর্জ্জন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

যে চারিপ্রকার বাণীর নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহার কারণ কেবলমাত্র গায়কী পদ্ধতির অর্থাৎ অলংকারাদি প্রয়োগের ভেদ বুঝাইবার জন্য, তাহা মনে হয় না ; রস ও ভাবের ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ করার আকাঙ্ক্ষাও ইহার সহিত জড়িত।

যাহাকে গৌড়হার বাণী বলা হইয়াছে তাহার আরও একটি প্রচলিত নাম পাওয়া যায়। এই নাম গওহর বাণী। ইহা হইতে নিশ্চয় মনে করিতে পারি যে, গম্ভীর ও গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ বাণী অর্থাৎ যে বাণীর অর্থ নিগূঢ়, আধ্যাত্মিক ভাবের পরিপূরক এবং ভগবৎপ্রার্থনার উপযুক্ত। যে বাণী আমরা বৈজু বাওয়া, গোপাল এবং তানসেন, হিন্দু থাকাকালীন যে সমস্ত গীত রচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে পাইয়াছি। প্রাচীন মনীষীগণ ডাগর বাণী বলিতে সমাস সমন্বিত দীর্ঘ পদ সংযুক্ত বাক্য রচনাকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। খাণ্ডার বাণী বলিতে খণ্ড খণ্ড অর্থাৎ ছোট ছোট বাণী বা পদ সম্বলিত পদকেই মনে করিতে পারি। অনুরূপ ভাবেই নওহার অর্থে নূতন নূতন পদ সংযোজন রীতির গায়ন পদ্ধতিকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। আমার মনে হয় যাঁহারা তানসেনকে

গওহারী পদ্ধতির স্রষ্টা মনে করেন তাঁহারা নির্ভুল নহেন। কারণ তানসেনের জন্মের বহু পূর্ব্বেই অর্থাৎ ১৩শ শতাব্দীতেই বৈজু বাওয়া, গোপাল নায়ক প্রভৃতি ঐ গওহারী পদ্ধতির গায়ক, গীত রচয়িতা এবং ধ্রুপদ গায়ন রীতির স্রষ্টা। স্বামী হরিদাসও মনে হয় ঐ পদ্ধতিরই গায়ক ছিলেন। সেই কারণে তানসেন গওহর বাণী এবং পদ্ধতির স্রষ্টা বলা বোধ হয় ঠিক নহে। আমরা প্রাচীন যুগে বৈজু বাওয়া, গোপাল নায়ক এবং তানসেনকে মধ্যযুগে, নাসিরুদ্দীন, চন্দন চৌবে প্রভৃতি ধ্রুপদ গীত বিশারদকে বর্ত্তমানে পাইয়ছি। অধুনা যদিও ২।৪ জন এইরূপ রীতির গায়ককে পাইতেছি তথাপি তাঁহাদিগকে সমধিক প্রসিদ্ধ বলা চলে না।

শ্রাব্য বা অধীত; গৃহীত বা কিম্বদন্তী প্রচলিত মতামতে, সংগীত সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছি এই পর্য্যন্ত তাহারই আলোচনা করিয়াছি। লিখিত বিষয়গুলি হইতে প্রচলিত উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া অসম্ভব নহে।

ইহার পরের অধ্যায়ে যে বিষয়টি আলোচিত হইবে তাহা বিশেষ জটিল কিন্তু মৌলিক। এই বিষয়টি যতদূর সম্ভব সহজসাধ্য এবং সরল রীতিতে বর্ণনা করিয়াছি। বিষয়বস্তুটি বৈজ্ঞানিক যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত এবং ধারাবাহিকতায় পুষ্ট । এই বিষয়ের বিভিন্ন অধ্যায় বিভিন্ন প্রকার গুণাবলীসম্পন্ন।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংগীত

[এই অধ্যায়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে স্বরসৃষ্টির রহস্য, কম্পনসংখ্যার মাধ্যমে প্রকৃত ও বিকৃত স্বর, কম্পনসংখ্যার অনুপাতে প্রাচীন যুগের তিনটি স্বর নির্ণয়, কম্পন সংখ্যার অনুপাতে মাতৃকা, মাতৃকার বিশ্লেষণ, মাতৃকা ও মেরু, মাতৃকার গুণাবলী, মাতৃকার মাধ্যমে রাগ ও রাগিণী পৃথক করিবার পদ্ধতি এবং শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার, মাতৃকার সাহায্যে শ্রেণীবিচার, মাতৃকার সাহায্যে রাগরাগিণীর মিশ্রণের মান নিরূপণ তথা পৃথকীকরণ, মাতৃকার মূল্য এবং মর্য্যাদা ; এই সমস্ত বিষয়গুলি বিশেষ জটিল হওয়া সত্ত্বেও যথাসাধ্য সহজবোধ্য করিয়া আলোচিত হইয়াছে।]

বর্ত্তমানে আমরা ৭টি প্রকৃত এবং ৫টি বিকৃত অর্থাৎ ৭টি প্রকৃত স্বর হইতেই ৫টি বিকৃত স্বর সৃষ্টি করিয়া ১২টি স্বর পাইয়াছি। আমরা পুনরায় সেই ১২টি স্বর হইতে ৭টি স্বর এবং ঐ ৭টি স্বর হইতে এমন তিনটি স্বর পাইতে চাই, যাহা দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমরা বৈদিক তথা প্রাচীন প্রথার মার্গ ও দেশী সংগীতের সমস্ত উপাদান-গুলি অর্থাৎ রাগ, রাগিণী, জাতি, শ্রেণী, বাদী, সমবাদী ইত্যাদির ধারাবাহিক ও নিয়মানুগ প্রথায় গুণানুসারে পাইতে পারি।

আমরা ধাতু অর্থে সুর বা স্বর, এবং মাত্রা অর্থে সময় বলিতে পারি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আকাশ হইতে নাদ বা শব্দের উৎপত্তি। বাতাস সেই শব্দকে বহন করিয়া লইয়া আসে বা যায়। আমাদের কানের মধ্যে যে শব্দগ্রাহী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাতলা চামড়া আছে তাহার উপর যখন সেই বায়ু আঘাত করে তখনই কম্পন বা আন্দোলন সৃষ্টি হয়। ঐ আঘাত-জনিত শব্দ যখন আমাদের দেহের শিরা উপশিরা দিয়া মস্তকে প্রবেশ করে তখনই আমরা শব্দের অনুভূতি অনুভব করি। বস্তুর কম্পনই শব্দের অনুভূতির

কারণ। বাতাসই শব্দকে চালিত এবং বাহিত করে। বাতাসের অপেক্ষা অন্যান্য কঠিন বস্তুর শব্দ বহন করার ক্ষমতা আরও অধিক। বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়াছেন আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে অর্থাৎ মেঘ না থাকে, বায়ুর উত্তাপ যদি ৬০০° হয় তবে বাতাস সেকেণ্ডে ৭৫০ হাত অর্থাৎ ৩৭৫ গজ, জল বাতাস অপেক্ষা ৪ গুণ বেশী অর্থাৎ ৩০০০ হাত বা ১৫০০ গজ শব্দকে বহন করিতে পারে। এইরূপ শুক্‌না কাঠ পারে বায়ু অপেক্ষা ১১ গুণ অধিক অর্থাৎ সেকেণ্ডে ৮২৫০ হাত বা ৪১২৫ গজ, যে কোনো ধাতু পারে ১৪ গুণ অধিক অর্থাৎ ১০৫০০ হাত বা ৪৬৪৫ গজ শব্দকে বহন করিতে পারে। বায়ুর অপেক্ষা প্রত্যেকেরই শব্দ বহন করার ক্ষমতা অধিক। আগেই বলিয়াছি নাদের নানা সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য মানুষের কণ্ঠেও আছে। যথা—উচ্চতা, কোমলতা, মধুরতা, উত্থান, পতন, কম্পন ইত্যাদি। নাদের এই কম্পন হইতেই শ্রুতি এবং শ্রুতি হইতেই স্বরের বা সুরের সৃষ্টি। এই স্থলে সুর না বলিয়া স্বর বলাই বোধহয় যুক্তিযুক্ত।

কম্পন হইতে কিরূপ স্বর সৃষ্টি তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। কম্পনের প্রভূত বেগ থাকা চাই। বিজ্ঞানবিদ্‌গণের গবেষণা ও সিদ্ধান্ত হইতে শব্দের কম্পনসংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। শব্দের কম্পনসংখ্যা সম্বন্ধে কেহ বলিয়াছেন ৮টি পূর্ণ কম্পনের কম ও ১৬৩৮৪টি কম্পনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক কম্পন-সংখ্যা হইতে সৃষ্ট শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হয় না। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, ১৬টি কম্পনসংখ্যা দ্বারা সৃষ্ট শব্দ হইতে ৪৮০০০ কম্পনসংখ্যা দ্বারা সৃষ্ট শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। যাহাই শ্রুতিগোচর হউক বা না হউক, তাহা আমাদের বিচার্য্য নহে। শব্দবিজ্ঞানবিদ্‌গণের (অর্থাৎ হেলম্ সহেল, টিন্ডাল প্রভৃতির) মত হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, কম্পনসংখ্যা

হইতেই শব্দের উৎপত্তি এবং এই বিষয়ে ইঁহারা সকলেই একমত।

কোন বস্তুর কোন নির্দ্দিষ্ট কালের অর্থাৎ সময়ের মধ্যে কম্পনের আধিক্য ও অল্পত্ব অনুসারে স্বর উচ্চ বা নিম্ন হয়। উচ্চ অর্থে তীব্র এবং নিম্ন অর্থে মৃদু। কোন নির্দ্দিষ্ট কম্পনসংখ্যাকে যদি 'স' নাম দিয়া ঐ সময়ের মধ্যেই কম্পনসংখ্যাকে ক্রমশই বাড়াইয়া যাওয়া হয় অর্থাৎ দ্রুত করা হয় তাহা হইলে ঐ নির্দ্দিষ্ট কম্পনের ঠিক দ্বিগুণ কম্পনেও আর একটি 'স' স্বর পাওয়া যাইবে যাহা নির্দ্দিষ্ট 'স' স্বরের সহিত মিলিয়া প্রায় একই স্বর শুনাইবে। এইরূপে একই সময়ের মধ্যে কম্পনসংখ্যাকে যতই দ্রুত করা যাইবে, স্বর ততই তীব্র হইবে আর মধ্যে মধ্যে একটি দ্বিগুণ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট 'স' স্বর পাওয়া যাইবে। যতগুলি 'স' স্বর পাওয়া যাইবে প্রত্যেকেরই প্রথম নির্দ্দিষ্ট 'স' স্বরের সহিত কিছু মিল থাকিবেই। নিম্নে একটি তালিকার দ্বারা কম্পনসংখ্যার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে এবং কতগুলি 'স' স্বর পাওয়া যাইবে তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। নিম্নে কম্পনসংখ্যার তালিকা দেওয়া হইতেছে।

উদাহরণ (১) : কম্পনসংখ্যা।

স,	র,	গ,	ম,	প,	ধ,	ন,	স,
.১,	১ ১/৮,	১ ১/৪,	১ ১/৩,	১ ১/২,	১ ২/৩,	১ ৭/৮,	২
২,	২ ১/৪,	২ ১/২,	২ ২/৩,	৩,	৩ ১/৩,	৩ ৩/৪,	৪
৪,	৪ ১/২,	৫,	৫ ১/৩,	৬,	৬ ২/৩,	৭ ১/২,	৮
৮,	৯,	১০,	১০ ২/৩,	১২,	১৩ ১/৩,	১৫,	১৬
১৬,	১৮,	২০,	২১ ১/৩,	২৪,	২৬ ২/৩,	৩০,	৩২
৩২,	৩৬,	৪০,	৪২ ২/৩,	৪৮,	৫৩ ১/৩,	৬০,	৬৪
৬৪,	৭২,	৮০,	৮৫ ১/৩,	৯৬,	১০৬ ২/৩,	১২০,	১২৮
১২৮,	১৪৪,	১৬০,	১৭০ ২/৩,	১৯২,	২১৩ ১/৩,	২৪০,	২৫৬

স	র	গ	ম	প়	ধ	ন	স
২৫৬,	২৮৮,	৩২০,	৩৪১ ১/৩,	৩৮৪,	৪২৬ ২/৩,	৪৮০,	৫১২
৫১২,	৫৭৬,	৬৪০,	৬৮২ ২/৩,	৭৬৮,	৮৫৩ ১/৩,	৯৬০,	১,০২৪
১,০২৪,	১,১৫২,	১,২৮০,	১,৩৬৫ ১/৩,	১,৫৩৬,	১,৭০৬ ২/৩,	১,৯২০,	২,০৪৮
২,০৪৮,	২,৩০৪,	২,৫৬০,	২,৭৩০ ২/৩,	৩,০৭২,	৩,৪১৩ ১/৩,	৩,৮৪০,	৪,০৯৬
৪,০৯৬,	৪,৬০৮,	৫,১২০,	৫,৪৬১ ১/৩,	৬,১৪৪,	৬,৮২৬ ২/৩,	৭,৬৮০,	৮,১৯২
৮,১৯২,	৯,২১৬,	১০,২৪৫,	১০,৯২২ ২/৩,	১২,২৮৮,	১৩,৬৫৩ ১/৩,	১৫,৩৬০,	১৬,৩৮৪

আমরা এই কম্পনসংখ্যার তালিকা হইতে ১ সেঃ ১ কম্পন-সংখ্যায় ১টি, ১ সেঃ ২ কম্পনসংখ্যায় ১টি, এইরূপে ১ সেকেণ্ডে ১৬৩৮৪টি কম্পনসংখ্যা পর্য্যন্ত ১৫টি 'স' স্বর পাইলাম যাহা দ্বিগুণ সম্বন্ধ বিশিষ্ট স্বরের অর্থাৎ 'স' স্বরের সহিত মিলিয়া প্রায় এক স্বর শুনাইবে। ১ সেঃ কম্পনের নির্দ্দিষ্ট 'স' স্বরের সহিত প্রত্যেকটি 'স' স্বর বা অন্যান্য স্বরেরও কিছু কিছু মিল থাকিবে। এখন সেঃ ৮টি কম্পনের কিংবা ১৬টি কম্পনের স্বর অথবা ১৬৩৮৪টি কিংবা ৪৮০০০ কম্পনের স্বর আমাদের শ্রুতিগোচর কিনা ইহা আমাদের গবেষণার বিষয়বস্তু নহে। এই কম্পনসংখ্যার মধ্য হইতে ২৫৬ বার কম্পনের 'স' স্বরকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'সি' নামে স্কেল বা মাপ ধার্য্য করিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে ২৫৬ বার কম্পনযুক্ত স্বর ও তাহার দ্বিগুণ কম্পনযুক্ত অর্থাৎ ৫১২ কম্পনসংখ্যার স্বরের মধ্যে আরও ৬টি স্বর পাওয়া যাইতেছে। একটি নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে আর ৬টি স্বর পাওয়া যাইবে না বলিয়া প্রাচীন হিন্দু সংগীতজ্ঞগণ 'স' স্বরকে ষড়জ নাম দিয়াছেন। "ষট্ জায়ন্তে যস্মাৎ" অর্থাৎ যেটি বা যাহা হইতে আরও ৬টির উৎপত্তি হইয়াছে।

বৈদিক যুগের প্রথম স্বর কোন্‌টি এই আলোচনায় "বেণোর্মধ্যমঃ প্রথম সঃ" বলা হইয়াছে। বেণুর প্রথম স্বর কোন্‌টি তাহা বলেন নাই। পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে নিশ্চয়ই আমরা বলিতে পারি যে,

প্রথম স্বর না পাইলে অন্যান্য স্বর ৬টি কিছুতেই পাওয়া যাইবে না বা যাইতে পারে না।

কম্পনের সংখ্যা সেঃ ২৫৬ হইতে বাড়াইয়া সেঃ ২৮৮ কম্পন-সংখ্যায় যে স্বর পাওয়া যাইবে তাহাকে ‘র’ স্বর বলা যাইবে। এইরূপ কম্পনসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়াইয়া অর্থাৎ দ্রুত করিয়া যাওয়াতে আমরা সেঃ ৩২০ কম্পনসংখ্যায় ‘গ’ স্বর, সেঃ ৩৪১$\frac{১}{৩}$ কম্পনসংখ্যায় ‘ম’ স্বর, সেঃ ৩৮৪ কম্পনসংখ্যায় ‘প’ স্বর, সেঃ ৪২৬$\frac{২}{৩}$ কম্পনসংখ্যায় ‘ধ’ স্বর এবং সেঃ ৪৮০ কম্পনসংখ্যায় ‘ন’ স্বর পাইব। ইহাদের অর্থাৎ এই স্বরগুলির সকলেরই প্রথমনির্দ্দিষ্ট ‘স’ স্বরের সহিত কমবেশী কিছু মিল থাকিবেই।

কম্পনসংখ্যার তালিকা দেখিলেই বোঝা যাইবে যে, সেকেণ্ডে ১ কম্পন হইতে সেঃ ১৬৩৮৪ কম্পন পর্য্যন্ত কতগুলি ‘স’ স্বর আমরা পাইয়াছি। আমরা ১৫টি ‘স’ এবং ১৪টি সপ্তক বা গ্রাম ঐ কম্পন-সংখ্যার তালিকা হইতে পাইব। ইউরোপীয়গণ এক ‘স’ স্বর হইতে অপর ‘স’ স্বর অর্থাৎ ৮টি স্বর গণনা করিয়া অক্টেভ বলিয়াছেন। হিন্দু বা ভারতীয় সংগীতে বৈদিক যুগ হইতেই ৭টির অধিক প্রকৃত স্বর কোন মনীষীই কেন নির্ম্মাণ করিতে পারেন নাই এবং ইহার বৈজ্ঞানিক যুক্তিই বা কি, তাহার ব্যাখ্যা করিতেছি। প্রকৃত স্বর-নির্ম্মাণের আলোচনায় আমাদের গণিতের সাহায্য লইতে হইবে।

‘স’ স্বরের কম্পন সেঃ ১ ধার্য্য করিলে তাহার কি অনুপাত হইতে পারে এবং অন্যান্য স্বরগুলির কম্পনসংখ্যা কি হইবে তাহা আমরা কম্পনসংখ্যার তালিকা দেখিলেই জানিতে পারিব। কম্পন-সংখ্যার তালিকায় আমরা ‘স’—১, ‘র’—১$\frac{১}{৮}$, ‘গ’—১$\frac{১}{৪}$, ‘ম’—১$\frac{১}{৩}$, ‘প’ ১$\frac{১}{২}$, ‘ধ’—১$\frac{২}{৩}$, ‘ন’—১$\frac{৭}{৮}$ এইরূপ পাইয়াছি। বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়াছেন যে, স্বরের যে স্থানেই ৪ : ৫ : ৬ এই সহজ অনুপাত দেখা যায় সেই স্থানেই ‘স’ স্বরের সহিত অপর স্বর কয়টির মিল বেশী।

ইহার পর আমরা ১০ : ১২ : ১৫, এই অনুপাতের মিল পাইব। প্রাচীন যুগের মনীষীরা বলিয়াছেন যে, উদাত্ত ও অনুদাত্তের মিশ্রণে স্বরিত অর্থাৎ 'সমাহারঃ স্বরিতঃ'। এই পাঠ হইতে আমরা মনে করিতে পারি যে স্বরিতের সহিত উদাত্ত এবং অনুদাত্ত এই দুইটি স্বরের মিল বেশী।

বৈজ্ঞানিকগণ কিরূপে ৪ : ৫ : ৬ এই অনুপাতে স্বর নির্ম্মাণ কালে কোন্ কোন্ স্বর পাইয়াছেন তাহার আলোচনা করিতেছি। স, গ ও প ইহাদের অনুপাত ৪ : ৫ : ৬, প, ন ও র্ ইহাদের অনুপাত ৪ : ৫ : ৬ ; ম্, ধ্ ও স ইহাদের অনুপাতও ৪ : ৫ : ৬। উদারা, মুদারা এবং তারা অর্থাৎ এই তিন গ্রামের স্বরসমন্বয় হইতে ৭টির অধিক প্রকৃত স্বর সাংগীতিক সহজ মিলে কিছুতেই পাওয়া যাইবে না। কম্পনসংখ্যার তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ম্ ও ধ্ স্বরের কম্পনসংখ্যাকে দ্বিগুণ করিলেই আমরা ম ও ধ স্বর পাইব এবং র্ স্বরের কম্পনসংখ্যাকে অর্দ্ধেক করিলেই র স্বর পাইব। এই সহজ মিলে অর্থাৎ ৪ : ৫ : ৬ এই অনুপাতে ৭টির অধিক প্রকৃত স্বর আমরা পাইতে পারি না এবং ইহার অপেক্ষা অধিক প্রকৃত স্বর সাংগীতিক মিলে কিছুতেই নির্ম্মাণ করা যাইবে না।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিকৃত স্বর স্থাপনা কিরূপে করা যায় তাহার আলোচনা করিতেছি। প্রাচীন যুগে নন্দিকেশ্বর বিকৃত স্বরস্থাপনা করিয়াছিলেন। ২ সংখ্যার সহিত ৪ সংখ্যার যেরূপ সম্বন্ধ, বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিলে ২ কম্পন সংখ্যক স্বরের সহিত ৪ কম্পন সংখ্যক স্বরের ঠিক সেই একরূপ সম্বন্ধ নহে। একটি স্বর ২ বার কাঁপিলে বা আন্দোলিত হইলে কম্পনের ফলে একটু পার্থক্য হইবেই, উহা দ্রুত এবং তীব্র হইবে। একটি স্বরের অপেক্ষা অপর আর একটি স্বরের, কম্পনের ফলে কিরূপ পার্থক্য এবং কতখানি পার্থক্য

ঘটিতেছে তাহা জানিতে হইলে ২টি স্বরেরই অনুপাতের প্রয়োজন। এই যে পার্থক্য, ইহাকেই অন্তর বা তফাৎ বলা হয়। স্বরের অন্তর বাহির করিতে হইলে যেরূপ অনুপাত হইবে তাহা স্বরের অন্তর বিচার ও বিকৃত স্বরের স্থান নির্ণয়কালে লিখিত হইতেছে।

স্বরের অন্তর বা তফাৎ বাহির করিতে হইলে যেরূপ অনুপাত হইবে তাহা লিখিতেছি। এই তফাৎ বা অন্তর না জানিলে বিকৃত স্বর কিরূপে সৃষ্টি বা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে তাহা জানা যাইবে না।

(স$\frac{২৭}{২৪}$=র$\frac{৯}{৮}$) (র$\frac{৩০}{২৭}$=$\frac{১০}{৯}$গ) (গ$\frac{৩২}{৩০}$=ম$\frac{১৬}{১৫}$) (ম$\frac{৩৬}{৩২}$=প $\frac{৯}{৮}$) (প$\frac{৪০}{৩৬}$=ধ$\frac{১০}{৯}$) (ধ$\frac{৪৫}{৪০}$=ন$\frac{৯}{৮}$) (ন$\frac{৪৮}{৪৫}$=স$\frac{১৬}{১৫}$)। এইরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অন্তর ভারতীয় সংগীতে প্রাচীন কাল হইতেই রহিয়াছে। এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাগগুলিকে ভারতীয় সংগীতে শ্রুতি বলা হইয়া থাকে, (গীতসূত্রসার)। বৈদিক তথা প্রাচীন যুগের মনীষীগণ ভারতীয় সংগীতের শ্রুতিগুলি ৪,৩,২,৪,৪,৩,২ এইরূপ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তিন প্রকার অন্তর অর্থাৎ বৃহৎ, মধ্য ও ক্ষুদ্র অন্তর পাই। শ্রুতির স্থান নিরূপণ হইতে আমরা ১ম, ৪র্থ ও ৫ম স্থান পাই বৃহৎ অন্তররূপে, ২য় ও ৬ষ্ঠ স্থান পাই মধ্য অন্তররূপে, ৩য় ও ৭ম স্থান পাই ক্ষুদ্র অন্তররূপে। এক্ষণে 'স' ও 'র' ইহার মধ্যে যে বৃহৎ অন্তর তাহার মধ্যে একটি স্বরস্থাপনা করিলে সেই স্বরটি 'স' অপেক্ষা তীব্র ও র স্বর অপেক্ষা মৃদু হইবে। এই স্থাপিত বা প্রাপ্ত স্বরটিকে স তীব্র বা র কোমল বলিব। বর্ত্তমানে ঐ স্বর ঋ নামে প্রচলিত। এইরূপ র স্বর ও গ স্বরের মধ্য অন্তরে জ্ঞ, গ ও ম স্বরের মধ্যবর্ত্তী অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় কোন স্বরস্থাপনা করা যায় নাই। ম ও প স্বরের বৃহৎ অন্তরে একটি স্বর, সেইটিকে হ্ম বলা হয়; প ও ধ স্বরের বৃহৎ অন্তরে একটি স্বর, সেইটিকে দ বলা হয়; ধ স্বর ও ন স্বরের মধ্য অন্তরে একটি স্বর, সেইটিকে ণ বলা হয়; ন স্বর ও পরবর্ত্তী

গ্রামের বা সপ্তকের স স্বরের অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় তাহার মধ্যে কোন স্বর স্থান না পাওয়ায় স্বর পাওয়া যাইবে না। আমরা বলিতে পারি স ও ম স্বরের কোন মৃদু স্বর পাইলাম না। আমরা 'স' স্বরের তীব্র না বলিয়া ঋ বলিলাম, 'র' স্বরের তীব্র স্বর জ্ঞ বলিলাম, আমরা 'প' স্বরের তীব্র স্বরটিকে দ বলিলাম, 'ধ' স্বরের তীব্র স্বরকে ণ বলিলাম। কেবলমাত্র 'ম' স্বরটির ক্ষেত্রে আমরা তীব্র স্বর বলিয়াছি, তাহা যদি না বলিতাম তবে আমরা স ও ম স্বর ২টির বিকৃত রূপ পাই নাই বলিতাম। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা হ্ম বলা প্রথা বলিয়া স ও প স্বরের বিকৃত রূপ পাই না এইরূপই বলিয়া থাকি। এই প্রথায় আমরা আধুনিক যুগের রীতিতে অর্থাৎ অনুলোম প্রথায় শ্রুতি স্থাপনার রীতিকেই নির্ভুল বলিয়া মনে করি।

সহজ মিল অর্থাৎ ৪ : ৫ : ৬ এই অনুপাত হইতে কিরূপে ৭টি প্রকৃত স্বর পাওয়া গিয়াছে, তাহা বলিয়াছি। সেই ৭টি স্বর হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এমন তিনটি স্বর সন্ধান করা প্রয়োজন, যাহার সাহায্যে আমরা ভারতীয় সংগীতের গুণাবলীর ও অলংকারাদির বিচার করিতে পারি। এই বিচার অবশ্যই নিয়মানুগ পদ্ধতিতে হওয়া চাই। স্বর তিনটিকে বৈদিক যুগের কিংবা পৌরাণিক যুগের, প্রাচীন যুগের বা আধুনিক যুগের উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত অথবা তিনটি স্বরমাত্র যাহাই বলি, তাহা কিরূপে পাওয়া যাইবে তাহাই বলিতেছি। আমরা মুদারা সপ্তকে ৪ : ৫ : ৬ এই অনুপাতে স, গ, প, র্ন এই চারিটি প্রকৃত স্বর পাইয়াছি। এই স্বর কয়টিকে তিন তিন হিসাবে বিভক্ত করিলে আমরা সগপ ও গপন এই দুইটি বিভাগ পাই। সগপকে পুনরায় বিভক্ত করিলে আমরা আরও দুইটি বিভাগ পাইব। একটি সগ, অপরটি গপ।

এক্ষণে যদি গপ জোড়ের 'গ' কে মেরু অর্থাৎ ১ম স্বর ধার্য্য করিয়া লই তবে গপ জোড়ের পরিবর্ত্তিত রূপ হয় সজ্ঞ। আমরা সগপ ও গপন এই দুইটি ভাগ হইতে যথাক্রমে সগপ ও সজ্ঞপ পাইতেছি। গপনএর পরিবর্ত্তিত রূপ সজ্ঞপ, 'গ'কে 'স' বা মেরু ধার্য্য করিলে 'প' স্বর পরিবর্ত্তিত হয় 'জ্ঞ' স্বরের স্থানে এবং 'ন' স্বর 'প' স্বরের স্থান অধিকার করে। 'গ' স্বরকে মেরু ধার্য্য করিয়া, অর্থাৎ 'স' স্বর হিসাবে ধার্য্য করিয়া গপন স্বর তিনটি একত্রে গাহিলে বা বাজাইলে সজ্ঞপ এই প্রকার রূপই পাওয়া যায়। সগপ এই তিনটি স্বরের একত্রে নামকরণ করা হইল "মাতৃকা"। মাতৃকা, স্বর বা বর্ণকে বলা হইয়াছে যথা স, র, গ ইত্যাদি স্বর এবং অ, আ, ক, খ ইত্যাদি বর্ণ। ২টি মাতৃকার একত্র সমাবেশকে 'জোড়' বলিব। আমরা সপ্তকের প্রতিটি স্বর হইতে এইরূপভাবে সগপ ও সজ্ঞপ এই প্রকার দল পাইতেছি। অতএব আমরা সগ ও সজ্ঞ এইমাত্র প্রভেদ পাই। এই 'গ' বা গান্ধারের মানেই সমস্ত ভারতীয় সংগীতের প্রয়োগ ধারাবাহিকরূপে নিরূপিত করিতে পারিব। এই গান্ধারের সম্মানের এবং মর্য্যাদার জন্যই মনে হয়, প্রাচীন এবং বৈদিক কালের মনীষীরা এই স্বরকেই গন্ধর্ব্বগণের আনন্দদায়ক স্বর বলিয়াছেন। আরও বলা বোধ হয় অন্যায় বা অসমীচীন নহে, যে এই জন্যই ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রকে গন্ধর্ব্ববেদ আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল বা হইয়াছে। আমরা কেবলমাত্র সজ্ঞ ও সগ সম্বন্ধে 'গ' স্বরটির রূপের প্রভেদ পাইতেছি। 'স' ও 'প', 'গ' স্বরটিকে মূল বীজরূপে উভয় দিক হইতে রক্ষা করিতেছে। সগপ ও সজ্ঞপ এই দুই দলে সকল স্বরকে সমাবেশ করা যাউক। সগপকে পুরুষ এবং সজ্ঞপকে স্ত্রী হিসাবে ধার্য্য করা যাউক। সগপ দলভুক্ত যে সকল মাতৃকা অন্যান্য স্বর হইতে পাওয়া যাইবে

তাহাদেরও পুরুষ মাতৃকা দলভুক্ত করিতে হইবে ও সজ্ঞপ দলভুক্ত যে সমস্ত মাতৃকা অন্যান্য স্বর হইতে পাওয়া যাইবে তাহাদেরও স্ত্রী মাতৃকা দলভুক্ত করিতে হইবে। সগপ পুরুষ মাতৃকা এবং সজ্ঞপ স্ত্রী মাতৃকা ধার্য্য করিয়া আমরা ১২টি স্বরের মধ্য হইতে কতগুলি মাতৃকা পাইতে পারি তাহার আলোচনা করিতেছি। সগপকে পুরুষ এবং সজ্ঞপকে স্ত্রী মাতৃকা বলার যুক্তিস্বরূপ বলা যায় যে, সগপ দলভুক্ত যে সমস্ত মাতৃকা তাহাদের প্রাধান্য তথা-কথিত 'রাগে'র মধ্যে পাওয়া যায় এবং সজ্ঞপ দলভুক্ত যতগুলি মাতৃকা তাহাদের প্রাধান্য আমরা তথাকথিত 'রাগিণী'গুলির মধ্যে পাইব বা পাওয়া যায়। পরে এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিয়াছি।

উদাহরণ (২) ঃ মাতৃকা।

(১) (স) সগপ (পুং)—গপন (স্ত্রী)। (২) সজ্ঞপ (স্ত্রী)—জ্ঞপণ (পুং)।
(৩) (ঋ) ঋমদ (পুং)—মদস (স্ত্রী)। (৪) ঋগদ (স্ত্রী)—গদন (পুং)।
(৫) (র) রক্ষধ (পুং)—ক্ষধঋ (স্ত্রী)। (৬) রমধ (স্ত্রী)—মধস (পুং)।
(৭) (জ্ঞ) জ্ঞপণ (পুং)—পণর (স্ত্রী)। (৮) জ্ঞক্ষণ (স্ত্রী)—ক্ষণঋ (পুং)।
(৯) (গ) গদন (পুং)—দনজ্ঞ (স্ত্রী)। (১০) গপন (স্ত্রী)—পনর (পুং)।
(১১) (ম) মধস (পুং)—ধসগ (স্ত্রী)। (১২) মদস (স্ত্রী)—দসজ্ঞ (পুং)।
(১৩) (ক্ষ) ক্ষণঋ (পুং)—ণঋম (স্ত্রী)। (১৪) ক্ষধঋ (স্ত্রী)—ধঋগ (পুং)।
(১৫) (প) পনর (পুং)—নরক্ষ (স্ত্রী)। (১৬) পণর (স্ত্রী)—ণরম (পুং)।
(১৭) (দ) দসজ্ঞ (পুং)—সজ্ঞপ (স্ত্রী)। (১৮) দনজ্ঞ (স্ত্রী)—নজ্ঞক্ষ (পুং)।
(১৯) (ধ) ধঋগ (পুং)—ঋগদ (স্ত্রী)। (২০) ধসগ (স্ত্রী)—সগপ (পুং)।
(২১) (ণ) ণরম (পুং)—রমধ (স্ত্রী)। (২২) ণঋম (স্ত্রী)—ঋমদ (পুং)।
(২৩) (ন) নজ্ঞক্ষ (পুং)—জ্ঞক্ষণ (স্ত্রী)। (২৪) নরক্ষ (স্ত্রী)—রক্ষধ (পুং)

মাতৃকাগুলির ধারাবাহিকতা মাতৃকার উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে এবং লিখিত বিষয় হইতে সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে।

'স' স্বর হইতে প্রাপ্ত মাতৃকার জোড়-মাতৃকাটি 'গ' স্বরের মূল-মাতৃকা এবং উভয় স্বরই সগ সম্বন্ধবিশিষ্ট। পুনরায় একই রূপ প্রকৃতিতে 'ধ' স্বরটির মাতৃকার জোড় 'স' স্বরটির মূল-মাতৃকা এবং 'ধ' ও 'স' স্বর দুইটি পরস্পর সজ্ঞ সম্বন্ধবিশিষ্ট। এইরূপে 'স' স্বরের মূল-মাতৃকা সগপ জোড়-মাতৃকার হিসাবে পাইতেছি 'গ' স্বরের মূল-মাতৃকা গপন, যাহা সগ সম্বন্ধবিশিষ্ট। মাতৃকা সম্বন্ধ হিসাবে 'স'= সগপ, জোড়-মাতৃকা গপন, 'ধ'=ধসগ, জোড়-মাতৃকা সগপ এবং 'গ' স্বরের মাতৃকা গপন=জোড়-মাতৃকা 'প' স্বরের মূল-মাতৃকা পনর। এই ক্ষেত্রেও 'স'ও'গ' পরস্পর সগ, 'ধ' ও 'স' পরস্পর সজ্ঞ এবং ধ'ওগ' পরস্পর সপ সম্বন্ধবিশিষ্ট। মাতৃকা তাহার জোড় ও মাতৃকার জোড়ের সহিত অন্য স্বর-মাতৃকার জোড় সম্বন্ধ হিসাবে আমরা সগ, সজ্ঞ ও সপ সম্বন্ধ পাইব। যেমন ধসগ—সগপ, সগপ—গপন, গপন—পনর; 'ধ' স্বরের মূল-মাতৃকার জোড়-মাতৃকা হইতেছে 'স' স্বরের মূল-মাতৃকা, পরস্পর সজ্ঞ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট (ধওস), 'স' স্বরের মূল-মাতৃকার জোড়-মাতৃকা 'গ' স্বরের মূল-মাতৃকা, পরস্পর সগ সম্বন্ধবিশিষ্ট (সওগ), 'ধ' স্বরের মূল-মাতৃকা এবং 'গ' স্বরের মূল-মাতৃকা গপন, পরস্পর জোড়-মাতৃকার জোড় সম্বন্ধ হিসাবে সপ সম্বন্ধবিশিষ্ট (ধওগ)। অনুরূপ ভাবে 'স' স্বরের মূল-মাতৃকার জোড়-মাতৃকা হইতেছে 'গ' স্বরের মূল-মাতৃকা এবং 'গ' স্বরের মূল-মাতৃকার জোড়-মাতৃকা হইতেছে 'প' স্বরের মূল-মাতৃকা। 'স' স্বরের মাতৃকা ও 'গ' স্বরের মাতৃকা সগ, 'গ' স্বরের মাতৃকা ও 'প' স্বরের মাতৃকা সজ্ঞ, 'স' স্বরের মাতৃকার সহিত জোড়-মাতৃকার জোড়-মাতৃকা সপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট। এই ভাবে মাতৃকাগুলি পরস্পর সগ, সজ্ঞ ও সপ সম্বন্ধবিশিষ্ট।

প্রথমে বলিয়াছি যে, যেইরূপ কৌশলে প্রাচীন যুগে তিন স্বর হইতে সাত স্বর এবং সাত স্বর হইতে বারটি স্বর আমরা পাইয়াছি

সেই একই রূপ কৌশলেই বারটি হইতে সাতটি এবং সাতটি হইতে তিনটি স্বরও পাওয়া যাইবে। ৪ঃ৫ঃ৬ এই অনুপাতের সাহায্যেই আমরা আবার প্রাচীন যুগের কথিত তিন স্বর পাইলাম। অনুপাতের সাহায্যেই বিকৃত স্বরগুলিও পাইয়াছি এবং এই মাতৃকাগুলিও ৪ঃ৫ঃ৬ এই অনুপাতের সাহায্যেই পাইয়াছি।

মাতৃকার সমষ্টি হইতে আমরা প্রাচীন যুগে কথিত মেরু, যাহাকে আমরা বর্ত্তমানে আরোহী, অবরোহী বলিয়া থাকি তাহাও পাইব। জীবদেহের রূপ গঠনে মেরুদণ্ড যেইরূপ প্রয়োজনীয়, এই আরোহী, অবরোহীও রাগ রাগিণীর রূপ গঠনে সেইরূপ প্রয়োজনীয়। এই আরোহাবরোহকে রাগ রাগিণীর মেরুদণ্ড বলা যায়। এই আরোহাবরোহকে মেরুদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়া অন্যান্য অলংকারযোগে পূর্ণাঙ্গ করা যাইবে। রাগ রাগিণীর আরোহী অবরোহীকেই প্রাচীনকালে খণ্ডমেরু বলা হইয়াছে। আরোহী অবরোহী কোনও সময়েই বক্র করিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে।

সংগীতরত্নাকরে ১২টি স্বর অর্থাৎ ৭টি প্রকৃত এবং ৫টি বিকৃত স্বরের একত্র সমাবেশকে মেরু বলা হইয়াছে। ১২টি অপেক্ষা অল্পব্যবহৃত স্বরসমাবেশকে খণ্ডমেরু বলা হইয়াছে।

রাগ রাগিণীর রূপ গঠনে প্রাচীনকালে মেরুর অত্যন্ত মূল্য দেওয়া হইয়াছে। বিচারকালে দেখা যাইবে যে, আজও আমাদের যুগে রাগরাগিণীর শুদ্ধ রূপ প্রকাশ করিতে হইলে, আরোহী, অবরোহীকে সেই একই রূপ মূল্য দিতে হইবে। এখন উদাহরণ দ্বারা আমরা মেরু রচনা করিতেছি ঃ

উদাহরণ (৩) ঃ মেরু পরিচয়

(১) (স)—সঋরজ্ঞগমম্মপদধণন। =১২টি স্বর।

(২) (ঋ)—ঋরজ্ঞগমম্মপদধণনর্স। =১২টি স্বর।

(৩) (র)—রজ্ঞগমহ্মপদধণনর্সর্ঋ। =১২টি স্বর।
(৪) (জ্ঞ)—জ্ঞগমহ্মপদধণনর্সর্ঋর্র। =১২টি স্বর।
(৫) (গ)—গমহ্মপদধণনর্সর্ঋর্রর্জ্ঞ। =১২টি স্বর।
(৬) (ম)—মহ্মপদধণনর্সর্ঋর্রর্জ্ঞর্গ। =১২টি স্বর।
(৭) (হ্ম)—হ্মপদধণনর্সর্ঋর্রর্জ্ঞর্গর্ম। =১২টি স্বর।
(৮) (প)—পদধণনর্সর্ঋর্রর্জ্ঞর্গর্মর্হ্ম। =১২টি স্বর।
(৯) (দ)—দধণনর্সর্ঋর্রর্জ্ঞর্গর্মর্হ্মর্প। =১২টি স্বর।
(১০) (ধ)—ধণনর্সর্ঋর্রর্জ্ঞর্গর্মর্হ্মর্পর্দ। =১২টি স্বর।
(১১) (ণ)—ণনর্সর্ঋর্রর্জ্ঞর্গর্মর্হ্মর্পর্দর্ধ। =১২টি স্বর।
(১২) (ন)—নর্সর্ঋর্রর্জ্ঞর্গর্মর্হ্মর্পর্দর্ধর্ণ। =১২টি স্বর।

আমরা ১২টি স্বর হইতে ১২টি মেরু রচনা করিয়াছি। মেরু অর্থে যে স্বরকে ১ম স্বর ধার্য্য করিয়া সপ্তক রচনা করা হয়। সেই প্রথম গ্রহণীয় স্বরই মেরু স্বর। স্বরগুলি মুদারা সপ্তক হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। এখন আমরা মাতৃকার সহিত মেরুর সম্বন্ধের আলোচনা করিতেছি।

মাতৃকার প্রয়োগকালে বা ব্যবহারকালে সকল সময়েই মাতৃকার প্রারম্ভিক অর্থাৎ প্রথম স্বরকে 'স' ধার্য্য করিয়া সগপ সম্বন্ধযুক্ত মাতৃকাকে পুং এবং তাহার জোড় স্বরূপ মাতৃকাকে অর্থাৎ গপন যাহা সজ্ঞপ সম্বন্ধযুক্ত, তাহাকে স্ত্রী মাতৃকা হিসাবে ধার্য্য করিতেছি। মাতৃকার ১ম স্বরটিকে 'স' ধার্য্য করিয়া একই সপ্তকের মধ্যে সগপ ও সজ্ঞপ সম্বন্ধবিশিষ্ট যে মাতৃকা পাওয়া যাইবে, যথাক্রমে তাহাকে পুং মাতৃকা ও তাহার জোড় হিসাবে অপরটিকে স্ত্রী-মাতৃকা বলা যাইবে। যে মাতৃকার ১ম স্বরকে 'স' ধার্য্য করা হইবে সেই 'স', অর্থাৎ যে স্বরটিকে 'স' বা ১ম স্বর ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহা হইতে গণনা করিয়া পরবর্ত্তী ১২টি স্বর অর্থাৎ মেরুর

মধ্যেই মাতৃকার জোড় সমাপ্ত হইবে। ইহার আরও বিশদরূপে আলোচনা করিতেছি।

'স' স্বরের মাতৃকা সগপ (পুং), এবং জোড়-মাতৃকা গপন (স্ত্রী) হইতেছে। এই গপন মাতৃকাটি সজ্ঞপ সম্বন্ধযুক্ত। সেইরূপ 'র' স্বরের মাতৃকা রঙ্কধ (পুং) অর্থাৎ সগপ (পুং) ভাবাপন্ন এবং রঙ্কধ (পুং) মাতৃকার জোড় ঙ্কধঋ (স্ত্রী) অর্থাৎ সজ্ঞপ সম্বন্ধবিশিষ্ট। যেই-রূপ ভাবে আমরা সগপ বলিতে সগপ (পুং) এবং জোড়-মাতৃকা বলিতে গপন যাহা সজ্ঞপ সম্বন্ধযুক্তরূপে পাইয়াছি সেইরূপ ভাবেই একই সপ্তকের মধ্যে 'র' স্বরকে 'স' হিসাবে ধার্য্য করিয়া অর্থাৎ মেরু হিসাবে ধার্য্য করিয়া রঙ্কধ মাতৃকাকে পাই সগপ ভাবাপন্ন এবং ঙ্কধঋ মাতৃকা হয় গপন অর্থাৎ সজ্ঞপ ভাবাপন্ন বা দলভুক্ত। এই-ভাবে সমস্ত স্বরের মাতৃকাগুলি ও তাহাদের জোড়গুলি একই নিয়মে পাওয়া যাইবে। 'র' স্বর হইতে প্রাপ্ত রঙ্কধ ও ঙ্কধঋ এই জোড়টিকে বিচার করিবার হেতু স্বরূপ বলা যায় যে 'র' স্বরটিকে মেরু বা 'স' হিসাবে ধার্য্য করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং ঙ্কধঋ এই মাতৃকার শেষ স্বরটি অর্থাৎ 'ঋ' স্বরটি, 'র' স্বর হইতে প্রাপ্ত মেরুর শেষ স্বর কিন্তু কেন্দ্রীয় 'স' অর্থাৎ যে 'স' স্বরটি হইতে গণনায় আমরা স, ঋ, র অর্থাৎ ৩য় স্বর হিসাবে 'র' স্বরকে পাইতেছি, সেই কেন্দ্রীয় 'স' স্বর হইতে গণনা করিয়া আমরা ১২টি স্বরস্থানবিশিষ্ট সপ্তকের মধ্যে ঙ্কধঋ মাতৃকার শেষ স্বরটিকে পাই তারা গ্রামের স্বর, বা কেন্দ্রীয় 'স' স্বর হইতে যে সপ্তক গণনা করা হয় তাহাপেক্ষা উচ্চ সপ্তক বা পরবর্ত্তী সপ্তকের স্বর রূপে। উক্ত ঙ্কধঋ মাতৃকার শেষ স্বরটি বর্ত্তমানে কথিত মুদারা সপ্তকে পাই না অর্থাৎ ১২টি স্বরের অন্তর্গত নহে। গ্রাম হিসাবে গণনা করিয়া আমরা সেই স্বরটি অর্থাৎ ঐ 'ঋ' স্বরটি পাই তারা গ্রামের ২য় স্বর হিসাবে। আমরা প্রথমে জানিয়াছি যে মাতৃকার ১ম স্বরটিকে সকল সময়ে মেরু ধার্য্য

করিয়া প্রকৃত ও বিকৃত স্বর সহ ১২টি স্বর গণনা করিয়া তাহার মধ্যেই জোড়-মাতৃকার শেষ স্বরটি পাইব। এইরূপ ক্ষেত্রে উদারা, মুদারা বা তারা, কোন্ গ্রামের কোন্ স্বর হইবে বা হইতেছে তাহার জন্য আমাদের কোনওরূপ চিন্তারই আবশ্যকতা নাই।

মেরুপরিচয়েই আমরা পূর্ব্বে এই স্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। প্রকৃত ও বিকৃত স্বর হইতে আমরা ১২টি মেরু এবং ১২টি মেরু হইতে ২৪টি মাতৃকা এবং ২৪টি মাতৃকা হইতে ২৪টি মাতৃকার জোড় পাইয়াছি। পুনরায় বলা যায় যে প্রতিটি স্বর হইতেই দুইটি করিয়া, অর্থাৎ ১টি পুং অপরটি স্ত্রী, মাতৃকা পাওয়া যাইবে যেমন 'স' স্বর হইতে সগপ পুং এবং সজ্ঞপ স্ত্রী। জোড় হিসাবেও সগপ মাতৃকার জোড় গপন এবং সজ্ঞপ মাতৃকার জোড় জ্ঞপণ পাওয়া যাইবে।

মাতৃকা হইতে সংগীতে ব্যবহার্য্য কোন্ কোন্ গুণাবলী আমরা পাইব তাহারই আলোচনা করিতেছি :

১ম—রাগরাগিণীর স্বরগঠনের বিভিন্ন পার্থক্য নিরূপণ।

২য়—রাগরাগিণীগুলিকে পৃথক পৃথক রূপে চিহ্নিতকরণ।

৩য়—রাগরাগিণীর কতগুলি বিভাগ হইতে পারে তাহা নিরূপণ।

৪র্থ—রাগরাগিণীর মিশ্রণের মান নির্ণয়ন।

৫ম—রাগরাগিণীর শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার।

৬ষ্ঠ—রাগরাগিণীর গঠন ও সংখ্যা নিরূপণ।

৭ম—অন্ত্যজ প্রকৃতির (যাহা পৌরাণিক ও বৈদিক যুগে দেশী নামে খ্যাত) রাগরাগিণীর ভিন্ন ভিন্ন ভাগের বা রীতির পার্থক্য।

৮ম—প্রচলিত রাগরাগিণীর ত্রুটী সংশোধন এবং বিচার।

৯ম—স্বরসাহায্যেই রাগরাগিণীর বিচারের সরল রীতি গ্রহণ।

১০ম—বাদী, সমবাদী নিরূপণের সহজ ও ধারাবাহিক রীতি।

১১শ—যেইরূপে রাগরাগিণীর স্বর গঠন করা যাইবে অনুরূপ ভাবেই তান এবং অন্যান্য অলংকারও প্রয়োগ করার সহজ রীতি নিরূপণ।

এখন মাতৃকার সাহায্যে কিরূপ প্রকারে রাগ ও রাগিণীকে পৃথক পৃথকরূপে জানা যাইতে পারে, অর্থাৎ কোন্‌টি রাগ এবং কোন্‌টি রাগিণী, তাহার সূত্র ও উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। এখানে বলা দরকার আমরা শুদ্ধ প্রকৃতির রাগরাগিণী বলিতে মার্গ প্রথার এবং অন্ত্যজ প্রকৃতির রাগরাগিণী বলিতে দেশী প্রথার রাগরাগিণীকেই জানিব। মার্গ এবং দেশী সংগীতের আলোচনায়, এই বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

মার্গ-প্রকৃতির আলোচনা বা শুদ্ধ প্রকৃতির আলোচনা—

(১) রাগ ঃ—১টি বলবান পুং-মাতৃকা ও ১টি দুর্ব্বলা স্ত্রী-মাতৃকার সমন্বয়ে সৃষ্ট স্বরসমাবেশকে 'রাগ' বলা যাইবে। আলংকারিক স্বর ১টি থাকিতে পারে। বাদী, সমবাদী পুং-মাতৃকাভুক্ত হওয়া চাই।

উদাহরণ ঃ—স২০, গ৫, প১০, ন৫। সগপ (পুং ; ৩৫, গপন (স্ত্রী) ২০। এই মাতৃকার যোগফল হইতে আমরা পুং-মাতৃকা প্রবল পাইতেছি, সেই কারণে এই স্বরসমাবেশটিকে 'রাগ' বলা হইবে। বাদী 'স' এবং সমবাদী 'প' উভয়েই পুং-মাতৃকাভুক্ত।

(২) রাগ (স্ত্রীভাবাপন্ন) ঃ—১টি বলবান পুং-মাতৃকা ও প্রায়-সমবলী ১টি স্ত্রী-মাতৃকা অথবা ২টি দুর্ব্বলা স্ত্রী-মাতৃকার সমন্বয়ে সৃষ্ট স্বরসমাবেশকে 'স্ত্রীভাবাপন্ন রাগ' বলিব। বাদী সমবাদী স্বরগুলি পুং-মাতৃকাভুক্ত থাকিবে। ১টি আলংকারিক স্বরও থাকিতে পারে।

উদাহরণ ঃ—স১১, গ৫, প১২, ন৯। সগপ (পুং) ২৮, গপন

(স্ত্রী) ২৬। বাদী 'প' ও 'স' সমবাদী, উভয়েই পুং-মাতৃকা-ভুক্ত। এই স্বরসমাবেশের পুং-মাতৃকা এবং স্ত্রী-মাতৃকা প্রায় সমবলী।

(৩) রাগ (ক্লীব) ঃ—পুং-মাতৃকা ও স্ত্রী-মাতৃকা সমবলী, বাদী পুং-মাতৃকাভুক্ত হওয়া চাই। আলংকারিক ১টি স্বরও থাকিতে পারে।

উদাহরণ ঃ—স৫, গ৪, প১০, ন৫। সগপ (পুং) ১৯, গপন (স্ত্রী) ১৯। 'প' বাদী, 'স' সমবাদী। পুং-মাতৃকার সহিত যে-কোনও সংখ্যার স্ত্রী-মাতৃকা অর্থাৎ ১টি পুং-মাতৃকার সহিত যে কয়টি হউক স্ত্রী-মাতৃকা সমবলী হইলেই সেই স্বরসমাবেশকে 'ক্লীব রাগ' বলা হইবে। এই স্বরসমাবেশটি ক্লীব পর্য্যায়ে পড়ে। ইহার বাদী পুং-মাতৃকাভুক্ত।

(৪) **রাগিণী** ঃ—১টি বলবতী স্ত্রী-মাতৃকার সহিত ১টি দুর্ব্বল পুং-মাতৃকার সমন্বয়ে সৃষ্ট স্বরসমাবেশকে 'রাগিণী' বলা যাইবে। ১টি আলংকারিক স্বরও থাকিতে পারে। বাদী সমবাদী স্ত্রী-মাতৃকাভুক্ত হওয়া চাই।

উদাহরণ ঃ—স৪, গ১৮, প৭, ন১০। সগপ (পুং) ২৯, গপন (স্ত্রী) ৩৫। বাদী 'গ', সমবাদী 'ন'। বাদী সমবাদী স্ত্রী-মাতৃকাভুক্ত এবং স্ত্রী মাতৃকা প্রবল।

(৫) **রাগিণী** (পুং-ভাবাপন্ন) ঃ—১টি স্ত্রী-মাতৃকার সহিত ১টি প্রায় সমবলী অথবা ২টি দুর্ব্বল পুং-মাতৃকার সমন্বয়ে সৃষ্ট স্বর-সমাবেশকে 'পুংভাবাপন্ন রাগিণী' বলিব। ১টি আলংকারিক স্বরও থাকিতে পারে। বাদী সমবাদী স্ত্রী-মাতৃকাভুক্ত হওয়া চাই।

উদাহরণ ঃ—স৮, গ৯, প৪, ন১০। সগপ (পুং) ২১, গপন (স্ত্রী) ২৩। বাদী 'ন', সমবাদী 'গ'। বাদী সমবাদী স্ত্রী-মাতৃকা-ভুক্ত। পুং ও স্ত্রী-মাতৃকা প্রায়সমবলী।

(৬) **রাগিণী** (ক্লীব) ঃ—স্ত্রী-মাতৃকা ও পুং-মাতৃকা সমবলী।

কোনও স্বরসমাবেশে স্ত্রী মাতৃকার সহিত ১টি কিংবা ততোধিক পুং মাতৃকা সমবলী হইলে সেই স্বরসমাবেশকে 'ক্লীব রাগিণী' বলা যাইবে। বাদী স্ত্রী-মাতৃকাভুক্ত হওয়া চাই।

উদাহরণঃ—স৮, গ১২, প৪, ন৮। সগপ (পুং) ২৪, গপন (স্ত্রী) ২৪। বাদী 'গ' স্ত্রী-মাতৃকাভুক্ত এবং সমবাদী 'ন' স্ত্রী-মাতৃকাভুক্ত।

আমরা পুং-মাতৃকা-প্রবল স্বর সমাবেশকে রাগ এবং স্ত্রী-মাতৃকা-প্রবল স্বরসমাবেশকে রাগিণী বলিব। রাগের বিচার-কালে আমরা তিন প্রকার, যথা রাগ, স্ত্রীভাবাপন্ন রাগ এবং ক্লীব রাগ পাইয়াছি। রাগিণীর বিচারেও আমরা তিন প্রকার, যথা রাগিণী, পুংভাবাপন্ন রাগিণী এরং ক্লীব রাগিণী পাইয়াছি। এখন অন্ত্যজ প্রকৃতির রাগরাগিণীর প্রকৃতি, সূত্র ও উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করিতেছি। বর্ত্তমানে প্রচলিত উচ্চাঙ্গ সংগীত এবং প্রাচীন তথা বৈদিক যুগের দেশী সংগীতকেই আমি অন্ত্যজ প্রকৃতির রাগরাগিণী বলিতেছি। নিম্নে সূত্র ও উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে

অন্ত্যজ প্রকৃতির আলোচনা বা দেশী প্রকৃতির আলোচনা—

(১) রাগঃ—কোনও স্বরসমাবেশের বাদী স্বর পুং-মাতৃকাভুক্ত এবং সমবাদী অর্থাৎ পুং-মাতৃকার ৩য় স্বর কিংবা ১ম স্বর (বাদী যদি ৩য় স্বর হয় সমবাদী হয় ১ম স্বর এবং বাদী যদি ১ম স্বর হয় সমবাদী হয় ৩য় স্বর) যদি স্ত্রী-মাতৃকার ১ম স্বরের কিংবা ৩য় স্বরের সমবলী কিংবা কিছু দুর্ব্বল হয় এবং সেই স্বরসমাবেশে যদি পুং-মাতৃকা প্রবল হয়, তখনই সেই স্বরসমাবেশটিকে 'অন্ত্যজ প্রকৃতির রাগ' আখ্যা দিব।

উদাহরণঃ—স১০, গ৮, প৮, ন২। সগপ (পুং) ২৬, গপন (স্ত্রী) ১৮। বাদী **'স'**, সমবাদী 'প'। এই স্বরসমাবেশে সমবাদী

'প' স্বর পুং-মাতৃকাভুক্ত ৩য় স্বর, স্ত্রী-মাতৃকার ১ম স্বর 'গ' স্বরের সমবলী।

(২) **রাগ** (স্ত্রীভাবাপন্ন) ঃ—কোনও স্বরসমাবেশের বাদী পুং-মাতৃকাভুক্ত, সমবাদী স্ত্রী-মাতৃকার ১ম স্বরের সমবলী অথবা কিছু প্রবল কিংবা কিছু দুর্ব্বলও হয় তবে সেই স্বরসমাবেশকে 'স্ত্রী-ভাবাপন্ন অন্ত্যজ প্রকৃতির রাগ' বলা হইবে। পুং-মাতৃকা অবশ্যই প্রবল হওয়া চাই।

উদাহরণঃ—স৬, গ৫, প১০, ন৩। সগপ (পুং) ২১, গপন (স্ত্রী) ১৮। বাদী 'প', সমবাদী 'স'। সমবাদী 'স' স্বর স্ত্রী মাতৃকার ১ম স্বর 'গ' স্বর অপেক্ষা কিছু প্রবল।

(৩) **রাগ** (ক্লীব) ঃ—যদি কোনো স্বরসমূহের বাদী পুং-মাতৃকা-ভুক্ত, স্ত্রী-মাতৃকার এবং পুং-মাতৃকার অন্যান্য স্বরগুলি সমবলী পাওয়া যায়, তাহাকে 'ক্লীব প্রকৃতির অন্ত্যজ রাগ' বলা যাইবে।

উদাহরণঃ—স৮, গ৮, প৯, ন৮। সগপ (পুং) ২৫, গপন (স্ত্রী) ২৫। বাদী 'প', সমবাদী 'স' স্বর হওয়া উচিত কিন্তু আমরা এই স্বরসমাবেশের তিনটি স্বরের বল একই রূপ পাইতেছি। এই ব্যতিক্রম থাকাতে এই প্রকৃতির স্বরসমাবেশকে অন্ত্যজ প্রকৃতির বলিতেছি। তিনটি স্বর সমবলী হইলেও মাতৃকা হিসাবে বাদীর অনুপাতে সমবাদী 'স' স্বরকেই ধার্য্য করিতে হইবে।

(৪) **রাগিণী** ঃ—কোনও স্বরসমাবেশের, বাদী স্বর যদি স্ত্রী-মাতৃকাভুক্ত হয় এবং সমবাদী অর্থাৎ স্ত্রী-মাতৃকার ১ম স্বর কিংবা ৩য় স্বর (বাদী ১ম স্বর হইলে সমবাদী ৩য় স্বর এবং বাদী ৩য় স্বর হইলে সমবাদী ১ম স্বর) যদি পুং-মাতৃকার ১ম স্বর কিংবা ৩য় স্বর অপেক্ষা কিছু প্রবল বা দুর্ব্বল কিংবা সমবলী হয়, তখন সেই স্বর-সমাবেশটিকে আমরা 'অন্ত্যজ প্রকৃতির রাগিণী' বলিব। স্ত্রী-মাতৃকা অবশ্যই প্রবল হইবে।

উদাহরণঃ—স৬, গ৬, প৫, ন১০। সগপ (পুং) ১৭, গপন (স্ত্রী) ২১। বাদী 'ন', সমবাদী 'গ'। এই স্বরসমাবেশের সমবাদী 'গ' স্বর পুং-মাতৃকার ১ম স্বরের সমবলী এবং পুং-মাতৃকার ৩য় স্বরের অপেক্ষা কিছু প্রবল। বাদী স্ত্রী-মাতৃকাভুক্ত।

(৫) **রাগিণী** (পুংভাবাপন্ন) ঃ—বাদী স্বর স্ত্রী-মাতৃকাভুক্ত হইবে। সমবাদী স্বর পুং মাতৃকার ১ম স্বর অপেক্ষা প্রবল কিংবা সমবলী, এবং পুং-মাতৃকার ৩য় স্বরের সমবলী অথবা প্রবল। স্ত্রী-মাতৃকাও প্রবল হইবে। এই প্রকৃতির স্বর সমাবেশ 'পুংভাবাপন্ন রাগিণী'।

উদাহরণঃ—স৪, গ১০, প৫, ন৫। সগপ (পুং) ১৯, গপন (স্ত্রী) ২০। বাদী স্বর 'গ', সমবাদী 'ন'। সমবাদী 'ন' স্বর, পুং মাতৃকার ৩য় স্বর 'প' স্বরের সমবলী, এবং পুং-মাতৃকার ১ম স্বর 'স' অপেক্ষা কিছু প্রবল।

(৬) **রাগিণী** (ক্লীব) ঃ—বাদী স্বর স্ত্রী-মাতৃকাভুক্ত। পুং এবং স্ত্রী-মাতৃকার অন্যান্য সকল স্বরগুলিই সমবলী।

উদাহরণঃ—স৬, গ১০, প৬, ন৬। সগপ (পুং) ২২, গপন (স্ত্রী) ২২। বাদী স্বর 'গ'। স্ত্রী এবং পুং-মাতৃকার অন্যান্য স্বরগুলি সমবলী এবং বাদী স্বর স্ত্রী-মাতৃকাভুক্ত। শুদ্ধ প্রকৃতির ক্লীব রাগিণীর সহিত পার্থক্য এই যে, উক্ত প্রকৃতিতে মাতৃকার অন্যান্য স্বরগুলি সমবলী নহে। কিন্তু অন্ত্যজ প্রকৃতিতে মাতৃকার অন্যান্য স্বরগুলি সমবলী। শুদ্ধ প্রকৃতির রাগ রাগিণীর পরিচয়ে যে সমস্ত প্রকৃতির রাগ রাগিণীর নাম ও লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, অন্ত্যজ প্রকৃতির রাগ ও রাগিণীর পরিচয়ে নাম ও লক্ষণ দ্বারা সেই একই পদ্ধতিতে বিচার করা হইয়াছে। যে সমস্ত পার্থক্য আমরা অন্ত্যজ প্রকৃতির রাগরাগিণীর বিচারে পাইয়াছি, তাহার ব্যতিক্রম শুদ্ধ প্রকৃতির রাগ রাগিণীর মধ্যে পাই। সেই কারণেই শুদ্ধ এবং অন্ত্যজ প্রকৃতির এইরূপ পার্থক্য হইতেছে।

আলোচিত শুদ্ধ ও অন্ত্যজ প্রকৃতির রাগ রাগিণী ব্যতিরেকে আরও দুই প্রকার স্বরসমাবেশ বর্ত্তমানে প্রচলিত। আমরা তাহাদের বিচার করিয়া অশুদ্ধ প্রকৃতির রাগ রাগিণী ভিন্ন অন্য কোনও নাম দিতে পারি না। লক্ষণ ও সূত্র সহ তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

যখন আমরা কোনও স্বরসমাবেশের পুং-মাতৃকার ১ম স্বর ও স্ত্রী-মাতৃকার ৩য় স্বর সমবলী এবং উভয় মাতৃকার মধ্যবর্ত্তী স্বরগুলিও সমবলী, পাইব, তখনই সেই স্বরসমাবেশকে অশুদ্ধ বলিয়া জানিব। এইরূপ স্বরসমাবেশের বাদী, সমবাদী ধার্য্য করা যাইতে পারে না। বাদী সমবাদী স্বর ব্যতিরেকে কোনও রস স্থায়িভাবে সৃষ্টি করা যাইবে না।

উদাহরণ (ক) ঃ—স৮, গ১২, প১২, ন৮। সগপ (পুং) ৩২, গপন (স্ত্রী) ৩২। এই স্বরসমাবেশ হইতে আমরা উপরি উক্ত ত্রুটি পাইতেছি। ২য় উদাহরণ (খ) যাহার আরম্ভ স্ত্রী-মাতৃকা দ্বারা তাহাতেও এই একই প্রকার ত্রুটি পাওয়া যাইতেছে।

উদাহরণ (খ) ঃ—র১২, ম৮, ধ৮, স১২। রমধ (স্ত্রী) ২৮, মধস (পুং) ২৮। এই স্বরসমাবেশেও আমরা স্ত্রী-মাতৃকার ১ম স্বর ও পুং-মাতৃকার ৩য় স্বর সমবলী পাইয়াছি এবং স্ত্রী-মাতৃকার ও পুং-মাতৃকার মধ্যবর্ত্তী স্বরগুলিও সমবলী পাইতেছি এবং একই কারণে এই স্বর সমাবেশ দুইটির বাদী সমবাদী স্বর ধার্য্য করিতে কিরূপ অসুবিধা তাহার বিচার করিতেছি। অশুদ্ধ উদাহরণ (ক) লিখিত স্বরসমাবেশে যদি বাদী স্বর 'প' ধার্য্য করা হয় সগপ এই মাতৃকান্তর্গত স্বর হিসাবে, তখন আমরা 'প' স্বরের সমবাদী ধার্য্য করিতে হইলেই 'স' স্বরকেই গ্রহণ করিতে আইনতঃ বাধ্য, কিন্তু 'স' স্বরের বল অপেক্ষা 'গ' স্বরের বল অধিক হওয়ায় 'স' স্বরকে নিয়মমত বাদীর সমবাদী ধার্য্য করিতে পারি না। যেহেতু 'স'

এবং 'ন' স্বর উভয়েই সমবলী সেহেতু কেবল মাত্র 'স' স্বরকে সমবাদী কিরূপে বলিতে পারিব? নিয়মিত রীতিতে 'প' বাদী এবং 'গ' সমবাদী এইরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না কিংবা একটি বাদী স্বরের জন্য 'স' ও 'ন' এই দুইটি স্বরও একত্রে সমবাদী হইতে পারিবে না। ঐরূপ প্রথায় বিচার করিলে, যদি গপন মাতৃকার 'গ' স্বরকে বাদী ধার্য্য করা হয় তখনও সমবাদী ধার্য্য করিবার কালে ঠিক একই রূপ ত্রুটি পাইব। এইরূপ অবস্থায় বাদী স্বরও আইনমত ধার্য্য করিতে পারি না। সেই কারণে এইরূপ স্বর-সমাবেশকে রাগ কিংবা রাগিণী কোনও আখ্যা দেওয়া যাইবে না। আমরা এই প্রকৃতির স্বরসমাবেশ বহু রাগরাগিণীতে পাইতেছি কিন্তু নিয়মানুগ উপায়ে তাহার বিচার করিতে পারিতেছি না, সেইহেতু ইহাকে অশুদ্ধ বলা ছাড়া অন্য উপায় দেখিতেছি না। অশুদ্ধ উদাহরণ (খ) লিখিত স্বরসমাবেশের পরিচয়েও আমরা ঠিক একই প্রকার ত্রুটি পাইতেছি। এই জন্যই এই প্রকার স্বরসমাবেশকেও অশুদ্ধই বলিব।

আরও এক প্রকার অশুদ্ধ রাগরাগিণীর পরিচয় আমরা সচরাচর পাইয়া থাকি। তাহাদের বিচার করিয়া দেখিলে বলা যাইবে যে, যদি কোনও স্বরসমাবেশে একটি মাত্র মাতৃকা, তাহা পুং হউক কিংবা স্ত্রীই হউক, পাওয়া যায় তবে তাহাকেও অশুদ্ধ বলা হইবে। কারণস্বরূপ বলা যায় যে পুরুষ ও প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে রূপ ও রসসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। রসই সংগীতের প্রাণস্বরূপ এবং এই রসের আদিরস হিসাবে মনীষীরা শৃঙ্গার রসকেই ধার্য্য করিয়াছেন। শৃঙ্গার রস হইতেই যেহেতু অন্যান্য সকল রস সৃষ্ট সেইহেতু শৃঙ্গার রসকেই তাঁহারা আদিরস রূপে ধার্য্য করিয়াছেন। এই শৃঙ্গার রস পুরুষ ও প্রকৃতির লীলাকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্ট। অতএব রসোপলব্ধির দিক চিন্তা করিয়া বিচার

করিলে আমরা দুইটি মাতৃকার অস্তিত্ব পৃথক পৃথক রূপে স্বীকার করিতে বাধ্য। এই কারণে কোনও রাগ বা রাগিণীতে একক কোনও মাতৃকা, তাহা পুং কিংবা স্ত্রী যাহাই হউক ব্যবহৃত হইতে দেখিলে তাহাকে রসের অসম্পূর্ণতার জন্যই অশুদ্ধ বলিব। অশুদ্ধ প্রকারের রাগরাগিণী অর্থাৎ অশুদ্ধ (ক) এবং (খ) প্রকৃতিতে ক্লীব হইলেও, তাহাকে কোনও রাগ বা রাগিণীর নামের আখ্যা দেওয়া যাইবে না। একক মাতৃকা হইতে যে রাগরাগিণী আমরা পাইতেছি তাহাও একই কারণে অশুদ্ধ হইবে। এইরূপ প্রচলিত কয়েকটি রাগরাগিণীর উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করিতেছি।

শ্রীবিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে প্রণীত "হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতি ক্রমিক পুস্তক মালিকা"র চতুর্থ ভাগে লিখিত "হিন্দোল", যাহার স্বর-সমাবেশে আমরা স, গ, হ্ম, ধ, ন এই স্বর কয়টি পাইয়াছি তাহা হইতে মাত্র ধসগ এই একটি স্ত্রী-মাতৃকা পাই। ঐ পুস্তকের ৫ম ভাগে লিখিত দুই প্রকারের "মেঘরঞ্জনী" পাওয়া যায়। একটির স্বরসমাবেশ "স, ঋ, গ, ম, ন" এবং অপরটির "স, ঋ, গ, ম, হ্ম, ন"। এই দুইটি স্বরসমাবেশেরই কোনও মাতৃকা পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের মনে রাখা উচিত মাতৃকা মানেই স্বরের সহজ মিল যাহা ৪ ঃ ৫ ঃ ৬ অনুপাত বিশিষ্ট। যদি রাগরাগিণীতে ব্যবহৃত স্বরগুলির পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত না পাই তবে কিরূপে আমরা সেই স্বরসমুহের দ্বারা মনোরঞ্জন করিতে পারি? ইহাকে অশুদ্ধ বলার যুক্তিস্বরূপ বলা যায় যে মাতৃকা না পাওয়ায় বাদী, সমবাদী শ্রেণী (যাহার বিচার পরে করিয়াছি) ইত্যাদির বিচার করিতে পারিব না। আমরা উক্ত পুস্তকেরই ৬ষ্ঠ ভাগে লিখিত "চন্দ্রকৌশের" দুই প্রকারের স্বরসমাবেশ পাইব; একটির স্বরসমুহ "সজ্ঞমধন", যাহা হইতে মধস মাত্র এই একটি মাতৃকা পাই। পূর্ব্বোক্ত কারণে ইহাকেও অশুদ্ধ বলিব। ঐ পুস্তকে আরও এই প্রকারের বহু

রাগ (তিনি রাগ ও রাগিণীর প্রভেদ করেন নাই) পাওয়া যাইবে। অনুরূপ প্রকারে আমরা বিমল পাটকীর রচিত "অপ্রকাশিত রাগ" নামক পুস্তক হইতে 'শোভাবরী', 'শিবরঞ্জনী', 'মধুরঞ্জনী', 'রাজেশ্বরী', 'সাঁঝকা হিন্দোল' প্রভৃতির স্বরবিন্যাসগুলি হইতে মাত্র একটি করিয়া মাতৃকা পাইবার কারণে তাহাদেরও অশুদ্ধ বলিব।

মানুষের চিন্তায় এই অশুদ্ধ প্রকৃতির রাগরাগিণীর প্রচলন বা সঙ্কলনকে কিছুতেই মর্য্যাদা দেওয়া উচিত নহে। যেহেতু শুদ্ধ অর্থাৎ যাহাকে বৈদিক যুগের মার্গ এবং অন্ত্যজ যাহাকে বৈদিক যুগের দেশী, নাম দিয়া বিচার করিয়াছি বা ঐ দুই প্রকৃতিগত যে সমস্ত রাগ রাগিণী পাওয়া যাইবে তাহা জানিলেই (পরিশিষ্টে বলা হইয়াছে) কেহ আর অশুদ্ধ প্রকৃতির রাগ রাগিণীর সম্বন্ধে চিন্তাও করিতে পারিবেন না। ভারতীয় সংগীতে মার্গপ্রকার, যাহা শুদ্ধ বলিয়া কথিত, এবং দেশী প্রকার, যাহা অন্ত্যজ বলিয়া কথিত, এইরূপ রাগ রাগিণীর সংখ্যা ৫ কোটিরও বেশী। ভারতীয় সংগীতের রাগ রাগিণী যখন এতগুলি তখন আর অশুদ্ধ রাগ রাগিণীর পরিবেশনের কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। এই অশুদ্ধ প্রকারের রাগ রাগিণী হয়ত ২।৪ শতও হইতে পারে এবং মনে হয়, যাঁহারা এই প্রকৃতির রাগ রাগিণীর প্রচলন করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ভারতীয় সংগীতের এইরূপ বিরাট সংস্কৃতির বিষয় একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন। আমার এই মতের সমর্থন অবশ্যই সংগীতপিপাসু জনসাধারণের চিন্তা এবং বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে।

যে স্বরসমাবেশের সহায়তায় বা সাহায্যে শুদ্ধ ও অন্ত্যজ প্রকৃতির রাগ রাগিণীর পৃথক করিবার প্রথার বিচার করা হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানে প্রচলিত "মালশ্রী" নামক রাগিণীর স্বরসমাবেশ। "মালশ্রীতে" বর্ত্তমানে "সগপন" এই চারিটি স্বর ব্যবহৃত। অবশ্য

অন্য মতও পাওয়া যায়, যাহার আলোচনা পরে করিয়াছি। ৪ ঃ ৫ ঃ ৬ এই অনুপাতে আমরা একটি সপ্তকে এই চারিটি স্বরই পাইয়াছি। স্বরসংখ্যা অল্প থাকায় সহজেই এই পদ্ধতিটি বুঝিতে পারা যাইবে। এই একই রীতিতে ষাড়ব, ঔড়ব, সম্পূর্ণ প্রতিটি জাতির স্বরসমাবেশের বিচার করা যাইবে।

বিচারকালে "আলংকারিক" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি। যে স্বর, স্বভাবতই স্বরসমাবেশে ব্যবহৃত, কিন্তু মাতৃকা গঠনে কোনও রূপ সহায়তা করে না, তাহাকেই "আলংকারিক" স্বর বলিয়াছি অর্থাৎ যে স্বর হইতে কোনও মাতৃকা সৃষ্ট হইবে না, অথচ স্বরসমাবেশে ব্যবহৃত। এইরূপ স্বর, মাতৃকার এবং তাহার জোড়মাতৃকার সহিত দুইটি পর্য্যন্ত হইতে পারে।

রাগরাগিণীর শ্রেণী বিচারকালে মাতৃকার প্রয়োজন কত বেশী তাহা বুঝিতে পারিব। মাতৃকা ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে শ্রেণীর এইরূপ ধারাবাহিক বিচার করা সম্ভব নহে। সংগীতরত্নাকর, সংগীতপারিজাত, বৃহদ্দেশী, সংগীতসময়সার, সংগীতমকরন্দ, রাগতরঙ্গিণী, হৃদয়কৌতুক ও হৃদয়প্রকাশ, রাগবিবোধ, রাগতত্ত্ববিবোধ প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতাগণও শ্রেণী সম্বন্ধে এইরূপ নিয়মানুগ প্রথায় বিচার করিয়াছেন কিনা তাহা জানা নাই। সকলেই এক প্রকার উক্তি করিয়া গিয়াছেন, যাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং পুনরায় বলিতেছি। ঐ সমস্ত পুস্তক প্রণেতাগণের পুস্তক হইতে আমরা তিনটি মাত্র শ্রেণী পাইয়াছি, একটি শুদ্ধ, ২য়টি সালঙ্ক বা সালগ, ৩য়টি সঙ্কীর্ণ। পুস্তক প্রণেতাগণ শুদ্ধ শ্রেণীর পরিচয়দানে বলিয়াছেন যে, যে স্বরসমাবেশে বা রাগ রাগিণীতে অন্য কোন রাগ রাগিণীর মিশ্রণ হয় নাই। এই শুদ্ধ পরিচয়ে আমরা জানিয়াছি যে, যে রাগ বা রাগিণী অপর কোন রাগ বা রাগিণীর সাহায্য ব্যতিরেকেই নিজ

রূপ প্রকাশে সক্ষম। সালগ বা সালঙ্ক পরিচয়ে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যে রাগ বা রাগিণী ২টি রাগ বা রাগিণীর মিশ্রণ হইতে সৃষ্ট। সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর রাগরাগিণীর সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যে রাগ বা রাগিণী তিন বা বহুর মিশ্রণ হইতে জাত। এই প্রকার শ্রেণী-পরিচয় হইতে আমরা কিরূপে জানিব কোন্ রাগ বা রাগিণীর সহিত কোন্ রাগ বা রাগিণী মিশ্রিত? এই মিশ্রণ-রীতিকে জানিবার জন্য কোনও নির্দ্দেশ কেহই আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করেন নাই।

এখন এই তিনটি অর্থাৎ শুদ্ধ, সালঙ্ক এবং সঙ্কীর্ণ, শ্রেণী হইতে আমরা নয়টি বিভাগ পাইব। এই নয়টি বিভাগের নাম দিয়াছি যথাক্রমে উত্তম প্রকৃতির শুদ্ধ, মধ্যম প্রকৃতির শুদ্ধ, অধম প্রকৃতির শুদ্ধ, উত্তম প্রকৃতির সালঙ্ক, মধ্যম প্রকৃতির সালঙ্ক, অধম প্রকৃতির সালঙ্ক, উত্তম প্রকৃতির সঙ্কীর্ণ, মধ্যম প্রকৃতির সঙ্কীর্ণ এবং অধম প্রকৃতির সঙ্কীর্ণ। সর্ব্ব সমেত আমরা এই নয়টি শ্রেণীর বিচার-কালে যে সমস্ত স্বরসমাবেশের সাহায্যে বিচার করিয়াছি তাহা বর্ত্তমানের প্রচলিত রাগরাগিণী।

শ্রেণীবিচার যাহা করা হইতেছে তাহা বৈদিক তথা প্রাচীন যুগেরও কোন পুস্তক প্রণেতারা করিয়াছেন কিনা জানা নাই। মাতৃকার সাহায্যে ধারাবাহিক রীতিতে কিরূপে শ্রেণীর এই বিভিন্ন-রূপের বিচার করিয়াছি তাহা আলোচনা এবং উদাহরণগুলি হইতেই জানা যাইবে। সূত্র এবং উদাহরণ সহ প্রতিটি শ্রেণীর বিশদ আলোচনা করিতেছি।

একই গোত্রীয় মাতৃকা অর্থাৎ ১টি স্বর হইতে প্রাপ্ত ২টি মাতৃকা একত্রে ১ জোড় ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন ১ জোড় মাতৃকার দ্বারা সৃষ্ট রাগরাগিণীকে অর্থাৎ একই স্বরের ১টি মাতৃকা এবং তাহার স্বাভাবিক জোড়-মাতৃকা হইতে যে রাগ

বা রাগিণী সৃষ্ট তাহাকেই শুদ্ধ প্রকৃতির রাগ বা রাগিণী বলা যাইবে।

২টি স্বর হইতে প্রাপ্ত ৩টি মাতৃকার ২ জোড় কিংবা ৪টি মাতৃকার ২ জোড় মাতৃকার দ্বারা সৃষ্ট রাগরাগিণীকে সালঙ্ক বা সালগ শ্রেণীর রাগ বা রাগিণী বলা যাইবে।

২ জোড়া মাতৃকা অপেক্ষা অধিক মাতৃকার দ্বারা সৃষ্ট রাগ বা রাগিণীকে সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর রাগ বা রাগিণী বলা যাইবে।

প্রাচীন তথা বৈদিক যুগের শ্রেণীর সম্বন্ধে আলোচনা পূর্ব্বেই করিয়াছি। মাতৃকার সাহায্যে শ্রেণীবিচারও ঠিক প্রাচীন বা বৈদিক মতের পরিপোষক। বৈদিক বা প্রাচীন যুগের আলোচনায় বলিয়াছি যে, যে রাগরাগিণীতে অন্য কোনও রাগরাগিণীর মিশ্রণ নাই বা পাওয়া যাইবে না তাহাই শুদ্ধ, যে রাগরাগিণীতে অপর একটি রাগ বা রাগিণীর মিশ্রণ হইয়াছে তাহা সালগ বা সালঙ্ক, যে রাগ বা রাগিণীতে তিন বা বহু রাগরাগিণীর মিশ্রণ পাওয়া যায় তাহাই সঙ্কীর্ণ। কি করিয়া রাগ বা রাগিণীর মিশ্রণ প্রথাটি জানা যাইবে তাহা কেহ বলিয়াছেন কিনা জানা নাই। মাতৃকার সাহায্যে যে বিচার করিয়াছি তাহা ধারাবাহিক, নির্ভরযোগ্য এবং যুক্তিপূর্ণ। মাতৃকার সাহায্যে যে বিচার পাওয়া যাইবে তাহার মধ্যে মতামতের কোন অবকাশ নাই। ১টি জোড়-মাতৃকার সমন্বয়ে সৃষ্ট অর্থাৎ যাহাতে অপর কোনও মিশ্রণ নাই তাহাই শুদ্ধ, ২ জোড়ার মাতৃকার সমন্বয়ে সৃষ্ট অর্থাৎ যাহাতে অপর একটির মিশ্রণ হইয়াছে, তাহা সালগ বা সালঙ্ক, এবং যাহাতে ২টির অধিক জোড়া-মাতৃকা পাওয়া যাইবে তাহাই সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর রাগ বা রাগিণী হইবে। ২টির অধিক জোড়-মাতৃকা অর্থাৎ তিন জোড়া মাতৃকা অর্থে ৩টি, ৪ জোড়া অর্থে ৪টি এই প্রকার মিশ্রণ বলা যাইতেছে। এখন মিশ্রণের

মান নির্ণয় করিয়া সূত্র ও উদাহরণ সহ প্রতিটি শ্রেণীর ব্যাখ্যা করিতেছি।

উত্তম প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণী।

সূত্র (১) ঃ—একটি স্বরেরই পুং এবং স্ত্রী-মাতৃকার সমন্বয়ে সৃষ্ট রাগ বা রাগিণী।

উদাহরণ ঃ—(১) "সরন্ধপন"—পনর (পুং)-নরন্ধ (স্ত্রী)। "প" স্বর হইতে প্রাপ্ত মাতৃকা।

(২) "সরমপণ"—পণর (স্ত্রী)-ণরম (পুং)। "প" স্বর হইতে প্রাপ্ত মাতৃকা।

(৩) "সগপন"—সগপ (পুং)-গপন (স্ত্রী)। "স" স্বর হইতে প্রাপ্ত মাতৃকা।

(৪) "সরমধ"—রমধ (স্ত্রী)-মধস (পুং)। 'র' স্বর হইতে প্রাপ্ত মাতৃকা।

সূত্র (২) ঃ—একটি স্বরেরই পুং এবং স্ত্রী-মাতৃকা এবং তাহার সহিত একটি আলংকারিক স্বর।

উদাহরণ ঃ—(১) "সরগপধ"—ধসগ (স্ত্রী) - সগপ (পুং)। 'ধ' স্বরের পুং এবং স্ত্রী-মাতৃকা। 'র' অলংকার।

(২) "সরমপধ"—রমধ (স্ত্রী) - মধস (পুং)। 'র' স্বরের মাতৃকা। 'প' অলংকার।

(৩) সগমধন—মধস (পুং) - ধসগ (স্ত্রী)। 'ম' স্বরের মাতৃকা। 'ন' অলংকার।

এখন **মধ্যম প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণীর** পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

সূত্র ঃ—একটি স্বরেরই পুং এবং স্ত্রী-মাতৃকার সহিত ২টি আলংকারিক স্বর।

উদাহরণঃ—(১) "সগমধণন"—মধস (পুং) - ধসগ (স্ত্রী)। 'ম' স্বর হইতে প্রাপ্ত মাতৃকা। 'ণ', 'ন' অলংকার।

(২) "সঋগঋ্মপন"—সগপ (পুং) - গপন (স্ত্রী)। "স" স্বর হইতে প্রাপ্ত মাতৃকা। 'ঋ', 'ঋ্ম' অলংকার।

এখন **অধম প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণীর** বিচার করিতেছি।

সূত্র (১)ঃ—একটি স্বরের পুং কিংবা স্ত্রী যে-কোনও ১টি এবং অপর স্বরের পুং কিংবা স্ত্রী যে-কোনও ১টি মাতৃকার জোড়ে স্বষ্ট।

উদাহরণঃ—"সঋগপদ"—(স) সগপ (পুং) এবং (ঋ) ঋগদ (স্ত্রী)। 'স' হইতে পুং এবং 'ঋ' হইতে স্ত্রী মাতৃকা প্রাপ্ত।

সূত্র (২)ঃ—একটি স্বরের পুং এবং স্ত্রী-মাতৃকার সহিত অন্য কোনও একটি স্বরের একটি মাতৃকা, এবং তাহার সহিত কোনও আলংকারিক স্বরও থাকিতে পারে।

উদাহরণঃ—(১) "সঋগঋ্মধন"—(ঋ্ম) ঋ্মধঋ (স্ত্রী) - ধঋগ (পুং), (ধ) ধসগ একক মাতৃকা।

(২) 'সরমপণন'—(প) পণর (স্ত্রী) - ণরম (পুং), (প) পনর একক মাতৃকা।

(৩) সজ্ঞগমপণ—(স) সজ্ঞপ (স্ত্রী)-জ্ঞপণ (পুং), (স) সগপ একক মাতৃকা, এবং 'ম' অলংকার।

সূত্র (৩)ঃ—একটি স্বরের পুং কিংবা স্ত্রী এবং অপর স্বরের পুং কিংবা স্ত্রী-মাতৃকার সহিত একটি আলংকারিক স্বর। ইহা ১নং সূত্রলিখিত রূপের সহিত অলংকার যুক্ত।

উদাহরণঃ—"সঋগপদণ"—(স) সগপ (পুং) (ঋ) ঋগদ (স্ত্রী), 'ণ' অলংকার।

এখন **উত্তম প্রকৃতির সালঙ্ক শ্রেণীর** ব্যাখ্যা করিতেছি।

সূত্রঃ—২টি স্বর হইতে প্রাপ্ত তিনটি মাতৃকার ২ জোড় যাহারা পরস্পর সজ্ঞ, সগ, সপ সম্বন্ধবিশিষ্ট।

উদাহরণ ঃ—"সজ্ঞমপদ"—(দ) দসজ্ঞ (পুং) -সজ্ঞপ (স্ত্রী) ; (ম) মদস (স্ত্রী)—দসজ্ঞ (পুং)। মাতৃকা পাওয়া যাইতেছে মদস—দসজ্ঞ—সজ্ঞপ এই তিনটি, যাহা 'ম' ও 'দ' স্বরের মাতৃকা এবং স্বাভাবিক জোড়। 'ম' ও 'দ'=সজ্ঞ, 'দ' ও 'স'=সগ, 'ম' ও 'স'= সপ সম্বন্ধবিশিষ্ট। 'দ' স্বরের জোড়-মাতৃকা 'স' স্বরের মূল-মাতৃকা এবং 'ম' স্বরের জোড়-মাতৃকা 'দ' স্বরের মূল-মাতৃকা।

এখন মধ্যম প্রকৃতির সালঙ্কের পরিচয় দিতেছি।

সূত্র (১) ঃ— ২টি স্বর হইতে প্রাপ্ত তিনটি মাতৃকার ২ জোড় যাহা পরস্পর সজ্ঞ, সগ ও সপ সম্বন্ধ সম্পন্ন এবং তাহার সহিত ১টি আলংকারিক স্বর।

উদাহরণ (১) ঃ—'সরগমপন'—সগপ - গপন, গপন - পনর ; 'ম' অলংকার। 'স' স্বরের মূল-মাতৃকা সগপ, জোড়-মাতৃকা গপন এবং 'গ' স্বরের মূল-মাতৃকা গপন, জোড়-মাতৃকা পনর। 'স' হইতে সগপ, 'গ' হইতে গপন, 'প' হইতে পনর। এই স্বরগুলি অর্থাৎ যাহা হইতে মাতৃকাগুলি পাইয়াছি তাহাদের সম্বন্ধ 'গ'ও'প'=সজ্ঞ, 'স'ও'গ'=সগ, 'স'ও'প'=সপ।

উদাহরণ (২) ঃ—'সরজ্ঞগমধ'—(র)-রমধ - মধস-(ম), ধসগ (ধ), 'জ্ঞ' অলংকার। রমধ - মধস - ধসগ এই তিনটি মাতৃকা 'র' ও 'ম' স্বরের অর্থাৎ 'র' স্বরের রমধ - মধস এবং 'ম' স্বরের মধস-ধসগ। এখন 'র' স্বরের মূল-মাতৃকার জোড় 'ম' স্বরের মূল-মাতৃকা এবং 'ম' স্বরের মূল-মাতৃকার জোড় 'ধ' স্বরের মূল-মাতৃকা। 'র'ও'ম' স্বর সম্বন্ধে সজ্ঞ, 'ম'ও'ধ' স্বর সম্বন্ধে সগ এবং 'র'ও'ধ' স্বর সম্বন্ধে সপ।

সূত্র (২) ঃ—একই স্বরের ২ জোড়া মাতৃকা হইতে প্রাপ্ত রাগ এবং রাগিণী।

উদাহরণ ঃ—'সজ্ঞস্মপদন'—(দ) দসজ্ঞ - সজ্ঞ, (পদ) দনজ্ঞ - নজ্ঞস্ম। 'দ' স্বরের স্বাভাবিক মাতৃকা দসজ্ঞ এবং জোড় সজ্ঞপ অর্থাৎ সগপ সম্বন্ধে এবং দনজ্ঞ-নজ্ঞস্ম এই মাতৃকা এবং জোড় সজ্ঞপ সম্বন্ধে।

সূত্র (৩) ঃ—তুইটি স্বরের ২ জোড়া মাতৃকা হইতে সৃষ্ট রাগ এবং রাগিণী।

উদাহরণ ঃ—'সঋগস্মপধ'—(স্ম) স্মধঋ - ধঋগ, (ধ) ধসগ-সগপ।

সূত্র (৪) ঃ—উত্তম প্রকৃতির সালঙ্ক শ্রেণীর সহিত ২টি কিংবা মধ্যম শ্রেণীর সালঙ্কের সহিত ১টি আলংকারিক স্বরযুক্ত।

উদাহরণ (১) ঃ—'সরজ্ঞমধণন'—(র) রমধ - মধস, (ণ) ণরম - রমধ, 'জ্ঞ'ও'ন' আলংকারিক স্বর। 'র'ও'ণ' হইতে যে তিনটি মাতৃকা পাইলাম যাহারা পরস্পর 'র'ও'ম' = সজ্ঞ, 'ণ'ওর' = সগ এবং 'ণ'ও'ম' = সপ। এইটি উত্তম প্রকৃতির সালঙ্ক শ্রেণীর রীতি এবং 'জ্ঞ' ও 'ন' এই তুটি অলংকার।

উদাহরণ (২) ঃ—'সঋগস্মপধণ'—(স্ম) স্মধঋ - ধঋগ, (ধ) ধসগ - সগপ। 'ণ' স্বর অলংকার। ইহাকেও মধ্যম প্রকৃতির সালঙ্ক শ্রেণী বলা যাইবে।

সূত্র (৫) ঃ—তুইটি ভিন্ন স্বর হইতে প্রাপ্ত ২ জোড়া মাতৃকার সহিত ১টি অলংকার।

উদাহরণ ঃ—'সঋগস্মপদন'—(স) সগপ - গপন, (ঋ) ঋগদ - গদন। 'স্ম' অলংকার।

এখন অধম প্রকৃতির সালঙ্ক শ্রেণীর সূত্র ও উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করিতেছি।

সূত্র (১) ঃ—১টি স্বরের পুং ও স্ত্রী-মাতৃকা এবং অন্য ২টি স্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ২টি মাতৃকা।

উদাহরণ ঃ—'সরগক্ষপধণ' (ধ) ধসগ - সগপ। (প) পণর (স্ত্রী), (র) রক্ষধ (পুং)। 'প' হইতে ১টি এবং 'র' হইতে ১টি; এই ২টি ভিন্ন প্রকৃতির মাতৃকা।

সূত্র (২) ঃ—২টি স্বর হইতে প্রাপ্ত ৩টি মাতৃকার ২ জোড় ও মাতৃকায় ব্যবহৃত স্বরের ভিন্ন প্রকৃতির একক কোনও ১টি মাতৃকা।

উদাহরণ (১) ঃ--'সজ্ঞমপদন'—(ম) মদস - দসজ্ঞ, (দ) দসজ্ঞ-সজ্ঞপ, (দ) দনজ্ঞ। 'ম'ও'দ' এই ২টি স্বর হইতে প্রাপ্ত মদস - দসজ্ঞ - সজ্ঞপ অর্থাৎ ৩টি মাতৃকার ২ জোড় এবং 'দ' স্বর হইতে প্রাপ্ত ভিন্ন প্রকৃতির ১টি একক মাতৃকা দনজ্ঞ।

উদাহরণ (২) ঃ—'সরমপধণন'—(প) পণর - ণরম, (ণ) ণরম - রমধ, (প) পনর। 'প'ও'ণ' এই ২টি স্বর হইতে প্রাপ্ত পণর - ণরম - রমধ অর্থাৎ ৩টি মাতৃকার ২ জোড় এবং 'প' স্বর হইতে প্রাপ্ত ভিন্ন প্রকৃতির ১টি একক মাতৃকা পনর।

সূত্র (৩) ঃ—২টি স্বর হইতে প্রাপ্ত ৩ জোড়া মাতৃকার সহিত ২টি আলংকারিক স্বর।

উদাহরণ ঃ—'সঋগমক্ষপদণন'—(স) সগপ - গপন, (ঋ) ঋগদ - গদন, (ঋ) ঋমদ-মদস। 'ক্ষ'ও'ণ' আলংকারিক স্বর। ১টি স্বরও হইতে পারে। 'সওঋ' হইতে ৩ জোড়া মাতৃকা এবং 'ক্ষ'ও'ণ' আলংকারিক স্বর।

সূত্র (৪) ঃ—২টি স্বর হইতে প্রাপ্ত মাতৃকার ২ জোড় এবং অন্য ১টি একক মাতৃকা।

উদাহরণ ঃ—'সজ্ঞগমপদন'—(স) সগপ - গপন, (ম) মদস - দসজ্ঞ, (দ) দনজ্ঞ। 'স' স্বর হইতে ২টি মাতৃকার ১ জোড়, 'ম' স্বর হইতে ২টি মাতৃকার ১ জোড়, 'দ' স্বরের ১টি এককমাতৃকা।

সূত্র (৫) ঃ—৩টি স্বর হইতে প্রাপ্ত ২ জোড়া মাতৃকার সহিত ২টি আলংকারিক স্বর।

উদাহরণ ঃ—'সগমম্মপধণন'—(স) সগপ - গপন, (ম) মধস - ধসগ, (ধ) ধসগ - সগপ, 'ম্ম'ও'ণ' অলংকার।

এখন **উত্তম সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর** আলোচনা করিতেছি ঃ

সূত্র (১) ঃ—৩টি স্বরের ৪টি মাতৃকার ৩ জোড়, তাহার সহিত ১টি আলংকারিক স্বর।

উদাহরণ (১) ঃ—'সরগপধন'—(ধ) ধসগ - সগপ, (স) সগপ - গপন, (গ) গপন - পনর ; ৩টি স্বর 'ধ', 'স', 'গ' ; মাতৃকা ৪টি ধসগ, সগপ, গপন, পনর এবং জোড় ৩টি, যথা ঃ—ধসগ - সগপ ১ জোড়, সগপ - গপন ২ জোড় এবং গপন - পনর ৩ জোড়।

উদাহরণ (২) ঃ—'সগমম্মপধন'—(ম) মধস - ধসগ, (ধ) ধসগ - সগপ, (স) সগপ - গপন। 'ম', 'ধ' এবং 'স' তিনটি স্বর, মাতৃকা ৪টি মধস, ধসগ, সগপ ও গপন এবং জোড় তিনটি মধস - ধসগ, সগপ - গপন, ধসগ - সগপ এবং 'ম্ম' অলংকার;

উদাহরণ (৩) ঃ—'সরজ্ঞমপণ'—(স) সজ্ঞপ - জ্ঞপণ, (জ্ঞ) জ্ঞপণ - পণর, (প) পণর - ণরম, 'স', 'জ্ঞ' ও 'প' এই ৩টি স্বর, সজ্ঞপ জ্ঞপণ, পণর, ণরম, মাতৃকা ৪টি, সপজ্ঞ - জ্ঞপণ, জ্ঞপণ - পণর, পণর - ণরম এই তিন জোড়।

এখন **মধ্যম সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর**আলোচনা করিতেছি ঃ

সূত্র ঃ—(১) ব্যবহৃত স্বর হইতে প্রাপ্ত মাতৃকাগুলির স্বাভাবিক জোড় পাওয়া যাইবে।

উদাহরণ ঃ—(১) 'সরগমপধন'—সগপ - গপন, রমধ - মধস, গপন - পনর, মধস - ধসগ ; ধসগ - সগপ। সগপ, রমধ, গপন, মধস, পনর, ধসগ এই ৬টি মাতৃকার স্বাভাবিক জোড় পাওয়া গিয়াছে।

উদাহরণ (২)ঃ—'সরজ্ঞমপদণ'—সজ্ঞপ-জ্ঞপণ, জ্ঞপণ-পণর, মদস-দসজ্ঞ, পণর-ণরম এবং দসজ্ঞ-সজ্ঞপ। সজ্ঞপ, জ্ঞপণ, মদস, পণর, দসজ্ঞ ও ণরম এই ৬টি মাতৃকারই জোড় আছে।

সূত্র (২)ঃ—ব্যবহৃত স্বরসংখ্যা সমান সমান হইবে এবং স্বাভাবিক ভাবেই প্রত্যেক মাতৃকার পুং ও স্ত্রী-মাতৃকা হিসাবে জোড় পাওয়া যাইবে।

উদাহরণঃ—'সরগমহ্মপধন'—(স) সগপ, (র) রমধ, (গ) গপন, (ম) মধস, (প) পনর, (ধ) ধসগ, (ন) নরহ্ম, (র) রহ্মধ। ৮টি স্বর হইতে ৮টি মাতৃকা। স্বাভাবিক জোড়গুলি সগপ-গপন, রমধ-মধস, গপন-পনর, মধস-ধসগ, পনর-নরহ্ম, ধসগ-সগপ, নরহ্ম-রহ্মধ। ৮টি স্বর হইতে ৮টি মাতৃকা এবং পুং স্ত্রী হিসাবে স্বাভাবিক জোড়।

এখন **অধম সঙ্কীর্ণ শ্রেণী** সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি ঃ

সূত্রঃ—ব্যবহৃত স্বরের মাতৃকার স্বাভাবিক পুং ও স্ত্রী-জোড় পাইবার পরেও যদি কোনও মাতৃকা একক অর্থাৎ জোড়বিহীন কিংবা ভিন্ন প্রকৃতির জোড় অর্থাৎ ১টি স্বরের পুং ও অন্য স্বরের স্ত্রী-মাতৃকার জোড় হইতে সৃষ্ট হয়।

উদাহরণঃ—'সরজ্ঞমপধণন'—সজ্ঞপ-জ্ঞপণ, রমধ-মধস, জ্ঞপণ-পণর, পণর-ণরম, ণরম-রমধ ; পনর মাত্র একক মাতৃকা, অন্যান্য সমস্ত মাতৃকার স্বাভাবিক জোড় পাওয়া গিয়াছে।

মাতৃকার গুণাবলীর পরিচয়ে আমরা ১১ প্রকার গুণের আলোচনা করিয়াছি। আমরা এই পর্য্যন্ত মাতৃকার গুণাবলী দ্বারা রাগ-রাগিণীর গঠন, পৃথক পৃথক রূপে সনাক্তকরণ, রাগ-রাগিণীগুলির বিভেদ নিরূপণ, অন্ত্যজ রাগ-রাগিণী, যাহা বৈদিক যুগে দেশী নামে কথিত, তাহার পৃথকীকরণ, রাগ-রাগিণীর শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার, রাগ-রাগিণীর মিশ্রণের মান নির্ণয়ন পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছি।

আলোচনা অধ্যায়ে আমরা মাতৃকার সাহায্যে বাদী, সমবাদী তান গঠন, প্রচলিত রাগ-রাগিণীর ত্রুটি সংশোধন এবং সংখ্যা নিরূপণ কিরূপে করা যাইবে তাহার আলোচনা করিব। আলোচনাধ্যায়ের আরম্ভে বা প্রথমেই যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিব তাহা বৈদিক তথা প্রাচীন যুগের মনীষী এবং অধুনা যুগের তথাকথিত পণ্ডিতগণের মতামত সম্বন্ধীয়।

শ্রেণীর বিচারকালে এক একটি শ্রেণীর অন্তর্গত কয়েক প্রকার স্বরসমাবেশ আমরা পাইয়াছি। সেই প্রকৃতির স্বরসমাবেশগুলির পৃথক পৃথক সূত্র এবং উদাহরণ দ্বারা পৃথক পৃথক বিচার করিয়াছি। এইগুলিরও পৃথক পৃথক নাম দেওয়া যাইতে পারে। পৃথক নামের বিশেষ প্রয়োজনবোধ না করায় একই প্রকৃতিগত কত প্রকার বিভেদ হইতে পারে তাহাই কেবল বলা হইল। নতুবা যে যে শ্রেণীর মধ্যে ২।৩।৪টি করিয়া সূত্র বা উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাদেরও পৃথক নামকরণ করা যাইবে।

স্বর সম্বন্ধে, প্রাচীন অর্থাৎ বৈদিক এবং আধুনিক, মতামত-এর বিষয় বহু তথ্য লিখিত হইয়াছে তথাপিও একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। প্রথম স্বর কোন্‌টি ? বৈদিক যুগে মার্গসংগীতে "ম"-কে ১ম স্বর বলা হইয়াছে। তাহাকে এত বেশী মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে যে স্বয়ম্ভু ব্যতীত আর অন্য কোন নামে তাহাকে পরিচিত করা যায় নাই। আমার মতামত ১ম স্বর সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে কম্পন হইতেই স্বর, সেই কম্পনসংখ্যা তাঁহাদের স্বয়ম্ভু নামধারী "ম" স্বরের কত তাহা তাঁহারা বলেন নাই। মনে হয়, আমরা যেমন বর্ত্তমানে ষড়্‌জ গ্রামের ১ম স্বর 'স' বলি, তাঁহারাও তেমনি মধ্যম গ্রামের ১ম স্বরকে 'ম' বলিয়াছেন। প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতানুসরণ করিয়া আমি 'ম' বা স্বয়ম্ভু অপেক্ষা আমাদের বর্ত্তমানের ষড়্‌জ গ্রামের 'গ' স্বরকে অনেক বেশী মূল্যবান স্বর মনে করি। এই 'গ' স্বরের মূল্য এবং মর্য্যাদা ভারতীয় সংগীতের মূল মন্ত্র এবং বীজ। এই 'গ' স্বর দ্বারা আমরা ভারতীয় সংগীতের বহু গুণাবলী বিশ্লেষণ করিয়াছি।

এখন বৈদিক যুগের কথিত "গ্রাম" শব্দটির আলোচনা করিতেছি। গ্রামের সংজ্ঞা পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। বৈদিক কিংবা প্রাচীন যুগেও এই "গ্রাম" শব্দটির প্রচলন ছিল তাহা জানিয়াছি। পুরাকালে গ্রাম যে অর্থে ব্যবহৃত হইত বর্ত্তমানে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বৈদিক যুগে আমরা ষড়্‌জ, গান্ধার ও মধ্যম এই তিন গ্রাম পাইয়াছি। বর্ত্তমানে আমরা গ্রাম বলিতে উদারা, মুদারা, তারা বা মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিনটি স্থান পাইতেছি। এইরূপ হইবার কারণ কি হইতে পারে ? কোন্ মতটি নির্ভুর্ল

বা যুক্তিযুক্ত তাহার আলোচনা করিতেছি। বৈদিক যুগে মধ্যম ইত্যাদিকে গ্রাম নামে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পৌরাণিক যুগে অর্থাৎ বায়ুপুরাণে তিনশত অলংকারের মধ্যে স্থান, বর্ণ, অলংকার, মন্দ্র, মধ্য, তার ইত্যাদির আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রাম অর্থে কোন্‌টিকে অর্থাৎ ষড়জ, গান্ধার, মধ্যম না মন্দ্র, মধ্য, তারকে প্রকৃত আখ্যা দেওয়া যাইবে তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রথমে বলা হইয়াছে যে প্রাচীন যুগে লোকপিতামহ 'ব্রহ্মা' নারদ, ভরত, হূহূ, তুম্বুরু, ও রম্ভা এই পাঁচজনকে সামবেদ হইতে সংগীত আহরণ করিয়া বেদ বিধানে শিক্ষা দেন। আমরা নিশ্চয়ই মনে করিতে পারি যে এই পাঁচজনের কণ্ঠস্বর একই প্রকৃতির ছিল না। তাহাদের কণ্ঠের ধ্বনি বা স্বরের মাপের অনুপাতে প্রারম্ভিক স্বর হিসাবে কাহাকেও প্রাচীন যুগের কথিত বা স্থিরীকৃত মধ্যম, কাহাকেও বা গান্ধার এবং কাহাকেও হয়তো ষড়জ হইতে মেরু ধার্য্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানেও আমরা কি এইরূপ রীতি পাইতেছি না? মানবের কণ্ঠস্বরের প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকার। সেইজন্যই কণ্ঠস্বরের পরিমাপের অনুপাতে ষড়জ বা প্রারম্ভিক স্বর নির্ব্বাচন করা হইয়া থাকে। তৎকালেও এইরূপই হইয়াছিল মনে করিতে পারি। প্রারম্ভিক স্বর বা ষড়জ যথাযথভাবে কণ্ঠস্বরের প্রকৃতি অনুযায়ী ধার্য্য করা না হইলে কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য এবং স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হইয়া কণ্ঠস্বরের তথা শরীরের নানারূপ ক্ষতি হইতে পারে। এই কারণে প্রাথমিক স্বর অত্যন্ত চিন্তা করিয়া বিচক্ষণতার সহিত ধার্য্য করা উচিত।

পুস্তক রচয়িতাগণ এবং প্রাচীন মনীষীগণ 'গ্রাম' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, মূর্চ্ছনা ও শ্রুতির সমষ্টি। ইহা হইতে আমরা নিশ্চয়ই মনে করিতে পারি, তাঁহারা একটি মাত্র স্বরের মূর্চ্ছনা এবং শ্রুতির সমষ্টি হইতে 'গ্রাম রাগ' সৃষ্টি করেন নাই। গ্রাম রাগ

বলিতে আমরা আরও একটি বিষয় চিন্তা করিতে পারি। সাধারণের মধ্যে বহুলভাবে প্রচারিত কোন একটি রাগ বা গীতিরূপকেও গ্রাম রাগ মনে করিতে পারি, যাহার অপর নাম আমরা গ্রামগেয় রাগ হিসাবে পাই। নারদ, ভরত প্রভৃতি প্রাচীন মনীষীগণও একটি স্বরের মূর্চ্ছনা বা শ্রুতি হইতে সৃষ্ট এমন কোন রাগের নাম 'গ্রাম রাগ' ধার্য্য করেন নাই এবং যদিও করিয়া থাকেন তাহা আমার জানা নাই। সৃষ্টি না করার হেতু-স্বরূপ বলা যায় যে, সেই সময় সপ্তস্বর্য্য গান, ১৮ প্রকার জাতি গান, স্বরের স্থান ইত্যাদি আমরা জানিয়াছি। মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিনটিকে গ্রাম এবং ষড়জ, গান্ধার, মধ্যম এই তিনটিকে গীতকালীন স্বর বা মেরুস্বর বলিতে পারি। কণ্ঠস্বরের মাপ অনুপাতে এই তিনটি স্বর অর্থাৎ ম, গ ও স বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেরুস্বর রূপে ধার্য্য করা হইয়াছিল, ইহাই মনে হয়। স্বভাবতই মনে করা যায় যে, নারদ, ভরত, হূহূ, তুম্বুরু ও রম্ভা এই পাঁচজনের কণ্ঠস্বর এক প্রকৃতির নহে। নারদ এবং ভরতকে আমরা মনুষ্যপদবাচ্য, হূহূ ও তুম্বুরুকে গন্ধর্ব্ববংশীয় এবং রম্ভাকে স্বর্গের অপ্সরী বলিয়া কথিত রূপে জানিয়াছি। সাধারণত নারীজাতির কণ্ঠ পুরুষ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ। সেই কারণে নারীর কণ্ঠস্বরের মাপ পুরুষের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা কিছু উচ্চ বা তীক্ষ্ণ হওয়া স্বাভাবিক। এইজন্য মনে করিতে পারি রম্ভার কণ্ঠস্বরের অনুপাতে তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মধ্যম স্বরকে প্রারম্ভিক স্বর ধার্য্য করিয়াছিলেন। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, সেইযুগে স্বরের গতি নিম্নাভিমুখী ছিল। হূহূ এবং তুম্বুরু ইহারা গন্ধর্ব্ব এবং স্বভাবসিদ্ধ গায়ক। তাহাদের কণ্ঠস্বরও সাধারণ মনুষ্যকণ্ঠস্বর অপেক্ষা কিছু মার্জ্জিত এবং তীক্ষ্ণ। গান্ধার স্বরটিকে হয়তো এই কারণে ইহাদের প্রারম্ভিক স্বর হিসাবে ধার্য্য করিয়াছিলেন। নারদ এবং ভরত ইহাদেরও কণ্ঠস্বরের মাপ

অনুপাতে প্রারম্ভিক স্বর হিসাবে ষড়জকে ধার্য্য করা হইয়াছিল। আমরা জানিয়াছি যে, যে যুগে মধ্যম গ্রাম, গান্ধার গ্রাম, ষড়জ গ্রাম প্রচলিত ছিল সেই সময়ে স্বরের গতি নিম্নাভিমুখী ছিল। বর্ত্তমানে আমরা ষড়জ গ্রাম যাহা পাইতেছি তাহার গতি ঊর্দ্ধাভিমুখী।

এক্ষণে আমরা মূর্চ্ছনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। গ্রাম-সমূহের আশ্রয়ে স্বরসমূহের যে আরোহ ও অবরোহ তাহাকেই মূর্চ্ছনা বলে। কোন এক স্বর হইতে অন্য এক বা ততোধিক স্বরে কোনরূপ বিশ্রাম না করিয়া যাতায়াত করার নামও মূর্চ্ছনা। বৈদিক যুগের ঠিক পর হইতেই আমরা মূর্চ্ছনার নাম পাই। মনীষীরা ২১টি সংখ্যা মূর্চ্ছনার স্থির করিয়াছেন, এক এক গ্রামের স্বরে একটি করিয়া ৭টি হিসাবে। প্রাচীন যুগে তিনটি গ্রাম অর্থাৎ গান্ধার, মধ্যম এবং ষড়জ, অধুনা মন্দ্র, মধ্য, তার নামে তিনটি গ্রাম প্রচলিত। অধুনা পণ্ডিতগণের মতে গান্ধার ও মধ্যম গ্রাম লুপ্ত কেবলমাত্র ষড়জ গ্রাম প্রচলিত। পণ্ডিতগণ এই মূর্চ্ছনা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। নিজ মত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মত খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন যুগের রাগ রাগিণীগুলিতে এক একটি মূর্চ্ছনা যে প্রধান একথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন।

অধুনা প্রচলিত মূর্চ্ছনার নামগুলির মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য দেখা যায় তাহাতে মনে হয় একে অপরকে সম্পূর্ণ অনুকরণ না করিয়া নিজ নিজ জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে নামের কিছু কিছু অদল বদল করিয়াছেন। যে কয়টি মূর্চ্ছনার নাম আমরা পাইয়াছি তাহার উল্লেখ করিতেছি। যথা ঃ—

(১) নন্দা, বিশালা, সুমুখী, চিত্রা, চিত্রাবতী, সুখা, বলা।

(২) সংরা, বিশাল্পী, সুমুখী, চিতা, চিত্রাবতী, শুভা, আলাপা।

(৩) আপ্যায়নী, বিশ্বভূতা, চন্দ্রা, হেমা, কপর্দ্দিনী, মৈত্রী, বার্হতি।

(৪) সৌবিরী, হরিণাশ্বা, কলোপনতা, শুদ্ধমধ্যা, মাদলী, পৌরবী, হৃষ্যকা।

(৫) সংবিরী, হরিণাশ্বা, কলোপনতা, শুদ্ধমধ্যা, মাদলী, পৌরবী, হৃষ্যকা।

(৬) সৌবিরী, হরিণাশ্বা, কলোপবলী, শুদ্ধমধ্যা, শার্ঙ্গী, পাবনী, দৃষ্টকা।

মূর্চ্ছনার আরও কয়েকটি নাম পাওয়া যায় কিন্তু তাহা কোন্ গ্রামের তাহারও কোন উল্লেখ যথাযথভাবে পাওয়া যায় না। যথা:— উত্তরায়তা, উত্তরমন্দ্রা, অভিরুদ্গতা, রজনী, প্রথমা, মার্গী ও শুদ্ধমধ্যা।

পারিজাতকার তাঁহার মূর্চ্ছনাপ্রকরণে বলিয়াছেন যে, 'স' স্বরকে মেরু করিয়া যে মূর্চ্ছনা পাওয়া যাইবে তাহার নাম উত্তর-মন্দ্রা, 'র' স্বরকে মেরু ধার্য্য করিয়া অভিরুদ্গতা, 'গ' স্বরকে মেরু ধার্য্য করিয়া অশ্বক্রান্তা, 'ম' স্বরকে মেরু ধার্য্য করিয়া মৎসরীকৃতা, 'প' স্বরকে মেরু ধার্য্য করিয়া শুদ্ধষড়জা, 'ধ' স্বরকে মেরু ধার্য্য করিয়া উত্তরায়তা, এবং 'ন' স্বরকে মেরু ধার্য্য করিয়া রজনী নাম্নী মূর্চ্ছনা পাওয়া যাইবে। পারিজাতকারের মতে ষড়জগ্রামই উত্তম। মনে হয় এই মূর্চ্ছনাগুলি তিনি ষড়জ গ্রামের স্বরেরই ধার্য্য করিয়াছেন।

এই মত হইতেও আমরা জানিতে পারি গান্ধার এবং মধ্যম গ্রাম লুপ্ত এবং ষড়জ গ্রাম প্রচলিত। মূর্চ্ছনাগুলি হইতে বোঝা যায় যে, এক একটি স্বরের এক একটি করিয়া মূর্চ্ছনা। অধুনা পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে, ষড়জ গ্রাম প্রচলিত। কিন্তু মূর্চ্ছনা বা শ্রুতি হিসাব করিবার সময় ২১ মূর্চ্ছনা এবং ২২ শ্রুতি বলেন। যেহেতু

আমরা তিন গ্রামে ২১টি মূর্চ্ছনা পাইতেছি সেইহেতু বর্ত্তমানে আমাদের ৭টি মূর্চ্ছনা এবং ২২টি শ্রুতি বলা উচিত।

বিভিন্ন মতে, বিভিন্ন যুগে শ্রুতি সম্বন্ধে বহু আলোচনা করা হইয়াছে। সেই সমস্ত আলোচনা কি প্রকার করা হইয়াছে তাহারই আলোচনা করিতেছি। প্রাচীন কালের পুস্তক নারদীয় শিক্ষা হইতে আমরা যেরূপ শ্রুতির সংখ্যা পাই তাহার ন্যায় শ্রুতিসংখ্যা আমরা নাট্যাচার্য্য ভরত কৃত নাট্যশাস্ত্র হইতেও পাইতেছি। বৈদিক যুগ হইতেই আমরা সংগীতে ব্যবহৃত ৭টি প্রকৃত স্বর পাই। সেই সময় হইতেই আমরা শ্রুতির বিচার, নাম ও লক্ষণাদি পাইয়াছি। বর্ত্তমানেও আমরা সংগীতে যে ২২ শ্রুতির ব্যবহার জানিয়াছি তাহাও নাট্যাচার্য্য ভরতেরই মত বলিয়া কথিত। এই আবিষ্কারও আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য, কেননা ইতিহাস হইতে এই সত্য প্রমাণিত। নারদীয় শিক্ষা হইতে আমরা শ্রুতি, গ্রাম, জাতি, রাগ ইত্যাদির সহিত পরিচিত। এই পুস্তক হইতে আমরা শ্রুতির কোন বিশেষ বিবরণ পাই না। আচার্য্য ভরতই শ্রুতির নামকরণ, শ্রুতির সংখ্যা নির্ণয় ও লক্ষণাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা শ্রুতির বিচারকালে পূর্ব্ব লিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করিব।

৩য় শতাব্দী হইতে ৫ম শতাব্দী পর্য্যন্ত আমাদের বর্ত্তমান প্রচলিত স্বরনামও যেমন ব্যবহৃত হইত তেমনি বৈদিক স্বরনামগুলি অপ্রচলিত হয় নাই। বর্ত্তমানে আমরা যেমন স্বরসমূহ অনুলোমগতিতে ব্যবহার করিয়া সপ্তক রচনা করি তেমনি বৈদিক যুগে বিলোমগতিতে স্বর স্থাপনা করিয়া সপ্তক রচনা হইত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আমরা বৈদিক যুগের স্বরনাম ১ম, ক্রুষ্ট, ৪র্থ, ২য়, ৩য়, অতিস্বার্য্য ও মন্দ্র এই ৭টি পাইয়াছি। ঐ সময়ে লৌকিক নামও প্রচলিত ছিল, যথা—১ম=ম, ক্রুষ্ট=প, ৪র্থ=স, ২য়=গ, ৩য়=র, অতিস্বার্য্য=ন এবং মন্দ্র=ধ। ভরতের যুগে

আমরা মাত্র প্রকৃত বা শুদ্ধ স্বরেরই ব্যবহার পাই। বিকৃত স্বরের ইতিহাস আমরা সেই যুগে পাই নাই। একমতে নন্দিকেশ্বর প্রথমে প্রকৃত স্বরের মূর্চ্ছনার সাহায্যে বিকৃত স্বরসমূহ রচনা করেন। ভরতাদি বিভিন্ন মনীষীগণের মত মত যদি প্রকৃত স্বর সপ্তকে আমরা ভরত সৃষ্ট শ্রুতি স্থাপনা করি এবং বিকৃত স্বরস্থান নির্ম্মাণ করিতে চাই, তবে আমরা কোন্ কোন্ স্থানে স্বরস্থান পাই এবং কোথায় কোন্ স্বর স্থাপন করিতে পারি তাহা জানিবার জন্যই নিম্নলিখিত বৃত্তান্তিকাগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। যেহেতু পৌরাণিক যুগের স্বরস্থাপনা বিলোমগতিতে পাইয়াছি শ্রুতিও সেইহেতু বিলোমগতিতে স্থাপনা করাই সমীচীন, যাহাতে প্রাপ্ত স্বরস্থানগুলিও প্রকৃত স্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী বা নিম্নে স্থান করিতে পারে।

নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে বোঝা যাইবে কোন্ কোন্ স্বর-স্থান আমরা কোথায় কোথায় পাইতেছি। কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ স্বর স্থাপন করিতেছি ইহার পরিচয়ের জন্যই সংখ্যা, বৈদিক স্বর, লৌকিক স্বর, প্রাপ্ত স্বরস্থান, শ্রুতির সংখ্যা, প্রতিটি বিষয়ই উল্লেখ করিতেছি। প্রথমে নারদীয় শিক্ষার মতে শ্রুতিটি আলোচনা করিতেছি।

উদাহরণ—শ্রুতি (১) ঃ—

সংখ্যা ঃ—	৭	৬	৫	৪	৩	২	১
বৈদিক স্বর ঃ	মন্দ্র	অতিস্বার্য্য	৩য়	২য়	৪র্থ	ক্রুষ্ট	১ম
লৌকিক স্বর ঃ	ধ	ন	র	গ	স	প	ম
শ্রুতিসংখ্যা ঃ	০০,	০০০,	০০০০,	০০০০,	০০,	০০০,	০০০০
প্রাপ্ত স্বরস্থান ঃ	নাই,	১টি,	১টি,	১টি,	নাই,	১টি,	১টি

উপরোক্ত স্বরসমূহ বিলোমগতিতে প্রদর্শিত এবং শ্রুতিও বিলোমগতিতে স্থাপিত। ম ও প স্বরের অন্তর বৃহৎ, তাহার মধ্যে

১টি স্বরস্থান পাই। প ও স স্বরের মধ্য অন্তরেও আমরা ১টি স্বরস্থান পাই। স ও গ স্বরের মধ্যবর্ত্তী অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় তাহার মধ্যে আমরা কোনও স্বরস্থান পাই না। গ ও র স্বরের মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ অন্তরেও আমরা ১টি স্বরস্থান পাই। র ও ন স্বরের মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ অন্তরেও ১টি স্বরস্থান পাই। ন ও ধ স্বরের অন্তর মধ্য হওয়াতেও তাহার মধ্যেও ১টি স্বরস্থান পাই। ধ ও ম স্বরের মধ্যবর্ত্তী অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় তাহার মধ্যে কোনও স্বরস্থান পাই না। এইরূপে প্রকৃত স্বরস্থানের মধ্যে মধ্যে শ্রুতি স্থাপনে যে অন্তর সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আমরা তিন প্রকার বিভাগে পাইতেছি। এই প্রকার অন্তর ভেদে আমরা ১ম, ৪র্থ ও ৫ম পাই বৃহৎ অন্তর, ২য় ও ৬ষ্ঠ পাই মধ্য অন্তর এবং ৩য় ও ৭ম পাই ক্ষুদ্র অন্তর রূপে।

ভরতের যুগেই আমরা স্বরনামের পরিবর্ত্তন পাইয়াছি। প্রকৃত স্বরের রূপ বিলোমগতিতে প্রদর্শিত হওয়া সত্ত্বেও নিম্নলিখিত রূপ ধারণ করিয়াছিল। বৈদিক তথা লৌকিক স্বর নামগুলি যথাক্রমে লিখিত হইতেছে। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, অতিস্বার্য্য, মন্দ্র এবং ক্রুষ্ট। বৈদিক নামগুলির অনুপাতে লৌকিক স্বরনামগুলিও ম, গ, র, স, ন, ধ, প এইরূপে প্রদর্শিত এবং প্রচলিত। এই স্বরনামে পূর্ব্বোক্ত প্রথামত বিলোমগতিতে স্বরের অনুপাতে শ্রুতি স্থাপনা করিয়া বিশদভাবে আলোচনা করিতেছি।

উদাহরণ—শ্রুতি (২) ঃ—

সংখ্যা ঃ	৭	৬	৫	৪	৩	২	১
বৈদিক স্বর ঃ	ক্রুষ্ট	মন্দ্র	অতিস্বার্য্য	৪র্থ	৩য়	২য়	১ম
লৌকিক স্বর ঃ	প	ধ	ন	স	র	গ	ম
শ্রুতিসংখ্যা ঃ	০০,	০০০,	০০০০,	০০০০,	০০,	০০০,	০০০০
প্রাপ্ত স্বরস্থান ঃ	নাই,	১টি,	১টি,	১টি,	নাই,	১টি,	১টি

উপরোক্ত স্বরসমূহের পূর্ব্ব পদ্ধতি মত বিচার করিলে আমরা ম ও গ স্বরের মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ অন্তরে ১টি স্বরস্থান পাই। গ ও র স্বরের মধ্যবর্ত্তী মধ্য অন্তরে ১টি স্বরস্থান পাই। র ও স স্বরের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র অন্তরে কোনও স্বরস্থান পাই না। স ও ন স্বরের মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ অন্তরে ১টি স্বরস্থান পাই। ন ও ধ স্বরের মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ অন্তরে ১টি স্বরস্থান পাই। ধ ও প স্বরের মধ্যবর্ত্তী মধ্য অন্তরে ১টি স্বরস্থান পাই। প ও ম স্বরের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র অন্তরে কোনও স্বরস্থান পাই না। এই শ্রুতি স্থাপনার অন্তরভেদের বিচার করিলে ১ম, ৪র্থ ও ৫ম স্থান পাই বৃহৎ অন্তর, ২য় ও ৬ষ্ঠ স্থান পাই মধ্য অন্তর এবং ৩য় ও ৭ম স্থান পাই ক্ষুদ্র অন্তর রূপে। নারদীয় শিক্ষার মতে শ্রুতির বিচারে আমরা এই প্রকার অন্তর ভেদই পাইয়াছি। এই শ্রুতির বিচারের স্বরস্থানগুলিতে আমাদের প্রচলিত স্বরনামগুলি স্থাপন করিলে কোন্ কোন্ স্বর কোথায় পাইব তাহারই আলোচনা করিতেছি। শ্রুতির বিলোমগতি ত্যাগ করিয়া ১ম স্বরের নাম 'প' গ্রহণ করিয়া সপ্তক রচনা করিলে আমরা সপ্তকের শেষ স্বর পাইব 'ম'। ইহাই আমাদের বর্ত্তমান প্রচলিত সপ্তকের রীতি ও গঠন। 'প' স্বর পরিবর্ত্তিত 'ম্ম' স্বরের রূপে, 'প' স্বর পাইব 'প ও ধ' স্বরের মধ্য অন্তরে, 'ধ' স্বর পরিবর্ত্তিত 'দ' স্বরের রূপে, ধ ও ন স্বরের বৃহৎ অন্তরে পাইব 'ধ' স্বর, 'ন' স্বর পরিবর্তিত 'ণ' স্বরের রূপে, ন ও স স্বরের বৃহৎ অন্তরে পাইব 'ন' স্বর, 'র' স্বর পরিবর্ত্তিত 'ঋ' স্বরের রূপে, র ও গ স্বরের মধ্য অন্তরে পাইব 'র' স্বর, 'গ' স্বর পরিবর্ত্তিত 'জ্ঞ' স্বরের রূপে, গ ও ম স্বরের বৃহৎ অন্তরে পাই 'গ' স্বর। এই শ্রুতি হইতে যদি আমরা বিলোমগতি অনুয়ায়ী স্বর স্থাপনা করি তবে আমরা পূর্ব্বোক্ত রূপ স্বরগুলিই পাইব। ম স্বরের শ্রুতি হইতে ম ও গ, গ পরিবর্ত্তিত 'জ্ঞ' স্বরের

রূপে লিখিত, 'গ' স্বরের শ্রুতি হইতে 'র' স্বর, 'র' স্বর পরিবর্ত্তিত 'ঋ' স্বরের রূপে, স ও ন স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আমরা 'ন' স্বর, 'ন' পরিবর্ত্তিত 'ণ' স্বরের রূপে, ন ও ধ স্বরের মধ্যবর্ত্তী শ্রুতিতে পাই 'ধ' স্বর, 'ধ' স্বর পরিবর্ত্তিত 'দ' স্বরের রূপে, ধ ও প স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পাই 'প' স্বর এবং 'প' স্বর পরিবর্ত্তিত 'ঙ্ক' স্বরের রূপে। এইরূপ শ্রুতির বিচার হইতে দেখা গেল কয়েকটি প্রকৃত স্বরকে বিকৃত স্বরের রূপ গ্রহণ করিতে।

স্বরের অধিকৃত শ্রুতিতে অন্য স্বর স্থাপনা করিয়া বিচার করিলে কিরূপ স্বরস্থান কোথায় কোথায় পাইব তাহার আলোচনা করিতেছি। কোন্ কোন্ স্বরে কোন্ কোন্ শ্রুতি ধার্য্য করিয়াছি তাহার উল্লেখ করিতেছি। 'ম' স্বরের ৪ শ্রুতি 'প' স্বরে, 'গ' স্বরের ৩ শ্রুতি 'ধ' স্বরে, 'র' স্বরের ২ শ্রুতি 'ন' স্বরে, 'স' স্বরের ৪ শ্রুতি 'স' স্বরে, 'ন' স্বরের ৪ শ্রুতি 'র' স্বরে, 'ধ' স্বরের ৩ শ্রুতি 'গ' স্বরে, 'প' স্বরের ২ শ্রুতি 'ম' স্বরে। এই সময় হইতেই লৌকিক স্বরনাম দ্বারাই আলোচনা করিব। বৈদিক নামের আর প্রয়োজন মনে করি না।

উদাহরণ—শ্রুতি (৩) ঃ—

স্বরনাম ঃ	প	ধ	ন	স	র	গ	ম
শ্রুতিসংখ্যা ঃ	০০০০,	০০০,	০০,	০০০০,	০০০০,	০০০,	০০
স্বরস্থান ঃ	১টি,	১টি,	নাই,	১টি,	১টি,	১টি,	নাই

উদাহরণ—শ্রুতি (৩) লিখিত স্বরগুলির শ্রুতির অনুপাতে আমরা কোথায় কোন্ স্বর স্থাপনা করা যাইবে তাহার আলোচনা করিতেছি। ম ও গ স্বরের মধ্যবর্ত্তী অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় তাহাতে স্বরস্থান পাই না। গ ও র স্বরের মধ্যবর্ত্তী মধ্য অন্তরে আমরা 'জ্ঞ' স্বর পাইব। র ও স স্বরের মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ অন্তরে আমরা 'ঋ'

স্বর পাইব। স ও ন স্বরের মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ অন্তরে আমরা 'ন' স্বর পাইব। 'ন' স্বর পরিবর্ত্তিত 'ণ' স্বরের রূপে। 'ন' স্বর ও 'ধ' স্বরের মধ্যবর্ত্তী অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় কোনও স্বরস্থান পাইব না। ধ ও প স্বরের মধ্যবর্ত্তী মধ্য অন্তরে 'দ' স্বর পাইব। প ও ম স্বরের মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ অন্তরে আমরা 'ম্ব' স্বর পাইব। শ্রুতি স্থাপনার অন্তর বিচারকালে আমরা ১ম, ৪র্থ ও ৫ম পাইলাম বৃহৎ, ২য় ও ৬ষ্ঠ পাইলাম মধ্য এবং ৩য় ও ৭ম পাইলাম ক্ষুদ্র অন্তররূপে। আমরা তিন প্রকার শ্রুতির বিচার হইতে শ্রুতির স্থাপনার অন্তরগুলি কেবলমাত্র একই রূপে পাই। শ্রুতি স্থাপনায় যে অন্তর প্রকৃত স্বরের ক্ষেত্রেও পাইয়াছি, এই স্থলেও ঠিক সেইরূপই পাইলাম।

বর্ত্তমানে প্রচলিত কয়েকটি সংগীতপুস্তক শ্রুতির স্থাপনা কিরূপ করিয়াছেন তাহা বলা হইতেছে। একটি মাত্র স্বরের আলোচনার মাধ্যমেই কে কোন্ প্রথায় শ্রুতি স্থাপনা করিয়াছেন তাহা জানা যাইবে। সংগীতরত্নাকর, সংগীতপারিজাত, রাগবিবোধ, চতুর্দ্দণ্ডীপ্রকাশিকা, স্বরমেলকলানিধি, সংগীতদর্পণ, লক্ষ্যসংগীত, দাক্ষিণাত্য সংগীত, বৃহদ্দেশী, সংগীতসময়সার, সংগীতমকরন্দ, রাগতত্ত্ববিবোধ, হৃদয়কৌতুক, হৃদয়প্রকাশ, রাগতরঙ্গিণী প্রভৃতি পুস্তক, সকলেই স্বরের নিম্নাভিমুখী শ্রুতির স্থাপনা বিষয়ে একমত। তাহাদের মতামত পৃথক পৃথক প্রকারে উল্লেখ করিয়াছি।

আমরা প্রাচীন বা বৈদিক যুগে শিক্ষাকার নারদ রচিত নারদীয় শিক্ষা হইতে শ্রুতির বিলোমগতি পাইয়াছি। তৎকালে স্বরেরও বিলোমগতি ছিল।

এই সময়েই আমরা মাণ্ডুকী রচিত মাণ্ডুকীশিক্ষা যাহা নারদীয় শিক্ষার টীকা, তাহাতেও আমরা শ্রুতির এবং স্বরের বিলোমগতি পাইয়াছি।

এই সময়ের ঠিক পরবর্ত্তীকালে আমরা পাই নাট্যশাস্ত্র প্রণেতো নাট্যাচার্য্য ভরতকে এবং দত্তিলম্ প্রণেতা, অনেকে দন্তিল ও বলেন, দত্তিলকে, যিনি নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার নামে খ্যাত। ইঁহারাও শ্রুতি ও স্বরের বিলোমগতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই সময়ের পর আমরা পাই বৃহদ্দেশী প্রণেতা আচার্য্য মতঙ্গকে এবং সংগীতমকরন্দ প্রণেতা নারদকে যাঁহারা শ্রুতি ও স্বরের বিলোমগতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা মনে করিতে পারি এই সময় পর্য্যন্ত হয়তো বিলোমগতিতেই স্বর প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী যুগ হইতে অর্থাৎ শার্ঙ্গদেবের যুগ হইতে আমরা স্বরের অনুলোমগতি পাইয়াছি। এখন ইঁহাদের রচিত পুস্তকে কে কিরূপে স্বর স্থাপন করিয়াছেন তাহা বলা যাইতেছে।

সংগীতরত্নাকর প্রণেতা শার্ঙ্গদেব, সংগীতসময়সার প্রণেতা পার্শ্বদেব, সংগীতপারিজাত প্রণেতা অহোবল, রাগতরঙ্গিণী প্রণেতা লোচন, সোমনাথ কৃত রাগবিবোধ, হৃদয়কৌতুক এবং হৃদয়প্রকাশ প্রণেতা হৃদয়নারায়ণ দেব, রাগতত্ত্ববিবোধ প্রণেতা শ্রীনিবাস, স্বরমেলকলানিধি প্রণেতা রামামাত্য, চতুর্দ্দণ্ডীপ্রকাশিকা প্রণেতা বেঙ্কটমূখী, রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ এবং সিংহভূপাল এবং হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি ক্রমিক পুস্তক মালিকা প্রণেতা বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে প্রভৃতি সকলেই শ্রুতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

এক্ষণে মতামতগুলির আলোচনা করা যাইতেছে।

সংগীতরত্নাকর 'স' স্বরের আলোচনায় বলিয়াছেন ইহার ৪টি শ্রুতি এবং স্বর নির্ম্মাণকালে যে যে স্বর পাওয়া যাইবে তাহারও নামকরণ করিয়া গিয়াছেন ১ম শ্রুতি হইতে প্রাপ্ত স্বর কৈশিক নিষাদ, ২য় শ্রুতি হইতে প্রাপ্তস্বর কাকলীনিষাদ, ৩য় শ্রুতি হইতে প্রাপ্ত স্বর চ্যুত ষড়জ, ৪র্থ শ্রুতি হইতে প্রাপ্ত অচ্যুত ষড়জ। এই

নামকরণ হইতে আমরা নিশ্চয়ই মনে করিতে পারি 'স' স্বরকে ৪র্থ শ্রুতিতে স্থাপনা করিয়া অপর তিনটি শ্রুতিকে নিম্নাভিমুখী গতি দেওয়া হইয়াছে।

সংগীত-দর্পণ 'স' স্বরের আলোচনাকালে বলিয়াছেন যে, ১ম শ্রুতি ষড়জ সাধারণ প্রসঙ্গে 'ণ', ২য় শ্রুতি কাকলীনিষাদ প্রসঙ্গে 'ণ', ৩য় শ্রুতিতে চ্যুত 'স', ৪র্থ শ্রুতিতে নিষাদ কাকলী প্রসঙ্গে বিকৃত, অচ্যুত 'স'। ইনিও 'স' স্বরকে ৪র্থ শ্রুতিতে স্থাপনা করিয়া শ্রুতি নিম্নাভিমুখী বলিয়াছেন।

সংগীতপারিজাত বলিয়াছেন 'স' স্বরের ১ম শ্রুতি তীব্র 'ন', ২য় শ্রুতি তীব্রতর 'ন', ৩য় শ্রুতি তীব্রতম 'ন' এবং ৪র্থ শ্রুতি শুদ্ধ 'স'। ইনিও ৪র্থ শ্রুতিতে 'স' স্বর স্থাপনা করিয়া শ্রুতির গতি নিম্নাভিমুখী বলিয়াছেন।

রাগবিবোধ বলিয়াছেন 'স' স্বরের ১ম শ্রুতি কৈশিক 'ন' অথবা তীব্রতম 'ধ', ২য় শ্রুতি কাকলী নিষাদ, ৩য় শ্রুতি মৃদু 'স' এবং ৪র্থ শ্রুতি শুদ্ধ 'সঁ'। ইনিও ৪র্থ শ্রুতিতে 'স' স্বরকে স্থাপনা করিয়া শ্রুতির গতি নিম্নাভিমুখী বলিয়াছেন।

স্বরমেল কলানিধি হইতে আমরা 'স' স্বর সম্বন্ধে ১ম শ্রুতিতে ষট্‌শ্রুতি 'ন' বা কৈশিক 'ন', ২য় শ্রুতিতে কাকলী 'ন', ৩য় শ্রুতিতে চ্যুত ষড়জ, ৪র্থ শ্রুতিতে অচ্যুত ষড়জ পাইতেছি। ইনিও ৪র্থ শ্রুতিতে স্বর স্থাপনার পক্ষপাতী এবং শ্রুতির নিম্নাভিমুখী গতিরও পক্ষপাতী।

লক্ষ্যসংগীত বলিয়াছেন 'স' স্বরের ১ম শ্রুতি 'ণ', ২য় শ্রুতি 'ন', ৩য় শ্রুতি তীব্র 'ন', ৪র্থ শ্রুতি শুদ্ধ 'স'। ইনিও ৪র্থ শ্রুতিতে স্বর স্থাপনা করিয়া অপর তিন শ্রুতিকে নিম্নাভিমুখী বলিয়াছেন।

চতুর্দ্দণ্ডীপ্রকাশিকা বলিয়াছেন 'স' স্বরের ১ম শ্রুতিতে কৈশিক 'ন', ২য় শ্রুতিতে কাকলী 'ন', ৩য় শ্রুতিতে পূর্ব্ব 'স' এবং ৪র্থ শ্রুতিতে

শুদ্ধ 'স'। ইনিও ৪র্থ শ্রুতিতে স্বর স্থাপনা করিয়া অপর তিন শ্রুতি নিম্নাভিমুখী বলিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্য সংগীত মতে 'স' স্বরের ১ম শ্রুতি ষট্শ্রুতি 'ধ', ২য় শ্রুতি কাকলী 'ন', ৩য় শ্রুতি পূর্ব্ব 'স', ৪র্থ শ্রুতি শুদ্ধ 'স'। ইনিও ৪র্থ শ্রুতিতে স্বর স্থাপনা করিয়া অপর তিন শ্রুতি নিম্নাভিমুখী বলিয়াছেন। এই সমস্ত পুস্তক প্রণেতাগণ সকলেই সংগীত রত্নাকরকে অনুসরণ করিয়াছেন।

শ্রীভাতখণ্ডে, তিনিও এই প্রাচীন মতকে অনুকরণ করিয়াছেন। বাহুল্য বোধে অন্যান্য প্রাচীন পুস্তকের মতামত পৃথক ভাবে লিখিত হইল না। মনে হয়, কেহই নিজ বুদ্ধি বা জ্ঞান দ্বারা শ্রুতি সম্বন্ধে চিন্তা করেন নাই, একে অপরকে অনুসরণ করিয়াছেন। এই সমস্ত আলোচনা দ্বারা জানা যাইবে যে শ্রুতি নাম ও জাতিগুলির গুণানুসারে প্রকৃত রূপ রস এবং অর্থ প্রকাশ করা কঠিন। হেতু-স্বরূপ বলা যায় যদি 'স' স্বরকে আমরা তীব্রা নামক শ্রুতিতে স্থাপনা করি তবে অপর তিনটি শ্রুতি অর্থাৎ ছন্দোবতী মন্দা, কুমুদ্বতী নিম্ন সপ্তকের স্বর রচনা করে। তাহাই যদি ধরা যায় তবে 'ন' স্বরের পৃথক ভাবে শ্রুতির নামকরণের কি প্রয়োজন ছিল। আবার যদি ছন্দোবতী শ্রুতিতে, (অর্থাৎ কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মতে ৪র্থ শ্রুতি) স্বর স্থাপনা করি তাহাতেও মন্দা, কুমুদ্বতী ও তীব্রা এই এই তিনটি শ্রুতি নিম্ন সপ্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশ্য পণ্ডিতগণ আর্ষ প্রয়োগ করিয়া অচল স্বরকে সচল করিয়াছেন যেমন মীমাংসার কারণ 'স' স্বর যেহেতু অচল সেইহেতু ইহার শ্রুতি কোনও সময়ে পূর্ববর্ত্তী এবং কোনও সময়ে পরবর্ত্তী স্বরের রূপ গ্রহণ করিতে পারে। এই বিচার বা মত আমরা নিয়মানুগ এবং সুসংযত বলিতে পারি না। না বলিবার যথেষ্ট যুক্তি পরবর্ত্তী আলোচনাগুলি হইতে পাওয়া যাইবে। নাট্যাচার্য্য ভরতের

নাট্যশাস্ত্রের পর জনসাধারণ সংগীতরত্নাকর এবং সংগীতপারিজাতকে প্রামাণ্য পুস্তকরূপে গ্রহণ করিয়াছে। গ্রাম বিভাগ করিয়া অর্থাৎ, মধ্যম, গান্ধার এবং ষড়জ গ্রাম ধার্য্য করিয়া তাঁহারা কোন্ কোন্ স্বরে কোন্ প্রথায় কিরূপ সংখ্যক শ্রুতি স্থাপনা করিয়াছেন তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি।

সংগীতরত্নাকর মধ্যম গ্রামের স্বরের ২২টি শ্রুতি, স৪, র৩, গ২, ম৪, প৩, ধ৪ ন২ এই প্রকার ধার্য্য করিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমানে এই শ্রুতি স্থাপনার দুই প্রকার বিচার করিব। এক প্রকার বিলোম-গতিতে, অপর প্রকার অনুলোমগতিতে।

উদাহরণ শ্রুতি (৪) ঃ—

স্বরনাম	ঃ	স	র	গ	ম	প	ধ	ন
শ্রুতিসংখ্যা	ঃ	০০০০,	০০০,	০০,	০০০০,	০০০,	০০০০,	০০
প্রাপ্তস্বরস্থান	ঃ	১টি,	১টি	নাই,	১টি,	১টি,	১টি,	নাই

উদাহরণ শ্রুতি (৪) স্বর সমাবেশটিতে শ্রুতির বিলোমগতিতে স্বরের অনুলোমগতি প্রদর্শিত। ইহাতে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। আমরা 'স' স্বর হইতে প্রাপ্ত স্বর-স্থানে 'স' অপেক্ষা মৃদু ১টি স্বর পাইব যাহাকে আমরা বর্ত্তমানে 'ন' স্বর বলিতেছি। স ও র স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পাইব 'ঋ' স্বর, 'গ' স্বর পরিবর্ত্তিত 'জ্ঞ' স্বরের রূপে। গ স্বর ও ম স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আমরা 'গ' স্বর পাইব। ম ও প স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আমরা 'হ্ম' পাইব। প ও ধ স্বর স্থানের মধ্যে 'দ' স্বর পাইব। 'ন' স্বর পরিবর্ত্তিত 'ণ' স্বরের রূপে। ইহার অন্তর বিচারে আমরা ১ম, ৪র্থ এবং ৬ষ্ঠ পাই বৃহৎ, ২য়, ও ৫ম পাই মধ্য এবং ৩য় ও ৭ম পাই ক্ষুদ্র অন্তর রূপে। এই শ্রুতি স্থাপনার রীতিতে আমরা ২টি ত্রুটি

পাইতেছি। ১মটি—একই সপ্তকের বিচার কালে আমরা নিম্ন সপ্তকের ১টি স্বর নির্ম্মাণ করিতেছি, ২য়টি হইতেছে ২টি শুদ্ধ বা প্রকৃত স্বর নিজ শ্রুতিতে অবস্থান করিয়া বিকৃত স্বরের রূপ গ্রহণ করিতেছে। নারদীয় শিক্ষা এবং নাট্যশাস্ত্রের শ্রুতির অন্তর ভেদের সহিত রত্নাকরের শ্রুতির অন্তর ভেদের পার্থক্য ঘটিতেছে। রত্নাকর মধ্যমগ্রামের শ্রুতিপরিচয়ে 'ম' স্বরকে প্রথম স্বর হিসাবে গ্রহণ করেন নাই কেন তাহার কারণ অজ্ঞাত।

এখন অনুলোম গতির শ্রুতির আলোচনা করা যাইতেছে। অনুলোমগতিতে শ্রুতি স্থাপনা করিলে স্বরের ও শ্রুতির সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে।

উদাহরণ শ্রুতি (৫) ঃ—

স্বরনাম ঃ	স	র	গ	ম	প	ধ	ন
শ্রুতিসংখ্যা ঃ	০০০০,	০০০,	০০,	০০০০,	০০০,	০০০০,	০০
প্রাপ্ত স্বরস্থান ঃ	১টি,	১টি,	নাই,	১টি,	১টি,	১টি,	নাই

উদাহরণ শ্রুতি (৫) স্বর সমাবেশে স ও র স্বরের মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ অন্তরে 'ঋ' স্বর পাই। র ও গ স্বরের মধ্যবর্ত্তী মধ্য অন্তরে 'জ্ঞ' স্বর পাই। গ ও ম স্বরের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র অন্তরে কোনও স্বর পাই না। ম ও প স্বরের মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ অন্তরে 'হ্ম' স্বর পাই। প ও ধ স্বরের মধ্যবর্ত্তী মধ্য অন্তরে 'দ' স্বর পাই। ধ ও ন স্বরের মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ অন্তরে 'ণ' স্বর পাই। ন ও স স্বরের মধ্যবর্ত্তী অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় আমরা কোনও স্বর পাই না। এইরূপ অনুলোম প্রথায় শ্রুতি স্থাপনা করিয়া আমরা বর্ত্তমানে প্রাপ্ত সব কয়টি স্বরই পাইলাম কিন্তু নাট্যশাস্ত্র বা নারদীয় শিক্ষার মতের শ্রুতির অন্তর বিচার পাইলাম না। এই স্বর সমাবেশের ১ম,

৪র্থ ও ৬ষ্ঠ বৃহৎ, ২য় ও ৫মে মধ্য এবং ৩য় ও ৭ম পাই ক্ষুদ্র অন্তররূপে।

পারিজাতের মধ্যম গ্রামের স্বরের স৪, র৩, গ২, ম৪, প৩, ধ৩, ন৩, শ্রুতি এই প্রকার। এই স্বর সমাবেশেরও আমরা অনুলোম এবং বিলোম প্রথায় বিচার করিব।

উদাহরণ শ্রুতি (৬) ঃ—

স্বরনাম	ঃ	স	র	গ	ম	প	ধ	ন
শ্রুতিসংখ্যা	ঃ	০০০০,	০০০,	০০,	০০০০,	০০০,	০০০,	০০০
প্রাপ্ত স্বরস্থান	ঃ	১টি,	১টি,	নাই,	১টি,	১টি,	১টি,	১টি

উদাহরণ শ্রুতি (৬), এই স্বর সমাবেশের অনুলোমগতির স্বরে বিলোমগতির শ্রুতি স্থাপনা করা হইয়াছে। আমরা 'স' স্বরের শ্রুতি হইতে নিম্ন সপ্তকের 'ন' স্বর পাই। স ও র স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে 'র' স্বরের শ্রুতি হইতে 'ঋ'। 'গ' স্বর পরিবর্ত্তিত 'জ্ঞ' স্বরের রূপে। গ ও ম স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে 'ম' স্বরের শ্রুতি হইতে 'গ' স্বর পাই। ম ও প স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে 'প' স্বরের শ্রুতি হইতে 'হ্ম' স্বর পাই। প ও ধ স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে 'ধ' স্বরের শ্রুতি হইতে 'দ' স্বর পাই। ধ ও ন স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে 'ন' স্বরের শ্রুতি হইতে 'ণ' স্বর পাই। এই স্বর সমাবেশের বিচারে আমরা ১৩টি স্বর পাইতেছি। ১টি 'ন' স্বর বা 'স' অপেক্ষা কোনও মৃদু স্বর এবং 'ন' স্বর, যাহা বর্ত্তমানে নিম্ন সপ্তকের শেষ স্বর। অন্যান্য স্বরগুলি হইতে ১টি করিয়া বিকৃত স্বর পাইয়াছি। ১ম ও ৪র্থ বৃহৎ, ২য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম মধ্য এবং ৩য় পাই ক্ষুদ্র অন্তর। ক্ষুদ্র অন্তর ১টি পাওয়ায় ৭টি প্রকৃত স্বরের শ্রুতি হইতে ১৩টি স্বর পাওয়া যাইতেছে।

এখন অনুলোমগতির স্বরে অনুলোমগতির শ্রুতি স্থাপনা করিয়া বিচার করা যাইতেছে। ইহাতে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে।

উদাহরণ শ্রুতি (৭) ঃ—

স্বরনাম	ঃ	স	র	গ	ম	প	ধ	ন
শ্রুতিসংখ্যা	ঃ	००००,	०००,	००,	००००,	०००,	०००,	०००,
প্রাপ্ত স্বর	ঃ	১টি,	১টি,	নাই,	১টি,	১টি,	১টি,	১টি

উদাহরণ শ্রুতি (৭) স্বর সমাবেশের শ্রুতির গতি অনুলোমগতিতে ধার্য্য। স ও র স্বরের মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ অন্তরে 'ঋ' স্বর পাই। 'র ও গ' স্বরের মধ্যবর্ত্তী মধ্য অন্তরে 'জ্ঞ' স্বর পাই। গ ও ম স্বরের মধ্যবর্ত্তী অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় কোনও স্বর পাই না। ম ও প স্বরের মধ্যবর্ত্তী অন্তর বৃহৎ হওয়ার 'হ্ম' স্বর পাই। প ও ধ স্বরের মধ্যবর্ত্তী অন্তর মধ্য হওয়ায় 'দ' স্বর পাই, ধ ও ন স্বরের মধ্যবর্ত্তী অন্তরে 'ণ' স্বর পাই এবং ন ও স স্বরের মধ্যবর্ত্তী মধ্য অন্তরে 'ন' স্বর অপেক্ষা তীব্র এবং 'স' স্বর অপেক্ষা মৃদু একটি স্বর পাইব যাহা আমাদের প্রচলিত বর্ত্তমান সপ্তকের স্বর নহে। এই সপ্তক হইতেও আমরা ১৩টি স্বর পাইলাম। এইরূপ পাওয়ার একমাত্র কারণ স্বর প্রতি শ্রুতির সংখ্যা ধার্য্য করিবার সময় শ্রুতির যেরূপ অন্তর থাকা উচিত তাহা নাই। অন্তর হিসাবে আমরা ১ম ও ৪র্থ বৃহৎ, ২য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম মধ্য, ৩য় পাই ক্ষুদ্র অন্তর। ১টি মাত্র ক্ষুদ্র অন্তর পাওয়ার কারণেই ১৩টি স্বর পাইতেছি ১টি সপ্তকে। পারিজাতও মধ্যম গ্রামের 'ম' স্বরকে মেরু ধার্য্য করেন নাই।

রত্নাকর কথিত গান্ধার গ্রামে আমরা স৩, র২, গ৪, ম৩, প৩, ধ৩, ন৪ এই প্রকার শ্রুতি সমাবেশ পাই। এই প্রকার স্বর সমাবেশেও

আমরা বিলোম এবং অনুলোম প্রথায় শ্রুতি স্থাপনা করিয়া বিচার করিতেছি।

উদাহরণ শ্রুতি (৮) :—

স্বরনাম	:	স	র	গ	ম	প	ধ	ন
শ্রুতিসংখ্যা	:	০০০,	০০,	০০০০,	০০০,	০০০,	০০০,	০০০০
প্রাপ্ত স্বরস্থান	:	১টি,	নাই,	১টি,	১টি,	১টি,	১টি,	১টি

উদাহরণ শ্রুতি (৮) স্বর সমাবেশ বিলোমগতির। ইহা হইতে স্বরের অন্তরে স্বর স্থাপনায় 'স' স্বরের শ্রুতিতে পাই নিম্ন সপ্তকের 'ন'। 'র' স্বর পরিবর্ত্তিত 'ঋ' স্বরে। 'গ' স্বরের শ্রুতি হইতে পাই 'র' স্বর। 'গ' নিজ শ্রুতিতে পরিবর্ত্তিত 'জ্ঞ' স্বরের রূপে। 'ম' স্বরের শ্রুতি হইতে পাই 'গ' স্বর। 'প' স্বরের শ্রুতিতে 'হ্ম'। 'ধ' স্বরের শ্রুতিতে 'দ' এবং ন স্বরের শ্রুতিতে পাই 'ণ'। এই বিলোম গতির শ্রুতি স্থাপনার বিচার হইতেও আমরা ১টি সপ্তকে ১৩টি স্বর পাইতেছি। 'র' স্বর এবং 'গ' স্বর নিজ নিজ শ্রুতিতেই বিকৃত রূপ গ্রহণ করিতেছে। অন্তর বিচারেও আমরা ৩য় ও ৭ম বৃহৎ, ১ম, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ মধ্য এবং ২য় পাই ক্ষুদ্র অন্তর। এই স্বর সমাবেশের অন্তর ১টি মাত্র ক্ষুদ্র হওয়ায় আমরা ১ সপ্তকে ১৩টি স্বর পাইলাম।

অনুলোমগতির স্বরে অনুলোমগতির শ্রুতি স্থাপনা করিয়া বিচার করা হইতেছে।

উদাহরণ শ্রুতি (৯) :—

স্বরনাম	:	স	র	গ	ম	প	ধ	ন
শ্রুতির সংখ্যা	:	০০০,	০০,	০০০০,	০০০,	০০০,	০০০,	০০০০
প্রাপ্ত স্বরস্থান	:	১টি,	নাই,	১টি,	১টি,	১টি,	১টি,	১টি,

উদাহরণ শ্রুতি (৯) স্বর সমাবেশের অন্তরে স্বর স্থাপনায় আমরা স ও র স্বরের মধ্যবর্ত্তী মধ্য অন্তরে 'ঋ' স্বর পাই। র ও গ স্বরের মধ্যবর্ত্তী অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় কোন স্বর পাই না। 'গ' স্বরকে পরিবর্ত্তিত পাই 'জ্ঞ' স্বরের রূপে এবং ঐ 'গ' স্বরের শ্রুতি হইতে 'গ' স্বরকে পাই। ম ও প স্বরের মধ্যবর্ত্তী অন্তরে 'ক্ষ্ম', প ও ধ স্বরের মধ্যবর্ত্তী অন্তরে 'দ' স্বর এবং ধ ও ন স্বরের অন্তরে 'ণ' স্বর পাই। ন ও স স্বরের বৃহৎ অন্তরে 'স' অপেক্ষা মৃদু এবং বর্ত্তমানের 'ন' অপেক্ষা তীব্র ১টি স্বর পাই যাহা আমরা বর্ত্তমানে আমাদের প্রচলিত সপ্তকে পাই না। অন্তর বিচার করিবার সময়ও পাই ৩য় ও ৭ম বৃহৎ, ১ম, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ পাই মধ্য এবং ২য় পাই ক্ষুদ্র। ১টি ক্ষুদ্র অন্তর পাওয়ায় ১২টির স্থলে ১৩টি স্বরে সপ্তক রচনা করিতে হইতেছে। রত্নাকর গান্ধার গ্রামেরও প্রারম্ভিক স্বর 'গ' স্বরকে গ্রহণ করেন নাই।

পারিজাত বর্ণিত গান্ধার গ্রামের স্বরের শ্রুতি স৩, র৩, গ৩, ম৩, প৩, ধ৩, ন৪। এই স্বর সমাবেশের বিলোম এবং অনুলোম প্রথায় শ্রুতি স্থাপনা করিয়া বিচার করা যাইতেছে।

উদাহরণ শ্রুতি (১০) :—

স্বরনাম :	স	র	গ	ম	প	ধ	ন
শ্রুতি :	০০০,	০০০,	০০০,	০০০,	০০০,	০০০,	০০০০
স্বরস্থান:	১টি,	১টি,	১টি,	১টি,	১টি,	১টি,	১টি

উদাহরণ শ্রুতি (১০) বর্ণিত স্বর সমাবেশ হইতে আমরা 'স' স্বরের শ্রুতি হইতে নিম্ন সপ্তকের 'ন' স্বর, 'র' স্বরের শ্রুতি হইতে 'ঋ' স্বর, 'গ' স্বর হইতে 'জ্ঞ' স্বর, 'ম' স্বরের শ্রুতি হইতে সৃষ্ট স্বর 'গ' হওয়া উচিত কিন্তু ১টি প্রকৃত গ স্বর রহিয়াছে, সেজন্য

ঐ প্রাপ্ত স্বরকে কোনও নামে অভিহিত করা যাইবে না। 'প' স্বর হইতে 'হ্ম', 'ধ' স্বরের শ্রুতি হইতে 'দ' স্বর, 'ন' স্বর হইতে 'ণ' স্বর পাইতেছি। এইরূপ শ্রুতিসংখ্যা ধার্য্য করায় আমরা ১টি সপ্তকে ১২টির স্থলে ১৪টি স্বর পাইতেছি। অন্তর বিচারে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পাই মধ্য এবং ৭ম পাই বৃহৎ অন্তর। কোনও ক্ষুদ্র অন্তর না থাকায় সপ্তকে ১২টির স্থলে আমরা ১৪টি স্বর পাইতেছি।

অনুলোমগতির স্বরে অনুলোমগতির শ্রুতি স্থাপনা করা হইতেছে।

উদাহরণ শ্রুতি (১১) :—

স্বরনাম :	স	র	গ	ম	প	ধ	ন
শ্রুতি :	০০০,	০০০,	০০০,	০০০,	০০০,	০০০,	০০০০
স্বরস্থান :	১টি,	১টি,	১টি,	১টি,	১টি,	১টি,	১টি

উদাহরণ শ্রুতি (১১) বর্ণিত স্বর সমাবেশের স্বর স্থাপনায় স ও র স্বরের মধ্যবর্ত্তী মধ্য অন্তরে 'ঋ' স্বর পাই। র ও গ স্বরের মধ্যবর্ত্তী মধ্য অন্তরে 'জ্ঞ' স্বর পাই। গ ও ম স্বরের মধ্যবর্ত্তী মধ্য অন্তরেও একটি স্বরস্থান পাই কিন্তু তাহার কোনও পরিচয় বর্ত্তমানে পাইনা। ম ও প স্বরের মধ্যবর্ত্তী মধ্য অন্তরে 'হ্ম' স্বর পাই। প ও ধ স্বরের মধ্যবর্ত্তী মধ্য অন্তরে 'দ' স্বর পাই। ধ ও ন স্বরের মধ্যবর্ত্তী মধ্য অন্তরে 'ণ' স্বর পাই। ন ও স স্বরের মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ অন্তরে 'স' অপেক্ষা মৃদু এবং 'ন' অপেক্ষা তীব্র একটি স্বরস্থান পাই কিন্তু স্বর স্থাপনা করিতে পারি না। এই স্বর সমাবেশ হইতেও একটি সপ্তকে ১২টির স্থলে ১৪টি স্বর পাইতেছি। ৭ম অন্তরটি বৃহৎ, অন্যান্য সব অন্তরগুলিই মধ্য অন্তর, ক্ষুদ্র অন্তর নাই। পারিজাতও গান্ধার গ্রামের প্রারম্ভিক স্বর 'স'কে ধার্য্য করিয়াছেন।

রত্নাকর এবং পারিজাত বর্ণিত ষড়জ গ্রামের শ্রুতির ও স্বরের বর্ণনা করিতেছি। উভয়েই স৪, র৩, গ২, ম৪, প৪, ধ৩, ন২, এই প্রকার শ্রুতির সংখ্যা স্বর প্রতি ধার্য্য করিয়াছেন। এই শ্রুতির সমাবেশের অনুলোম এবং বিলোম উভয় প্রকার গতির দ্বারা বিচার করা হইতেছে।

উদাহরণ শ্রুতি (১২) :—

স্বরনাম :	স	র	গ	ম	প	ধ	ন
শ্রুতি :	০০০০,	০০০,	০০,	০০০০,	০০০০,	০০০,	০০
স্বরস্থান :	১টি,	১টি,	নাই,	১টি,	১টি,	১টি,	নাই

উদাহরণ শ্রুতি (১২) বর্ণিত স্বর সমাবেশে আমরা 'স' স্বরের অন্তরে নিম্ন সপ্তকের 'ন' স্বর পাই। 'র' স্বরের অন্তরে 'ঋ' স্বর পাই। 'গ' স্বর পরিবর্ত্তিত 'জ্ঞ' স্বরে। 'ম' স্বরের অন্তরে পাই 'গ' স্বর। 'প' স্বরের অন্তরে 'হ্ম' স্বর। 'ধ' স্বরের অন্তরে 'দ' স্বর। ন স্বর পরিবর্ত্তিত 'ণ' স্বরের রূপে। এইরূপ প্রকৃতির স্বরে অর্থাৎ অনুলোমগতির স্বরে বিলোমগতিতে শ্রুতি স্থাপনা করার ফলে আমরা দুইটি ত্রুটি পাইতেছি। একটি ত্রুটি সম্বন্ধে বলা যায় যে প্রকৃত গ ও ন স্বর দুইটি অবস্থিত শ্রুতিতেই বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। অপরটি উদারা বা নিম্ন সপ্তকের 'ন' স্বরকে, সপ্তকের স্বর হিসাবে গণনা করিলেই 'ন' স্বরটি ১ম স্বর হইবে এবং সপ্তক শেষ করিতে হইবে 'ণ' স্বরে, যাহা আমরা বর্ত্তমানে করি না। 'ন' স্বর (উদারার) মেরুর স্থান অধিকার করিতেছে। মুদারা সপ্তকের প্রকৃত স্বরের শ্রুতি ধার্য্য করিয়া আমরা মুদারা সপ্তকের বিকৃত স্বরস্থান নির্ম্মাণ করিতে যাইয়া উদারা সপ্তকের স্বরনির্ম্মাণকে অনুমোদনযোগ্য মনে করি না। অন্তর বিচারে ১ম, ৪র্থ ও ৫ম

স্থান পাই বৃহৎ, ২য় ও ৬ষ্ঠ পাই মধ্য এবং ৩য় ও ৭ম পাই ক্ষুদ্র অন্তর রূপে।

এখন ষড়জ গ্রামের স্বরের অনুলোমগতিতে শ্রুতি স্থাপনা করা যাইতেছে।

উদাহরণ শ্রুতি (১৩) :—

স্বরনাম :	স	র	গ	ম	প	ধ	ন
সংখ্যা :	০০০০,	০০০,	০০,	০০০০,	০০০০,	০০০,	০০
স্বরস্থান:	১টি,	১টি,	নাই,	১টি,	১টি,	১টি,	নাই

উদাহরণ শ্রুতি (১৩) বর্ণিত স্বর সমাবেশ হইতে স ও র স্বরের বৃহৎ অন্তরে 'ঋ' স্বর পাই। র ও গ স্বরের মধ্যবর্ত্তী মধ্য অন্তরে জ্ঞ' স্বর পাই। গ ও ম স্বরের মধ্যবর্ত্তী অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় কোনও স্বরস্থান পাওয়া যায় নাই। ম ও প স্বরের মধ্যবর্ত্তী অন্তর বৃহৎ হওয়ায় 'হ্ম' স্বর পাই। প ও ধ স্বরের মধ্যবর্ত্তী অন্তর বৃহৎ হওয়ায় 'দ' স্বর পাই। ধ ও ন স্বরের মধ্যবর্ত্তী মধ্য অন্তরে 'ণ' স্বর পাই। ন ও স স্বরের অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় স্বরস্থান পাওয়া যায় নাই। অন্তর বিচারে আমরা ১ম, ৪র্থ ও ৫ম পাই বৃহৎ অন্তর ২য় ও ৬ষ্ঠ পাই মধ্য অন্তর এবং ৩য় ও ৭ম পাই ক্ষুদ্র অন্তর। সমস্ত শ্রুতির উদাহরণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

নারদীয়শিক্ষার স্বর ও শ্রুতি সম্বন্ধে বলা যায় যে, যদিও সেই যুগে বিকৃত স্বর সৃষ্ট হয় নাই তথাপি তাঁহার শ্রুতি স্থাপনার কৌশল অভ্রান্ত। তাঁহার সৃষ্ট সংখ্যা, যাহা তিনি স্বর প্রতি ধার্য্য করিয়াছেন, প্রতিটি স্বরের অনুপাতে ব্যবহার করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক যুক্তির দিক দিয়া তাহা নির্ভুল। বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে আমরা শ্রুতির অন্তর বিচারকালে যে প্রকার অন্তর পাইয়াছি ঠিক সেই প্রকার

অন্তর ভেদ তাঁহার শ্রুতির সংখ্যা এবং স্থাপনার রীতি হইতে পাওয়া যায়। তৎকালে স্বরের গতি বিলোম থাকায় এবং শ্রুতির সংখ্যাও বিলোমগতিতে স্থাপন করায় তিনি যে একজন বিশেষ দূরদর্শী বিচক্ষণ মনীষী তাহা আমরা সবিশেষ জানিতে পারি। তাঁহার শ্রুতির অন্তর ভেদও পরিপূর্ণ জ্ঞানের পরিচায়ক।

ইঁহার পর পাই নাট্যাচার্য্য ভরতকে। তিনি বর্ত্তমানের স্বরগুলি পরস্পর বিলোমগতিতে স্থাপনা করিয়া 'ম' স্বরকে মেরু করিয়া সপ্তক রচনা করিয়া শিক্ষাকার নারদের মতের সামঞ্জস্য রাখিয়া শ্রুতির সংখ্যার ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি স্বর হিসাবে শ্রুতি ধার্য্য করেন নাই, করিয়াছেন স্থান হিসাবে। ১ম স্থানে যে স্বর তাহার ৪ শ্রুতি, ২য় স্থানে যে স্বর তাহার ৩ শ্রুতি, ৩য় স্থানের যে স্বর তাহার ২ শ্রুতি, ৪র্থ স্থানের যে স্বর তাহার ৪ শ্রুতি, ৫ম স্থানের যে স্বর তাহার ৪ শ্রুতি, ৬ষ্ঠ স্থানের যে স্বর তাহার ৩ শ্রুতি এবং ৭ম স্থানের স্বরের ২ শ্রুতি ধার্য্য করিয়াছেন। নারদীয়শিক্ষায়ও স্থান হিসাবে এই শ্রুতি ধার্য্য করা হইয়াছে। অন্তর বিচারও নারদীয়-শিক্ষার মতেই পাওয়া গিয়াছে।

রত্নাকর কথিত মধ্যম কিংবা গান্ধার বা ষড়জ যে কোনও গ্রামই হউক না কেন, যদি স্বরের অনুলোমগতি প্রদর্শিত হয় তবে শ্রুতির সংখ্যাও অনুলোমগতিতে স্থাপিত হওয়া দরকার এবং বিলোমগতির স্বরে বিলোমগতিতে শ্রুতি স্থাপিত করিতে হইবে। এই প্রকার রীতিতে শ্রুতি ধার্য্য না করিলে নিম্নলিখিত দোষগুলি পাওয়া যাইবে ঃ

(১) প্রকৃত স্বর নিজ শ্রুতিতেই বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হইবে।

(২) প্রকৃত ও বিকৃত স্বরযোগে ১২টি স্বর দ্বারা মেরু গঠন করা যাইবে না।

(৩) অন্তর বিচার নির্ভুল হইবে না, যেহেতু স্বর হিসাবে শ্রুতির সংখ্যা ঠিক ধার্য্য করা হয় নাই।

(৪) ভিন্ন সপ্তকের স্বরকে গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত শ্রুতির সংখ্যা পরিপূর্ণ হইতেছে না। ইহা বিকৃত স্বর স্থাপনা করিলেই জানা যাইবে।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে জানা যাইবে যে স্বরের অনুলোম-গতিতে বিলোম প্রকৃতির শ্রুতি স্থাপনা কিংবা বিলোমগতির স্বরে অনুলোমগতির শ্রুতি স্থাপনা কিছুতেই নির্ভুল নহে। তিনি রত্নাকরই হউন বা পারিজাতই হউন কিংবা অন্য যে কেহই হউন না কেন স্বরের গতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শ্রুতি স্থাপনা করিতেই হইবে।

রত্নাকর বর্ণিত গান্ধার এবং মধ্যম গ্রাম হইতে আমরা কি কি বিশেষত্ব পাই? তিনি মধ্যম গ্রামের মধ্যমকে, গান্ধার গ্রামের গান্ধারকে এবং ষড়জ গ্রামের ষড়জকে প্রাধান্য দিয়াছেন। স্বরের অনুপাতে মধ্যম গ্রামে তিনি 'ধ' ও 'স' স্বরকে প্রাধান্য দিয়াছেন। গান্ধার গ্রামে গান্ধারের সঙ্গতি রক্ষার জন্য 'ন' স্বরকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

পারিজাতকার গান্ধার গ্রামের 'গ' স্বরকে প্রাধান্য না দিয়া 'ন' স্বরকে প্রাধান্য দিয়াছেন। মধ্যম গ্রামের শ্রুতি স্থাপনায় বেশ বোঝা যায় যে তিনি রত্নাকরকেই অনুকরণ করিয়াছেন বুদ্ধিমানের মত। তাঁহার 'ম' এবং 'স' স্বর দুইটি প্রাধান্য পাইয়াছে। রত্নাকরের মধ্যম গ্রামে 'ধ' স্বরের প্রাধান্য আছে কিন্তু পারিজাতকার শ্রুতির মোট সংখ্যাকে এক রাখার জন্য 'ধ' স্বরের ১টি শ্রুতি কম করিয়া 'ন' স্বরের ১টি শ্রুতি বাড়াইয়া দিয়াছেন।

ইঁহাদের শ্রুতি স্থাপনার আলোচনায় জানা যায় যে ইঁহারা নারদীয়শিক্ষার মতে ২২টি শ্রুতি গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ খুশি খেয়াল মত স্বরপ্রতি শ্রুতিসংখ্যা ধার্য্য করিবার সময়ে আগাগোড়াই একটি ভুল রাস্তা ধরিয়াছেন। রত্নাকর এবং পারিজাত উভয়েই

ষড়জ গ্রামেও সেই এক রীতির অনুসরণ করিয়াছেন অর্থাৎ অনুলোম গতির স্বরে বিলোমগতিতে শ্রুতিস্থাপনা। এখন বলা যায় যদি তাঁহাদের সময় বিকৃত স্বরের পরিচয় নাও থাকে কিংবা মধ্যম গ্রামের বা গান্ধার গ্রামের অন্য প্রকার স্বর সমাবেশ তাঁহারা পাইয়া থাকেন, তথাপিও তাঁহাদের শ্রুতি স্থাপনার রীতি দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে। নারদীয়শিক্ষা যে যুগে রচিত অর্থাৎ ২য় কিংবা ৩য় শতকে, ভরতের নাট্যশাস্ত্র যে যুগে রচিত অর্থাৎ ৩য় হইতে ৫ম শতাব্দীতে, হয়ত তখন তাঁহারা কেহই বিকৃত স্বর সম্বন্ধে চিন্তা করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও মৌলিক উপায়ে প্রতিটি স্থানের স্বরের শ্রুতি ধার্য্য করিয়া পরবর্ত্তী জনসাধারণের মনে স্থায়ী-ভাবেই জাগরূক রহিয়াছেন। এই কারণেই মনে করিতে পারি তাঁহারা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মনীষী ছিলেন। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী যুগের পুস্তক রচয়িতারা তাঁহাদের নির্দ্দেশিত পথকে অমান্য করিয়া শুধু ভারতীয় সংগীতের অপমান করেন নাই পরন্তু সমস্ত বিশ্বের মাঝে ভারতবাসীর ও ভারতীয় সংস্কৃতির লাঞ্ছনা ঘটাইয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে বিকৃত স্বরের স্থান নির্ণয়ে আমরা যে প্রকার অন্তরের বিভাগগুলি পাইয়াছি এবং স্বর স্থাপনার রীতি ধার্য্য করিয়াছি তাহা ভরত এবং শিক্ষাকার নারদ কৃত মতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। রত্নাকর এবং পারিজাত শ্রুতি সংস্থাপন কালে কোথায় ভুল করিয়াছেন? ভরতের শ্রুতির আলোচনায় আমরা বলিয়াছি যে নারদ এবং ভরত স্থান হিসাবে শ্রুতি ধার্য্য করিয়াছেন যাহা রত্নাকর, পারিজাত এবং অন্যান্য পুস্তক প্রণেতাগণ চিন্তা করিবার অবকাশও পান নাই কারণ তাঁহাদের শ্রুতিস্থাপনা হইতে বেশ বোঝা যায় বা গিয়াছে যে তাঁহারা মোট ২২টি শ্রুতিই সকলে ঠিক রাখিয়াছেন কিন্তু স্বরপ্রতি শ্রুতিসংখ্যা ঠিক রাখা প্রয়োজন মনে করেন নাই। এই কারণেই তাঁহারা প্রকৃত পথ হইতে বিচ্যুত

হইয়া পড়িয়াছেন। এখন স্থান হিসাবে কিরূপে শ্রুতি ধার্য্য করা যাইবে তাহার রীতি বলিতেছি।

আমরা বিলোমগতিতে বৈদিক যুগের এই বিচারকে **উদাহরণ শ্রুতি (১৪)** আখ্যা দিতেছি।

সংখ্যা	ঃ	৭	৬	৫	৪	৩	২	১
শ্রুতিসংখ্যা	ঃ	২	৩	৪	৪	২	৩	৪

এখন আবার বৈদিক যুগে নারদ কিংবা ভরতের শ্রুতি বিচার আলোচনা করা যাউক। স্বরকে কোনরূপ প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজন নাই। উপরে লিখিত সংখ্যাগুলি দেখিয়া কোন্ কোন্ সংখ্যার নীচে কোন্ কোন্ শ্রুতির অঙ্ক বসান হইয়াছে তাহা দেখিলেই বোঝা যাইবে। আমরা ১ম সংখ্যার পাইয়াছি ৪টি। ২য় সংখ্যার নীচে ৩টি, ৩য় সংখ্যার নীচে ২টি, ৪র্থ সংখ্যার নীচে ৪টি, ৫ম সংখ্যার নীচে ৪টি, ৬ষ্ঠ সংখ্যার নীচে ৩টি এবং ৭ম সংখ্যার নীচে ২টি। আমাদের শ্রুতি স্থাপনার উদ্দেশ্য হইতেছে যে কোথায় কোথায় আমরা বিকৃত স্বরস্থান পাইতে পারি তাহা জানা। মধ্যম গ্রাম, গান্ধার গ্রাম এবং ষড়জ গ্রামের শ্রুতি স্থাপনা কালে, তাহা অনুলোমগতিরই হউক বা বিলোমগতিরই হউক তাহা সুসংযত হওয়া চাই। বর্ত্তমানে আমরা স্বরসমূহকে অনুলোমগতিতে প্রয়োগ করি, সেই অনুপাতে আমরা সংখ্যা দ্বারাই তাহার বিচার করিতে চাই।

উদাহরণ শ্রুতি (১৫) ঃ—

সংখ্যা	ঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
শ্রুতিসংখ্যা	ঃ	৪	৩	২	৪	৪	৩	২

বর্ত্তমান যুগের অনুলোমগতিতে আমরা উপরোক্ত সংখ্যাগুলির নীচে যে যে শ্রুতি পাইয়াছি তাহার ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতে

হইলেও এইরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে। আমরা ১ম সংখ্যার নীচে ৪টি, ২য় সংখ্যার নীচে ৩টি, ৩য় সংখ্যার নীচে ২টি, ৪র্থ সংখ্যার নীচে ৪টি, ৫ম সংখ্যার নীচে ৪টি, ৬ষ্ঠ সংখ্যার নীচে ৩টি এবং ৭ম সংখ্যার নীচে ২টি করিয়া শ্রুতি পূর্ব্বের মতই পাইলাম। এক্ষণে আমরা স্থান হিসাবে পুনরায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মধ্যম, গান্ধার ও ষড়্জ গ্রামের স্বরসমূহের উদাহরণ ও সূত্র সহ আলোচনা করিতেছি। এই আলোচনা হইতেই জানা যাইবে যে রত্নাকর, পারিজাত প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতারা নির্ভুল নহেন।

এখন আমরা এই সংখ্যার অনুপাতে স্বর ও শ্রুতি স্থাপনা করিয়া মধ্যম, গান্ধার এবং ষড়্জ গ্রামের উভয় প্রকার গতির আলোচনা করিতেছি।

উদাহরণ শ্রুতি (১৬)। মধ্যম গ্রাম বিলোমগতিতে। 'ম' মেরু হইবে বিলোম এবং অনুলোমগতিতে। এই স্বর সমাবেশের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে ভরতের শ্রুতিস্থাপনার উদাহরণ শ্রুতি (২) এই নামে এবং লক্ষণে।

সংখ্যা :	৭	৬	৫	৪	৩	২	১
স্বরনাম :	প	ধ	ন	স	র	গ	ম
শ্রুতি :	০০,	০০০,	০০০০,	০০০০,	০০,	০০০,	০০০০
স্বরস্থান :	নাই,	১টি,	১টি,	১টি,	নাই,	১টি,	১টি

উদাহরণ শ্রুতি (১৬) লিখিত স্বর সমাবেশ আমরা 'ম' স্বরের বৃহৎ অন্তরে এমন একটি স্বর পাইব যাহা 'ম' অপেক্ষা মৃদু এবং ২ সংখ্যায় লিখিত 'গ' অপেক্ষা তীব্র। 'গ' স্বরের মধ্য অন্তর হইতে 'গ' অপেক্ষা মৃদু এবং 'র' অপেক্ষা তীব্র। 'র' স্বরের ক্ষুদ্র অন্তরে কোন স্বর পাইব না। 'স' স্বরের বৃহৎ অন্তরে যে স্বর

পাইব তাহা 'স' অপেক্ষা মৃদু এবং ৫ সংখ্যায় লিখিত 'ন' অপেক্ষা তীব্র। 'ন' স্বরের বৃহৎ অন্তরে এমন ১টি স্বর পাইব যাহা 'ন' স্বর অপেক্ষা মৃদু এবং ৬ সংখ্যায় লিখিত 'ধ' স্বর অপেক্ষা তীব্র। 'ধ' স্বরের মধ্য অন্তরে যে স্বরটি পাইব তাহা 'ধ' স্বর অপেক্ষা মৃদু এবং ৭ সংখ্যায় লিখিত 'প' স্বর অপেক্ষা তীব্র। ৭ম সংখ্যায় লিখিত 'প' স্বরের অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় কোনও স্বর-স্থান পাই না। আমরা মধ্যম গ্রামের স্বরের শ্রুতির সমাবেশ করিতে অন্য কোনও সপ্তকের স্বরের সাহায্য লইলাম না। বাদী সমবাদী ধার্য্য করিতে চাহিলে 'ম' স্বর বাদী ধার্য্য করিয়া আমরা ৪র্থ এবং ৫ম সংখ্যায় স্থিত স্বরকে সমবাদী বলিতে পারি, বর্ত্তমানের সম এবং সপ ভাবাপন্ন সঙ্গতিতে। ৪র্থ স্বর বর্ত্তমানের প্রচলিত সপ্তকে মধ্যম এবং ৫ম স্বর পঞ্চম। প্রতিটি গ্রামের স্বর সমাবেশের বিচারে ১ম-৪র্থ এবং ১ম-৫ম এই সম্বন্ধে বাদী সমবাদী নিরূপণ করা যাইবে।

উদাহরণ শ্রুতি (১৭)। মধ্যম গ্রাম অনুলোম গতিতে। এই স্বর সমাবেশের 'ম' মেরু স্বর।

সংখ্যা :	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
স্বরনাম :	ম	প	ধ	ন	স	র	গ
শ্রুতি :	০০০০,	০০০,	০০,	০০০০,	০০০০,	০০০,	০০
স্বরস্থান :	১টি,	১টি,	নাই,	১টি,	১টি,	১টি,	নাই

পূর্ব্বোক্ত রূপেই উদাহরণের শ্রুতি (১৭) স্বর সমাবেশের বিচার করিতেছি। 'ম' স্বরের বৃহৎ অন্তরে ১টি স্বর যাহা 'ম' অপেক্ষা তীব্র এবং 'প' অপেক্ষা মৃদু, 'প' স্বরের মধ্য অন্তরে 'প' অপেক্ষা তীব্র এবং 'ধ' অপেক্ষা মৃদু ১টি স্বর, 'ধ' স্বরের ক্ষুদ্র অন্তরে স্বরস্থান নাই, 'ন' স্বরের বৃহৎ অন্তরে 'ন' অপেক্ষা তীব্র এবং 'স' অপেক্ষা মৃদু ১টি

স্বর, 'স' স্বরের বৃহৎ অন্তরে 'স' অপেক্ষা তীব্র এবং 'র' অপেক্ষা মৃদু ১টি স্বর পাই। 'গ' স্বরের অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় স্বরস্থান পাইলাম না। বাদী সমবাদী ধার্য্য করিতে অনুরূপভাবে ১ম-৪র্থ ও ১ম-৫ম সম্বন্ধ ধার্য্য করিতে হইবে। স্বর স্থাপনা করিতে অন্য কোনও সপ্তকের স্বর নির্ম্মাণ করিতে হয় নাই। ১২টি স্বর দ্বারা উভয় প্রকার রীতির সপ্তকই গঠিত। এক্ষণে গান্ধার গ্রামের স্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। মধ্যম গ্রামের অনুলোমগতিতে যে স্বর সমাবেশ আমরা পাইয়াছি ঠিক একই রূপ স্বরসমূহ আমরা পাইব গান্ধার গ্রামের বিলোমগতির স্বর স্থাপনায়, কিন্তু শ্রুতি স্থাপনার পার্থক্য পাওয়া যাইবে।

উদাহরণ শ্রুতি (১৮) ঃ—

সংখ্যা ঃ	৭	৬	৫	৪	৩	২	১
স্বরনাম ঃ	ম	প	ধ	ন	স	র	গ
শ্রুতি ঃ	০০,	০০০,	০০০০,	০০০০,	০০,	০০০,	০০০০
স্বরস্থান ঃ	নাই,	১টি,	১টি,	১টি,	নাই,	১টি,	১টি

অনুরূপ ভাবেই আমরা উদাহরণ শ্রুতি (১৮) লিখিত স্বর সমাবেশের বিচার করিব। মধ্যম গ্রামের স্বরের অনুলোমগতিতে 'ম' মেরু এবং গান্ধার গ্রামের বিলোমগতিতে 'গ' মেরু ধার্য্য করিয়া সন্নিবেশিত স্বরগুলিই পাইলাম। আমরা 'গ' স্বরের বৃহৎ অন্তরে 'গ' অপেক্ষা মৃদু এবং 'র' অপেক্ষা তীব্র ১টি স্বর, 'র' স্বরের মধ্য অন্তরে 'র' অপেক্ষা মৃদু এবং 'স' অপেক্ষা তীব্র ১টি স্বর, 'স' স্বরের অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় কোনও স্বর পাইব না, 'ন' স্বরের বৃহৎ অন্তরে 'ন' অপেক্ষা মৃদু এবং 'ধ' অপেক্ষা তীব্র ১টি স্বর, 'ধ' স্বরের বৃহৎ অন্তরে 'ধ' অপেক্ষা মৃদু এবং 'প' অপেক্ষা তীব্র ১টি

স্বর, 'প' স্বরের মধ্য অন্তরে 'প' অপেক্ষা মৃদু এবং 'ম' অপেক্ষা তীব্র ১টি স্বর পাইব। 'ম' স্বরের ক্ষুদ্র অন্তরে কোন স্বরস্থান নাই। বাদী সমবাদী সম্বন্ধ অনুরূপ ভাবে ধার্য্য করা যাইবে, যথা—১ম-৪র্থ, ১ম-৫ম সম্বন্ধযুক্ত। ১২টি স্বর দ্বারাই সপ্তক গঠিত হইয়াছে। অপর সপ্তকের কোন স্বর নির্ম্মাণ করার প্রয়োজন হয় নাই। গান্ধার গ্রামের অনুলোমগতির স্বর এবং শ্রুতি উদাহরণ ও লক্ষণ সহ বলিতেছি। এই স্বর সমাবেশে আমরা 'গ' স্বরকে মেরু স্বর রূপে পাইব।

উদাহরণ শ্রুতি (১৯) ঃ—

সংখ্যা	ঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
স্বরনাম	ঃ	গ	ম	প	ধ	ন	স	র
শ্রুতি	ঃ	০০০০,	০০০,	০০,	০০০০,	০০০০,	০০০,	০০
স্বরস্থান	ঃ	১টি,	১টি,	নাই,	১টি,	১টি,	১টি,	নাই

অনুরূপ ভাবেই আমরা উদাহরণ শ্রুতি (১৯) লিখিত স্বর হইতে 'গ' স্বরের বৃহৎ অন্তরে 'গ' অপেক্ষা তীব্র এবং 'ম' অপেক্ষা মৃদু ১টি স্বর, 'ম' স্বরের মধ্য অন্তরে 'ম' অপেক্ষা তীব্র এবং 'প' অপেক্ষা মৃদু ১টি স্বর ; 'প' স্বরের ক্ষুদ্র অন্তর হইতে কোনও স্বরস্থান পাই না, 'ধ' স্বরের বৃহৎ অন্তর হইতে 'ধ' অপেক্ষা তীব্র এবং 'ন' অপেক্ষা মৃদু ১টি স্বর, 'ন' স্বরের বৃহৎ অন্তর হইতে 'ন' অপেক্ষা তীব্র এবং 'স' অপেক্ষা মৃদু ১টি স্বর, 'স' স্বরের মধ্য অন্তর হইতে 'স' অপেক্ষা তীব্র এবং 'র' অপেক্ষা মৃদু ১টি স্বর পাইব। 'র' স্বরের অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় কোনও স্বরস্থান পাইব না। বাদী সমবাদী ১ম-৪র্থ ও ১ম-৫ম সম্বন্ধযুক্ত পাওয়া যাইবে। ১২টি স্বরেই সপ্তক গঠিত। অন্য কোনও সপ্তকের স্বর নির্ম্মাণ করার প্রয়োজন হয় নাই।

বিলোমগতিতে ষড়্জ গ্রামের স্বর স্থাপনা।

উদাহরণ শ্রুতি (২০) ঃ—

সংখ্যা ঃ	৭	৬	৫	৪	৩	২	১
স্বর নাম ঃ	র	গ	ম	প	ধ	ন	স
শ্রুতি ঃ	০০,	০০০,	০০০০,	০০০০,	০০,	০০০,	০০০০
স্বরস্থান ঃ	নাই,	১টি,	১টি,	১টি,	নাই,	১টি,	১টি

উদাহরণ শ্রুতি (২০) লিখিত স্বর সমাবেশ হইতে আমরা 'স' স্বরের বৃহৎ অন্তরে 'স' অপেক্ষা মৃদু এবং 'ন' অপেক্ষা তীব্র ১টি স্বর, 'ন' স্বরের মধ্য অন্তরে 'ন' অপেক্ষা মৃদু এবং 'ধ' অপেক্ষা তীব্র ১টি স্বর, 'ধ' স্বরের অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় কোনও স্বরস্থান নাই, 'প' স্বরের বৃহৎ অন্তরে 'প' অপেক্ষা মৃদু এবং 'ম' অপেক্ষা তীব্র ১টি স্বর, 'ম' স্বরের বৃহৎ অন্তর হইতে 'ম' অপেক্ষা মৃদু এবং 'গ' অপেক্ষা তীব্র ১টি স্বর, 'গ' স্বরের মধ্য অন্তরে 'গ' অপেক্ষা মৃদু এবং 'র' অপেক্ষা তীব্র ১টি স্বর পাইব। 'র' স্বরের অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় কোন স্বরস্থান পাই না। বাদী সমবাদী সম্বন্ধ ১ম-৪র্থ ও ১ম-৫ম রীতিতেই ধার্য্য করা যাইবে। ১২টি স্বরেই সপ্তক গঠিত হইয়াছে। অন্য কোনও সপ্তকের স্বর নির্ম্মাণের প্রয়োজন হয় নাই।

অনুলোম প্রথায় স্বরস্থাপনা।

উদাহরণ শ্রুতি (২১) ঃ—

সংখ্যা ঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
স্বরনাম ঃ	স	র	গ	ম	প	ধ	ন
শ্রুতি ঃ	০০০০,	০০০,	০০,	০০০০,	০০০০,	০০০,	০০
স্বরস্থান ঃ	১টি,	১টি,	নাই,	১টি,	১টি,	১টি,	নাই

উদাহরণ শ্রুতি (২১) লিখিত স্বর সমাবেশ হইতে আমরা 'স' স্বর হইতে 'স' অপেক্ষা তীব্র এবং 'র' অপেক্ষা মৃদু ১টি স্বর, 'র' স্বরের মধ্য অন্তর হইতে 'র' অপেক্ষা তীব্র এবং 'গ' অপেক্ষা মৃদু ১টি স্বর, 'গ' স্বরের অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় কোনও স্বরস্থান পাই না, 'ম' স্বরের বৃহৎ অন্তরে 'ম' অপেক্ষা তীব্র এবং 'প' অপেক্ষা মৃদু ১টি স্বর, 'প' স্বরের বৃহৎ অন্তর হইতে 'প' অপেক্ষা তীব্র এবং 'ধ' অপেক্ষা মৃদু ১টি স্বর, 'ধ' স্বরের মধ্য অন্তর হইতে 'ধ' অপেক্ষা তীব্র এবং 'ন' স্বর অপেক্ষা মৃদু ১টি স্বর পাইব। 'ন' স্বরের অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় তাহা হইতে কোনও স্বরস্থান পাই না। বাদী সমবাদী একই রীতিতে অর্থাৎ ১ম-৪র্থ ও ১ম-৫ম রীতিতে ধার্য্য করা যাইবে। ১২টি স্বরের সাহায্যেই সপ্তক গঠিত। অন্য কোনও সপ্তকের স্বর নির্ম্মাণের প্রয়োজন হয় নাই।

অন্তর বিচার কালে উদাহরণ শ্রুতি (১৪) হইতে উদাহরণ শ্রুতি (২১) পর্য্যন্ত সব কয়টির ১ম, ৪র্থ ও ৫ম অন্তর পাই বৃহৎ, ২য় ও ৬ষ্ঠ পাই মধ্য অন্তর, এবং ৩য় ও ৭ম পাই ক্ষুদ্র অন্তর। মধ্যম গ্রাম, গান্ধার গ্রাম এবং ষড়জ গ্রামের বিচার হইতে আমরা যে যে স্বর-স্থান পাইয়াছি তাহারই উল্লেখ করিয়াছি। কোন্ স্থানে কোন্ স্বর পাওয়া যাইবে এবং তাহার নাম কি হইবে না হইবে ইহা গবেষণার বিষয় নহে। কোথায় কোথায় প্রাচীন বা বৈদিক যুগের মত অনুসারী শ্রুতির অন্তর পাইব এবং স্বরস্থান পাইব তাহাই আলোচ্য। পৌরাণিক যুগের মনীষীরা ঠিক এই প্রকার রীতিই অবলম্বন করিয়া স্বরের স্বাভাবিক বিলোমগতিতেই স্থান হিসাবে শ্রুতির সংখ্যা ধার্য্য করিয়াছিলেন। নাট্যাচার্য্য ভরত নিজে বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্বসূরীকে অবজ্ঞা করেন নাই।

কম্পনের সাহায্যে শ্রুতির বিচারকালে কোনও কোনও বিষয়ের

পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন। পৌরাণিক যুগের মনীষীগণ বেণুর মধ্যমকে প্রথম স্বর অর্থাৎ 'স' বলিয়াছেন। এই বেণুর মধ্যমের কম্পনসংখ্যার কোন উল্লেখ না পাওয়ায় তাঁহাদের কথিত মধ্যম স্বরকে আমরা বর্ত্তমানের ১ম স্বর হিসাবে ধার্য্য করিতে পারিতেছি না। বৈজ্ঞানিকগণের উক্তি এবং যুক্তি হইতে আমরা জানিয়াছি যে, বস্তুর কম্পন সেঃ ৮ অপেক্ষা কম হইলে কিংবা ১৬,৩৮৪ অপেক্ষা অধিক হইলে তাহা হইতে যে শব্দ উত্থিত হয়, তাহা আমরা শুনিতে পাইব না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং বৈজ্ঞানিকগণ সেঃ ২৫৬ বার কম্পনসংখ্যায় যে স্বর পাওয়া যায় তাহাকে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গতিরক্ষক বাদ্যে (হারমোনিয়ম) 'সি' নামক 'স্কেল' বা স্বরনাম ধার্য্য করিয়াছেন। এই ধার্য্য 'সি' নামক স্কেলের স্বর উদারার ১ম স্বর কিংবা মুদারা সপ্তকের ১ম স্বর তাহা আমাদের বিচার্য্য নহে। সেই স্বরকে তাঁহারা উক্ত বাদ্যযন্ত্রের মেরুস্বর ধার্য্য করিয়াছেন। এই কম্পনসংখ্যাযুক্ত স্বরকে কেন্দ্র করিয়া আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্বর, সপ্তক, মেরু রচনা করিয়া নির্দ্দিষ্টভাবে বিভিন্ন রাগ রাগিণী সৃষ্টির ইতিহাস জানিয়াছি।

সেঃ ২৫৬ বার কম্পনসংখ্যাযুক্ত স্বরকে বৈজ্ঞানিকগণ আমাদের ভারতীয় সংগীতের মুদারা সপ্তকের ১ম স্বর ধার্য্য করিয়াছেন। আমরা ঐ 'স'কে মুদারা সপ্তকের 'স' ধার্য্য করিলে তারার 'স'কে উহার দ্বিগুণ সংখ্যক কম্পনসংখ্যায় পাইব। ঐ স্বরের কম্পনসংখ্যা সেঃ ৫১২ হইবে। একই মতে আমরা সেঃ ৫১২ কম্পনের 'স'কে তারার 'স' ধার্য্য করিলে সেঃ ১০২৪ কম্পনের 'স'কে অতি তারার 'স' বলিব, যাহা তারার সপ্তকের পরবর্ত্তী সপ্তক। যদি আমরা সেঃ ২৫৬ কম্পনযুক্ত 'স' স্বর হইতে সেঃ ৫১২ কম্পনসংখ্যাযুক্ত স্বর পর্য্যন্ত যে সপ্তক পাই তাহার স্বরগুলিকে কম্পনসংখ্যার অনুপাতে অর্থাৎ শ্রবণযোগ্য কম্পনসংখ্যা দ্বারা বা তাহার অনুপাত

সাহায্যে বিভাগ করিয়া শ্রুতি স্থাপনা করি, তবেই আমরা এক একটি শ্রুতির কম্পন সংখ্যা কত কিংবা কত সংখ্যা দ্বারা শ্রুতি সৃষ্ট তাহা জানিতে পারিব।

কথিত হইয়াছে 'স' ২৫৬, 'র' ২৮৮, 'গ' ৩২০, 'ম' ৩৪১$\frac{১}{৩}$, 'প' ৩৮৪, 'ধ' ৪২৬$\frac{২}{৩}$, 'ন' ৪৮০, পরবর্ত্তী সপ্তকের 'স' ৫১২ কম্পনযুক্ত স্বর। বলা যায় যে, সেঃ ২৫৬ বার কম্পন সংখ্যক যুক্তস্বর সমাবেশকে আমরা মনে করিব মুদারার 'স' কিংবা মুদারার 'স' স্বর শুনিলেই মনে করিব যে, সেঃ ২৫৬ কম্পন-সংখ্যাযুক্ত স্বর শুনিলাম। এখন সেঃ ২৫৬ সংখ্যক কম্পন এবং সেঃ ২৫৭ সংখ্যক কম্পনের মধ্যের ঐ কম্পনসংখ্যাকে কোটি কোটি অংশে বিভক্ত করিলে সেই অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশগুলি শুনিতে পাইব কিনা? হয়ত সাধারণভাবে শোনা যাইবে না, কিন্তু যুক্তির দিক্ দিয়া নিশ্চয়ই শুনিতে পাইব। কারণস্বরূপ বলা যায় যে, অংশগুলি যত সূক্ষ্মই হউক না ঐ অংশের সহিত আমাদের কথিত সেঃ ২৫৬ সংখ্যক কম্পন যুক্ত রহিয়াছে। মনে করিতে পারি ঐ ১ কম্পন সংখ্যাকে কোটি কোটি দিয়া ভাগ করিলে আমরা যতক্ষুদ্র সংখ্যাই পাই, তাহার সহিত ২৫৬ সংখ্যক কম্পন্ য্ক্ত থাকায় আমাদের কম্পনসংখ্যা হয় ২৫৬ যুক্ত ক্ষুদ্র অংশ। ইহাই যদি হয়, তবে যত ইচ্ছা সংখ্যা দ্বারা ১ কম্পনসংখ্যাকে বিভাগ করিলেও, যেহেতু এই ক্ষুদ্র অংশ ২৫৬ সংখ্যক কম্পন-সংখ্যার সহিত যুক্ত হইতেছে, সেইহেতু আমরা যুক্তির দিক দিয়া ঐ স্বর শুনিতে পাইব। কম্পনসংখ্যার মাধ্যমে আমরা এত সূক্ষ্ম হিসাবের মধ্যে না যাইয়া ১টি কম্পনসংখ্যাকেই আমরা শ্রুতির কম্পনসংখ্যার ১ম এবং শেষ মনে করিব।

আমরা অনুরূপ ভাবে স ও স্বরের মধ্যবর্ত্তী ৪টি শ্রুতিকে ৭$\frac{৩}{৪}$ কম্পনসংখ্যার অনুপাতে পাইব, র ও গ স্বরের মধ্যবর্ত্তী ৩ শ্রুতি

আমরা ১০$\frac{১}{৩}$ কম্পনসংখ্যার অনুপাতে পাইব, গ ও ম স্বরের মধ্যবর্ত্তী ২ শ্রুতি পাইব ১০$\frac{১}{৬}$ কম্পনসংখ্যার অনুপাতে, ম ও প স্বরের মধ্যবর্ত্তী ৪ শ্রুতির কম্পনসংখ্যা পাইব ১০$\frac{৫}{১২}$ কম্পনের অনুপাতে, ধ ও ন স্বরের মধ্যবর্ত্তী ৩ শ্রুতির কম্পনসংখ্যা পাইব ১৭$\frac{৪}{৯}$ অনুপাতে, ন স্বরের ২টি শ্রুতির অনুপাত ১৫$\frac{১}{২}$ কম্পনসংখ্যার অনুপাতে। আমরা ২৫৬ বার কম্পনের 'স' স্বরের ৪টি শ্রুতি নিম্নলিখিত উপায়ে পাইতেছি, যথা—২৫৬-২৬২$\frac{৩}{৪}$ ১ম শ্রুতি অর্থাৎ 'ছন্দোবতী', ২৬৩$\frac{৩}{৪}$-২৭০$\frac{১}{২}$ কম্পন পর্য্যন্ত ২য় শ্রুতি অর্থাৎ 'মন্দা', ২৭১$\frac{১}{২}$-২৭৮$\frac{১}{৪}$ কম্পন পর্য্যন্ত ৩য় শ্রুতি অর্থাৎ 'কুমুদ্বতী' এবং ২৭৯$\frac{১}{৪}$-২৮৭ পর্য্যন্ত কম্পন সংখ্যাকে আমরা ৪র্থ শ্রুতির অন্তর্গত অর্থাৎ 'তীব্রা'র কম্পনসংখ্যা জানিব। কম্পনসংখ্যার অনুপাতে শ্রুতিগুলি কোন্ কোন্ কম্পন সংখ্যা পর্য্যন্ত তাহার আলোচনা করিয়াছি। এই ২৫৬ সংখ্যক কম্পন যে কোনও সপ্তকের স্বরই হউক তাহাতে বিচার করিবার কোনও অসুবিধা নাই। হেতুস্বরূপ বলা যায় যে উদারা, মুদারা কিংবা তারা যাহাই হউক স্বরও ১টি পাওয়া যাইবে এবং শ্রুতির কম্পনের অনুপাতও পাওয়া যাইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কম্পনসংখ্যা যত বেশী হইবে স্বরও তত বেশী তীব্র বা উচ্চ হইবে। এই স্থলে বলা যায় যে শ্রুতির কম্পনসংখ্যাকে যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অনুপাতে ধার্য্য করা হয় তবে কম্পনসংখ্যা যত বেশী পাওয়া যাইবে শ্রুতির সংখ্যাও তত বেশী পাওয়া যাইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে যদি আমরা ৩২ কম্পনসংখ্যক 'স' স্বরের ৪টি শ্রুতির কম্পনসংখ্যা ধার্য্য করিতে চাই তবে আমরা ১টি শ্রুতিকে মাত্র ১ কম্পনসংখ্যা দিতে পারিতেছি। এখন এই ১ কম্পনসংখ্যাকে যদি শ্রুতির মান ধরা হয় তবে ২৫৬ কম্পনসংখ্যা হইতে ২৮৮ কম্পনসংখ্যা পর্য্যন্ত শ্রুতির গণনায় আমরা ২১টি শ্রুতি পাইব বা পাইতে

পারি। আবার যদি ইহাপেক্ষা কম সংখ্যক কম্পনের 'স' ধার্য্য করি তবে শ্রুতির কম্পনের সংখ্যার মানও সেই অনুপাতে কম হইবে এবং কম্পনসংখ্যা যতই বেশী হইবে শ্রুতির সংখ্যাও তত বেশী হইবে। এইরূপ অবস্থায় আমরা শ্রুতির সংখ্যা স্থির রাখিতে পারিতেছি না। অন্য উদাহরণ দ্বারা বলা যায় যে শ্রুতির কম্পন-সংখ্যার অনুপাতও স্বরের কম্পনসংখ্যার অনুপাতের সহিত সর্ব্ব-সময়েই সমতা রক্ষা করিবে। মনে হয় এই প্রকার রীতিই গ্রহণ করা হইয়াছে, নতুবা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের মনীষীগণ স্বরের শ্রুতির পরিমাপকে এক প্রকার রাখিয়া গিয়াছেন কেন? শ্রুতির কম্পনসংখ্যার বিচার করিবার সময় আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে স্বরের সূক্ষ্মাংশকেই শ্রুতি বলা হইয়াছে এবং নাদের কম্পন হইতেই শ্রুতির উৎপত্তি। এখন আমরা সাধারণভাবে ২৫৬ কম্পন-সংখ্যা হইতে ২০৪৮ কম্পনসংখ্যা পর্য্যন্ত যতগুলি স্বর পাওয়া যাইবে তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি এবং ইহা হইতেই জানা যাইবে কোন্ কোন্ স্বরের শ্রুতি কত কম্পন হইতে পাওয়া যাইবে। অবশ্য এই কম্পনসংখ্যার হিসাব সাধারণভাবেই করা হইয়াছে, জনসাধারণের মনে জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির প্রয়াসে।

(স) ২৫৬—২৬২$\frac{৩}{৪}$ (১ম) ২৬৩$\frac{৩}{৪}$—২৭০$\frac{১}{২}$ (২য়) ২৭১$\frac{১}{২}$—২৭৮$\frac{১}{৪}$ (৩য়) ২৭৯$\frac{১}{৪}$—২৮৭ (৪র্থ)।

(র) ২৮৮—২৯৭$\frac{১}{৩}$ (১ম) ২৯৮$\frac{১}{৩}$—৩০৭$\frac{১}{৩}$ (২য়) ৩০৮$\frac{২}{৩}$—৩১৯ (৩য়)।

(গ) ৩২০—৩২৯$\frac{১}{৬}$ (১ম) ৩৩০$\frac{১}{৬}$—৩৪০$\frac{১}{৩}$ (২য়)।

(ম) ৩৪১$\frac{১}{৩}$—৩৫০$\frac{৩}{৪}$ (১ম) ৩৫১$\frac{৩}{৪}$—৩৬১$\frac{১}{৬}$ (২য়) ৩৬২$\frac{১}{৬}$—৩৭১$\frac{৭}{১২}$ (৩য়) ৩৭২$\frac{৭}{১২}$—৩৮৩ (৪র্থ)।

(প) ৩৮৪—৩৯৩$\frac{৫}{১২}$ (১ম) ৩৯৪$\frac{৫}{১২}$—৪০৩$\frac{৫}{৬}$ (২য়) ৪০৪$\frac{৫}{৬}$—৪১৪$\frac{১}{৪}$ (৩য়) ৪১৫$\frac{১}{৪}$—৪২৫$\frac{২}{৩}$ (৪র্থ)।

(ধ) ৪২৬$\frac{২}{৩}$—৪৪৩$\frac{১}{৯}$ (১ম) ৪৪৪$\frac{১}{৯}$—৪৬০$\frac{৫}{৯}$ (২য়) ৪৬১$\frac{৫}{৯}$—৪৭৯ (৩য়)।

(ন) ৪৮০—৪৯৪$\frac{১}{২}$ (১ম) ৪৯৫$\frac{১}{২}$—৫১১ (২য়)। **এই ১টি সপ্তক।**
(১ম সপ্তক)

(স) ৫১২—৫২৬$\frac{৩}{৪}$ (১ম) ৫২৭$\frac{৩}{৪}$—৫৪২$\frac{১}{২}$ (২য়) ৫৪৩$\frac{১}{২}$—৫৫৮$\frac{১}{৪}$ (৩য়) ৫৫৯$\frac{১}{৪}$—৫৭৫ (৪র্থ)।

(র) ৫৭৬—৫৯৬ (১ম) ৫৯৭—৬১৭ (২য়) ৬১৮—৬৩৯ (৩য়)।

(গ) ৬৪০—৬৫৯$\frac{৫}{৬}$ (১ম) ৬৬০$\frac{৫}{৬}$—৬৮১$\frac{১}{৩}$ (২য়)।

(ম) ৬৮২$\frac{১}{৩}$—৭০২$\frac{৩}{৪}$ (১ম) ৭০৩$\frac{৩}{৪}$—৭২৩$\frac{৫}{৬}$ (২য়) ৭২৪$\frac{৫}{৬}$—৭৪৪$\frac{১}{১২}$ (৩য়) ৭৪৫$\frac{১}{১২}$—৭৬৭ (৪র্থ)।

(প) ৭৬৮—৭৮৮$\frac{১}{১২}$ (১ম) ৭৮৯$\frac{১}{১২}$—৮০৯$\frac{১}{৬}$ (২য়) ৮১০$\frac{১}{৬}$—৮৩০$\frac{১}{৪}$ (৩য়) ৮৩১$\frac{১}{৪}$—৮৫২$\frac{১}{৩}$ (৪র্থ)।

(ধ) ৮৫৩$\frac{১}{৩}$—৮৮৭$\frac{৫}{৯}$ (১ম) ৮৮৮$\frac{৫}{৯}$—৯২২$\frac{৭}{৯}$ (২য়) ৯২৩$\frac{৭}{৯}$—৯৫৯ (৩য়)।

(ন) ৯৬০—৯৯০$\frac{১}{২}$ (১ম) ৯৯১$\frac{১}{২}$—১০২৩ (২য়)। **এই ২য় সপ্তক। ১ম সপ্তক অপেক্ষা তীব্র।**

(স) ১০২৪—১০৫৪$\frac{৩}{৪}$ (১ম) ১০৫৫$\frac{৩}{৪}$—১০৮৬$\frac{১}{২}$ (২য়) ১০৮৭$\frac{১}{২}$—১১১৮$\frac{১}{৪}$ (৩য়) ১১১৯$\frac{১}{৪}$—১১৫১ (৪র্থ)।

(র) ১১৫২—১১৯৩$\frac{১}{৩}$ (১ম) ১১৯৪$\frac{১}{৩}$—১২৩৫$\frac{২}{৩}$ (২য়) ১২৩৬$\frac{২}{৩}$—১২৭৯ (৩য়)।

(গ) ১২৮০—১৩২১$\frac{১}{৬}$ (১ম) ১৩২২$\frac{১}{৬}$—১৩৬৪$\frac{১}{৩}$ (২য়)।

(ম) ১৩৬৫$\frac{১}{৩}$—১৪০৬$\frac{৩}{৪}$ (১ম) ১৪০৭$\frac{৩}{৪}$—১৪৪৯$\frac{১}{৬}$ (২য়) ১৪৫০$\frac{১}{৬}$—১৪৯১$\frac{৭}{১২}$ (৩য়) ১৪৯২$\frac{৭}{১২}$—১৫৩৫ (৪র্থ)।

(প) ১৫৩৬—১৫৭৭$\frac{৭}{১২}$ (১ম) ১৫৭৮$\frac{৭}{১২}$—১৬১৯$\frac{৫}{৬}$ (২য়) ১৬২০$\frac{৫}{৬}$—১৬৬২$\frac{১}{৪}$ (৩য়) ১৬৬৩$\frac{১}{৪}$—১৭০৫$\frac{১}{৩}$ (৪র্থ)।

(ধ) ১৭০৬$\frac{১}{৩}$—১৭৭৬$\frac{৪}{৯}$ (১ম) ১৭৭৭$\frac{৪}{৯}$—১৮৪৭$\frac{২}{৯}$ (২য়) ১৮৪৮$\frac{২}{৯}$—১৯১৯ (৩য়)।

(ন) ১৯২০—১৯৮২$\frac{১}{২}$ (১ম) ১৯৮৩$\frac{১}{৪}$—২০৪৭ (২য়)। **ইহা আরও ১টি সপ্তক। ২য় সপ্তক অপেক্ষা তীব্র।**

(স) ২০৪৮।

আমরা এই কম্পন সংখ্যার সাহায্যে দেখিতে পাইতেছি যে, ২৫৬ সংখ্যক কম্পনযুক্ত যে স্বরটি তাহা ২৮৭ কম্পন সংখ্যা

পর্য্যন্ত অধিকার করিতেছে। যখনই আমরা ২৮৮ সংখ্যক কম্পনযুক্ত কোনও স্বর শুনিব তখনই আমরা সেই স্বরটিকে মুদারার 'র' স্বর মনে করিব। অনুরূপ ভাবে 'র' স্বরের শ্রুতির শেষ কম্পন সংখ্যা ৩১৯। ৩২০ কম্পনসংখ্যা হইতে 'গ' স্বরের শ্রুতি আমরা ৩৪০⅔ কম্পন পর্য্যন্ত পাইতেছি। অনুরূপ ভাবেই আমরা অন্যান্য স্বরের শ্রুতির কম্পনসংখ্যা পাইব। একই উপায় আমরা শ্রুতির কম্পনসংখ্যার বিচার করিতে পারি। যত গ্রামই পাই না কেন বিচার একই প্রকার রীতিতে করা যাইবে।

বৈজ্ঞানিকগণের মতে আমরা কম্পনসংখ্যার মাধ্যমে স্বরের উৎপত্তি, ধ্বনি সৃষ্টি এবং বিকৃত স্বরের সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছে তাহা জানিয়াছি। কম্পনসংখ্যার দ্বারা আমরা সংগীতের যে সমস্ত বিষয়গুলি পাইয়াছি তাহার সব কয়টিই আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান আলোচনায় আমরা বৈজ্ঞানিক মতের নির্দ্দেশ মত জানিয়াছি যে সেঃ ৮ পূর্ণ কম্পন হইতে ১৬,৩৮৪টি পূর্ণ কম্পনের যে স্বর বা শব্দ আমরা তাহা শুনিতে পাই। ঐ বৈজ্ঞানিক যুক্তি মানিয়া লইলে আমরা নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হই।

আমরা ৮ কম্পনসংখ্যায় প্রাপ্ত 'স' স্বরটি এবং ১৬ কম্পনসংখ্যায় প্রাপ্ত 'স' স্বরটির মধ্যবর্ত্তী ৭টি স্বরেও ২২টি শ্রুতি আইনসম্মত ও নিয়মানুগ প্রথায় স্থাপন করিতে বাধ্য। ৮ কম্পনে 'স' স্বর পাইলে আমরা 'র' স্বর পাই ৯ কম্পনসংখ্যায়, 'গ' স্বর পাই ১০ কম্পনসংখ্যায় 'ম' স্বর পাই ১০⅔ কম্পনসংখ্যায়, 'প' স্বর পাই ১২ কম্পনসংখ্যায়, 'ধ' স্বর পাই ১৩⅓ কম্পনসংখ্যায়, 'ন' স্বর পাই ১৫ কম্পনসংখ্যায় এবং পরবর্ত্তী গ্রামের 'স' স্বর পাই ১৬ কম্পনসংখ্যায়। স্বরের শ্রুতি স্থাপনা করিতে হইলে ৮ কম্পনসংখ্যা হইতে ৯ কম্পনসংখ্যার মধ্যেই 'স' স্বরের ৪টি শ্রুতি স্থাপনা করিতে হইবে। ৯ কম্পন ও ১০ কম্পনের স্বরের মধ্যে 'র' স্বরে ৩টি, ১০ কম্পন ও ১০⅔

কম্পনের মধ্যে 'গ' স্বরের ২টি, $১০\frac{২}{৩}$ ও ১২ কম্পনের মধ্যে 'প' স্বরের ৪টি, ১২ ও $১৩\frac{১}{৩}$ কম্পনের মধ্যে 'ধ' স্বরের ৩টি, $১৩\frac{১}{৩}$ ও ১৫ কম্পনের মধ্যে 'ন' স্বরের ২টি শ্রুতি স্থাপনা করিতে হইবে। এই সপ্তকের কম্পনসংখ্যার মাধ্যমে শ্রুতির কম্পনসংখ্যা ধার্য্য করিতে হইলে শ্রুতির কম্পনগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিভাগে বিভক্ত করিতে হইবে।

উদাহরণ দ্বারা 'স' স্বরের শ্রুতি কোন্ কোন্ সপ্তকে কিরূপ তাহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। ১ কম্পনসংখ্যা হইতে ২ কম্পনসংখ্যা পর্য্যন্ত ১টি সপ্তক, ২ কম্পনসংখ্যা হইতে ৪ কম্পনসংখ্যা পর্য্যন্ত ১টি সপ্তক, ৪ কম্পনসংখ্যা হইতে ৮ কম্পনসংখ্যা পর্য্যন্ত ১টি সপ্তক, ৮ কম্পনসংখ্যা হইতে ১৬ কম্পনসংখ্যা পর্য্যন্ত ১টি সপ্তক, ১৬ কম্পনসংখ্যা হইতে ৩২ কম্পনসংখ্যা পর্য্যন্ত ১টি সপ্তক এবং অনুরূপ প্রকারে ২৫৬ কম্পনসংখ্যা পর্য্যন্ত আমরা ৯টি সপ্তক পাইতে পারি। উদাহরণ দ্বারা কোন্ কোন্ সপ্তকে কোন্ কোন্ স্বরের শ্রুতির কম্পনসংখ্যা কি প্রকার হইবে, তাহার একটি তালিকা দিতেছি।

আমরা মাত্র 'স' স্বরটির শ্রুতির আলোচনা করিতেছি। কোন্ সপ্তকে 'স' স্বরের শ্রুতির কম্পনসংখ্যা কি প্রকার তাহা এই উদাহরণ হইতে জানা যাইবে।

(স) ১—$১\frac{২৭}{১০২৪}$ (১ম) $১\frac{২৭}{১০২৪}$—$১\frac{২৯}{৫১২}$ (২য়) $১\frac{২৯}{৫১২}$—$১\frac{৮৯}{১০২৪}$ (৩য়) $১\frac{৮৯}{১০২৪}$—$১\frac{৩১}{২৫৬}$ (৪র্থ), 'র' $১\frac{১}{৮}$।

(স) ২—$২\frac{২৭}{৫১২}$ (১ম) $২\frac{২৭}{৫১২}$—$২\frac{২৯}{২৫৬}$ (২য়) $২\frac{২৯}{২৫৬}$—$২\frac{৮৯}{৫১২}$ (৩য়) $২\frac{৮৯}{৫১২}$—$২\frac{৩১}{১২৮}$ (৪র্থ), 'র' $২\frac{১}{৪}$।

(স) ৪—$৪\frac{২৭}{২৫৬}$ (১ম) $৪\frac{২৭}{২৫৬}$—$৪\frac{২৯}{১২৮}$ (২য়) $৪\frac{২৯}{১২৮}$—$৪\frac{৮৯}{২৫৬}$ (৩য়) $৪\frac{৮৯}{২৫৬}$—$৪\frac{৩১}{৬৪}$ (৪র্থ), 'র' $৪\frac{১}{২}$।

(স) ৮—$৮\frac{২৭}{১২৮}$ (১ম) $৮\frac{২৭}{১২৮}$—$৮\frac{২৯}{৬৪}$ (২য়) $৮\frac{২৯}{৬৪}$—$৮\frac{২৯}{১২৮}$ (৩য়) $৮\frac{২৯}{১২৮}$—$৮\frac{৩১}{৩২}$ (৪র্থ), 'র' ৯।

(স) ১৬—$১৬\frac{১৭}{৬৪}$ (১ম) $১৬\frac{১৭}{৬৪}$—$১৬\frac{২৯}{৩২}$ (২য়) $১৬\frac{২৯}{৩২}$—$১৭\frac{২৫}{৬৪}$ (৩য়) $১৭\frac{২৫}{৬৪}$—$১৭\frac{১৫}{১৬}$ (৪র্থ), 'র' ১৮।

(স) ৩২—$৩২\frac{১৭}{৩২}$ (১ম) $৩২\frac{১৭}{৩২}$—$৩৩\frac{১৩}{১৬}$ (২য়) $৩৩\frac{১৩}{১৬}$—$৩৪\frac{২৫}{৩২}$ (৩য়) $৩৪\frac{২৫}{৩২}$ $৩৫\frac{৭}{৮}$ (৪র্থ), 'র' ৩৬।

(স) ৬৪—$৬৫\frac{১}{১৬}$ (১ম) $৬৫\frac{১}{১৬}$—$৬৭\frac{৫}{৮}$ (২য়) $৬৭\frac{৫}{৮}$—$৬৯\frac{৯}{১৬}$ (৩য়) $৬৯\frac{৯}{১৬}$—$৭১\frac{৩}{৪}$ (৪র্থ), 'র' ৭২।

(স) ১২৮—$১৩১\frac{৩}{৮}$ (১ম) $১৩১\frac{৩}{৮}$—$১৩৫\frac{১}{৪}$ (২য়) $১৩৫\frac{১}{৪}$—$১৩৮\frac{১}{৮}$ (৩য়) $১৩৮\frac{১}{৮}$—$১৪৩\frac{১}{২}$ (৪র্থ), 'র' ১৪৪।

আমরা জানিয়াছি যে ৮ কম্পনসংখ্যা হইতে ১৬,৩৮৪টি কম্পন-সংখ্যা আমরা শুনিতে পাই। যদি তাহাই মানিয়া লই, তবে ৮ কম্পনসংখ্যার সহিত কম্পনসংখ্যার যত ক্ষুদ্রতম অংশই হউক তাহা যুক্ত হইলেই আমরা শুনিতে পাইব। শ্রবণগ্রাহ্য যন্ত্রে না পাই, জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা পাইব মনে করিতে পারি। এখন ৮ কম্পনের সহিত $\frac{৮৭}{১২৮}$ সংখ্যক কম্পনের অংশটুকু যুক্ত হইলেও তাহা শুনিতে পাইব, তাহার সহিত ৮ কম্পন যুক্ত থাকার কারণে। আমরা এই আলোচনা এবং উদাহরণের মাধ্যমেই জানিয়াছি যে কম্পনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে স্বর তীব্র হইতেছে এবং শ্রুতির কম্পন-সংখ্যাও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি আমরা কোন এক কম্পনসংখ্যাকেই শ্রুতির মান ধার্য্য করি অর্থাৎ একটি নির্দ্দিষ্ট কম্পন-সংখ্যার দ্বারা শ্রুতির মান স্থিরীকৃত করি তবে ৮ কম্পনসংখ্যা হইতে ১৬,৩৮৪ কম্পনসংখ্যা পর্য্যন্ত কত শ্রুতি পাওয়া যাইবে তাহা একমাত্র সংখ্যাতত্ত্ববিদগণই বলিতে পারিবেন। এই স্থলে বলা যায় যে ২৫৬ কম্পনসংখ্যা হইতে ২০৪৮ কম্পনসংখ্যা পর্য্যন্ত স্বরের শ্রুতিগুলির যে কম্পনসংখ্যা ধার্য্য করা হইয়াছে তাহার দ্বারা প্রতি শ্রুতির শেষ কম্পনসংখ্যাটি পর্য্যন্তই সেই শ্রুতির কম্পন ধার্য্য করা হইয়াছে। আমরা এইটুকু শুধু বুঝিতে পারি যে যদি শ্রবণ-

যোগ্য কম্পনসংখ্যাকে অর্থাৎ $৮\frac{২৭}{১২৮}$ সংখ্যাকে শ্রুতির নির্দ্দিষ্ট মান নির্ণয় করিতে চাই এবং তাহার অনুপাতে শ্রুতির সংখ্যা ধার্য্য করিতে ইচ্ছা করি তবে তাহা উন্মাদের কার্য্যের তুল্যই মনে হইবে। প্রাচীন যুগের মনীষীগণ স্বরের ওজন এবং দূরত্ব বুঝাইবার কারণেই মনে হয় এইরূপ শ্রুতিসংখ্যা ধার্য্য করা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। যদি তাঁহারা শ্রুতির বিষয়টি অন্য কোন প্রকারে প্রকাশ করিবার রীতি বা পথ পাইতেন তবে হয়ত পরবর্ত্তী যুগের সমাজের জন্য নিশ্চয়ই তাহার ব্যবস্থা করিতেন। বর্ত্তমানে এই শ্রুতির ব্যাখ্যা, উদাহরণ এবং আলোচনা হইতে বলা যায় যে আমরা যে প্রথায় শ্রুতির কম্পনসংখ্যাগুলির বিচার করিয়াছি তাহা হইতে আমরা জানিয়াছি যে কম্পনসংখ্যাগুলি যতই বাড়িয়া যাইতেছে অর্থাৎ স্বর যতই তীব্র হইতেছে শ্রুতির কম্পনসংখ্যাগুলিও ঠিক সেই অনুপাতে বাড়িয়া যাইতেছে। স্বরের কম্পনসংখ্যা যতই বাড়ানো যাইবে ঠিক সেই অনুপাতে শ্রুতির কম্পনসংখ্যাও বাড়িবে। শ্রুতির কম্পনসংখ্যার কোনও নির্দ্দিষ্ট মান ধার্য্য করা সম্ভব নহে, হেতুস্বরূপ বলা যায় যে শ্রুতিসংখ্যা মান অনুসারে ধার্য্য করিলে তাহা অসংখ্য এবং অগণিত, যাহার ফলে সাংগীতিক স্বরের সঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

এখন আমরা যে ২২টি শ্রুতি পাইয়াছি তাহার জাতি এবং রস সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। শ্রুতির জাতি সম্বন্ধে রত্নাকরও বর্ণনা দিয়াছেন। তিনিও বলিয়াছেন শ্রুতির জাতি ৫টি—'দীপ্তা, 'আয়তা', 'করুণা', 'মৃদু' এবং 'মধ্যা'। এই জাতিগুলির আবার রস বিচারও পাওয়া যায়। এক একটি জাতি একটি একটি রস পরিবেশন করে, বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের মতও এইরূপ। বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ যেমন নব রস সহ আরও ৫টি অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, শান্ত, বাৎসল্য এবং মধুর রস কল্পনা করিয়াছেন ঠিক তেমনি ভাবেই

স্বরের মাধ্যমে নব রস পরিবেশন করার পরও তাঁহারা ঐ ৫টি রসকে শ্রুতির রস বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন।

স্বরের এবং শ্রুতির রস ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

'স' স্বরের শ্রুতির অর্থাৎ ছন্দোবতীর জাতি দীপ্তা, রস দাস্য; মন্দার জাতি আয়তা, রস সখ্য; কুমুদ্বতীর জাতি মৃদু, রস বাৎসল্য; তীব্রার জাতি মধ্যা, রস মধুর।

'র' স্বরের শ্রুতির অর্থাৎ রতিকার জাতি করুণা, রস শান্ত; রঞ্জনীর জাতি মধ্যা, রস মধুর; দয়াবতীর জাতি মৃদু, রস বাৎসল্য।

'গ' স্বরের শ্রুতির অর্থাৎ ক্রোধার জাতি দীপ্তা, রস দাস্য; রুদ্রার জাতি আয়তা, রস সখ্য।

'ম' স্বরের শ্রুতির অর্থাৎ মার্জ্জনীর জাতি দীপ্তা, রস দাস্য; প্রীতির জাতি আয়তা, রস সখ্য; প্রসারিণীর জাতি মৃদু, রস বাৎসল্য; বজ্রিকার বা বিজরেখার জাতি মধ্যা, রস মধুর।

'প' স্বরের শ্রুতি অর্থাৎ আলাপিনী বা আলাপনীর জাতি মৃদু, রস বাৎসল্য; সন্দীপনীর জাতি মধ্যা, রস মধুর; রক্তার জাতি আয়তা, রস সখ্য; ক্ষিতির জাতি করুণা, রস শান্ত।

'ধ' স্বরের শ্রুতি অর্থাৎ রম্যার জাতি করুণা, রস শান্ত; রোহিণীর জাতি আয়তা, রস সখ্য; মদন্তীব জাতি মধ্যা, রস মধুর।

'ন' স্বরের শ্রুতি অর্থাৎ ক্ষোভিণীর জাতি দীপ্তা, রস দাস্য; উগ্রার জাতি মধ্যা, রস মধুর।

আমরা শ্রুতির জাতি ও রস যাহা জানিয়াছি তাহার সম্বন্ধে বলিতে চাই যে জাতি এবং রসের অর্থগত কোনও তাৎপর্য্য আছে কিনা আমার জানা নাই। প্রয়োগ করিবার সময়ে এই সমস্ত জাতির রসগুলি প্রকাশ করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আমার নিশ্চিত কোনও ধারণা নাই তবে মনে করিতে পারি যে, স্বরের

যখন রস প্রকাশ করা সম্ভব তখন শ্রুতির অধিকৃত জাতির রসগুলিও শিল্পীর প্রয়োগনৈপুণ্যের ফলে প্রকাশ করা একান্ত অসম্ভব নহে। প্রাচীন পুস্তকাদি হইতে লব্ধ জ্ঞান দ্বারা আমার এইরূপ ধারণা।

বৈদিক যুগের ব্যবহৃত যত প্রকার অলংকার আমরা পাইয়াছি তাহাদের মধ্যে বাদী এবং সমবাদীর প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রাগ ও রাগিণীর রূপ প্রকাশে বাদী সমবাদীর তুল্য প্রয়োজনীয় কোনও অলংকার আমরা পাই না। বাদী, সমবাদী, অনুবাদী ইত্যাদি অলংকারের নাম ও লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

বাদী সমবাদী নির্দ্ধারণের রীতির বিভিন্ন মত

শ্রীবিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতি ক্রমিক পুস্তকমালিকায় বাদী স্বর ধার্য্য করিয়া সমবাদী স্বর পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী, অর্থাৎ ষড়্‌জ-পঞ্চম সম্বন্ধ বিশিষ্ট স্বরগুলির অনুপাতে ধার্য্য করিবার রীতি নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি 'সপ' সঙ্গতি সম্পন্ন স্বরের অনুপাতে তাঁহার হিন্দুস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতির ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ডের বহু রাগ-রাগিণীর (অবশ্য তিনি রাগ-রাগিণীর বিভেদ না মানিয়া সব রাগ বলিয়াছেন) বাদী সমবাদী ধার্য্য করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার সংগীতপদ্ধতিক্রমিক পুস্তকমালিকায় লিখিত বহু রাগ-রাগিণীর বাদীই ধার্য্য করিতে পারেন নাই। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায় পলাশী, পূরবী, নটকামোদ ইত্যাদি। "শ্রী"রাগপরিচয়ে তিনি 'ঋ' স্বর বাদী ধার্য্য করিয়া 'প' স্বর সমবাদী ধার্য্য করিয়াছেন। এই বাদীর সমবাদী সম্বন্ধে আমরা 'সপ' সঙ্গতি পাই না। "পূরিয়া ধানশ্রী" পরিচয়ে তিনি 'প' স্বর বাদী ধার্য্য করিয়া 'ঋ' স্বর সমবাদী ধার্য্য করিয়াছেন, ইহাতেও আমরা সপ সঙ্গতি পাই না। তিনি এইরূপ প্রথায় বাদী

সমবাদী সম্বন্ধ স্থাপনের রীতি কোন্ মতে করিয়াছেন বা কোন্ পুস্তকে এই প্রকার বাদী সমবাদী স্থাপনের দৃষ্টান্ত পাইয়াছেন অথবা তিনি নিজ বিদ্যা বা শিক্ষা মত করিয়াছেন তাহার কোন পরিচয় দেন নাই। এইরূপ প্রকৃতিতে বাদী সমবাদীর যথেচ্ছ ব্যবহার ছাত্রসমাজের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। অধিকাংশ মনীষী বাদী স্বর প্রথমে ধার্য্য করিয়া পরে সমবাদী স্বর স্থাপনের উপদেশ দিয়াছেন। বাদী স্বর ধার্য্য করিবার প্রয়োজনীয়তা কি, বাদী স্বর রাগ রাগিণীর রূপ প্রকাশে কোন্ অলংকারের স্থান অধিকার করিতে পারে এবং কি পদ্ধতিতে বাদী স্বর ধার্য্য করিতে হইবে অধিকাংশ পুস্তক প্রণেতা এমন কি অধুনা বহুল প্রচারিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতিক্রেমিক পুস্তকমালিকার প্রণেতাও এই সম্বন্ধে একেবারে নীরব। পুস্তক রচয়িতাগণ শুধুমাত্র বলিয়াছেন যে রাগ রাগিণীর মধ্যে যে স্বরটির বহুল পরিমাণ ব্যবহার পাওয়া যায় তাহাই বাদী স্বর তথা অংশ স্বর। বাদী স্বরকে রাগ-রাগিণীর প্রাণ বলা হইয়া থাকে। সংগীতপারিজাত আরও বহু গুণারোপ করিয়াছেন এই বাদী স্বরে, কিন্তু ধার্য্য করিবার রীতি সম্বন্ধে সবাই যেমন, তিনিও তেমনি নীরব।

বাদী স্বরের অনুপাতে সমবাদী স্বরের স্থান নিরূপণ করিবার পদ্ধতি বর্ত্তমানে কিরূপ, তাহার আলোচনা কালে ভিন্ন ভিন্ন মত পাইতেছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শ্রীভাতখণ্ডে বলিয়াছেন 'সপ' সম্বন্ধযুক্ত স্বরগুলি হইতে বাদী সমবাদী সম্বন্ধ নিরূপিত করা যাইবে। প্রচলিত শ্রুতির সংখ্যা অনুসারে বাদী স্বর হইতে সমবাদী স্বরের দূরত্ব বা স্থান ১৩ শ্রুতিতে অবস্থিত স্বরের পর হওয়া উচিত।

ঔড়ব, ষাড়ব ও স্বরান্তর জাতির রাগ-রাগিণীর সমবাদী ধার্য্য করা হইবে, বাদী স্বর হইতে ১৩ শ্রুতির পর যে স্বর অবস্থিত সেই

স্বরকে এবং সম্পূর্ণ জাতির রাগ-রাগিণীর সমবাদী ধার্য্য করা হইবে ৯ শ্রুতির পর অবস্থিত যে স্বর সেই স্বরকে, এইরূপ মতও আমরা পাইতেছি।

অন্য আর এক মতে আমরা পাইয়াছি যে, ঔড়ব, ষাড়ব ও স্বরান্তর জাতির রাগ-রাগিণীগুলিতে বাদী স্বরের শ্রুতি হইতে গণনা করিয়া ৯ শ্রুতির পর যে স্বর পাইতেছি তাহাই সমবাদী স্বর এবং সম্পূর্ণ জাতির রাগ-রাগিণীতে বাদী স্বর হইতে ১৩ শ্রুতি পর যে স্বর পাইতেছি তাহাই সমবাদী স্বর। এই শেষোক্ত দুই প্রকার রীতি হইতে আমরা দুই প্রকার স্বরসঙ্গতির সাহায্যে বাদী স্বরের সমবাদী ধার্য্য করিতেছি। এই দুইটির মধ্যে একটি 'সম' সঙ্গতি, অপরটি 'সপ' সঙ্গতি। সম সঙ্গতি অর্থাৎ ৯ শ্রুতি সম্বন্ধযুক্ত এবং 'সপ' সঙ্গতি অর্থাৎ ১৩ শ্রুতি সম্বন্ধ যুক্ত। এই শেষোক্ত দুইটি মতেই বিকৃত স্বরসমূহেরও একই প্রথায় বাদী সমবাদী সম্বন্ধ স্থাপনার রীতি মানিতে বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বাদী ও সমবাদী স্বরের মাধ্যমে অঙ্গ প্রাধান্যের বিচার করা যাইবে। বাদী যদি 'সরগম' এই চারিটি স্বরের কোনও একটি স্বর ধার্য্য করা হয় তবে যে রাগ বা রাগিণীতে সেই স্বরটি বাদী স্বর হইবে সেই রাগ বা রাগিণীটিকে পূর্ব্বাঙ্গ-প্রধান রাগ বা রাগিণী বলা যাইবে। পুনরায় বাদী স্বর যদি 'মপধন' স্বরের মধ্যে ধার্য্য করা হইয়া থাকে তবে সেই রাগ বা রাগিণীকে উত্তরাঙ্গপ্রধান রাগ বা রাগিণী বলা যাইবে।

সপ্তকের প্রকৃত স্বরগুলিকে দুইটি সমভাগে বিভক্ত করিলে আমরা প্রথমার্দ্ধে পাই 'সরগ' এবং অপরার্দ্ধে 'পধন'। 'ম' স্বরটি মধ্যস্থানে অবস্থান করায় কিংবা দুইটি ভাগের মধ্যবর্ত্তী স্বর হওয়ার জন্যই ইহার নাম 'মধ্যম' বলা হইয়াছে। 'ম' স্বরটি এই জন্যই উভয়াঙ্গে ব্যবহার করার রীতি ধার্য্য করা হইয়াছে। বাদী স্বর যদি

পূর্ব্বাঙ্গে থাকে তবে সমবাদী স্বর উত্তরাঙ্গে এবং বাদীস্বর উত্তরাঙ্গে থাকিলে সমবাদী স্বর পূর্ব্বাঙ্গে রাখিতে হইবে। হেতুস্বরূপ বলা যায় পূর্ব্বাঙ্গপ্রধান রাগ রাগিণীগুলি প্রধানত উদারা এবং মুদারা গ্রামের স্বরসাহায্যে গীত হইয়া থাকে, কদাচিৎ তারা গ্রামের স্বরের প্রভূত প্রয়োগ ইহাতে পাওয়া যায়। সেইরূপ উত্তরাঙ্গপ্রধান রাগ রাগিণীগুলি প্রধানত তারা এবং মুদারা গ্রামের স্বরসাহায্যে গীত হইয়া থাকে, কদাচিৎ উদারা গ্রামের স্বরের প্রভূত প্রয়োগ ইহাতে পরিলক্ষিত হয়।

আমরা ভিন্ন ভিন্ন মত হইতে বাদী সমবাদী নির্ণয়ে জটিলতা ও অসামঞ্জস্য পাইয়াছি। পুস্তক রচয়িতাগণের মতে বলা হইয়াছে যে শুদ্ধ স্বরের সহিত শুদ্ধ স্বরের এবং বিকৃত স্বরের সহিত বিকৃত স্বরের বাদী সমবাদী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে।

শুদ্ধ স্বরের বাদী সমবাদী সম্বন্ধের আলোচনা

সংগীতে বর্ত্তমানে বাদীর অনুপাতে সমবাদী স্বর স্থাপনার জন্য সঙ্গতি নামে একটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সঙ্গতি 'সম' ও 'সপ' প্রকৃতিসম্পন্ন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 'সম' প্রকৃতি ভাবাপন্ন কোন্ কোন্ সঙ্গতি আমরা প্রকৃত স্বরের মধ্যে পাই তাহা বলিতেছি। সম অর্থাৎ 'সঋরজ্ঞগ ও ম' অর্থাৎ ১ম স্বর হইতে প্রকৃত ও বিকৃত স্বর সহ গণনায় ৬ষ্ঠ স্বর পর্য্যন্ত আমরা পাই সম সঙ্গতি। আমরা একটি সপ্তকের প্রকৃত স্বরগুলিকে সম সঙ্গতি ভাবাপন্ন করিলে সম, রপ, গধ, মণ, পর্স, ধর্র ও নর্গ এই প্রকার সম সঙ্গতি পাই। এই সঙ্গতিতে আমরা পর্স, ধর্র ও নর্গ তিনটি স্বরের সঙ্গতি অর্থাৎ প, ধ ও ন স্বর তিনটির সঙ্গতি উচ্চ সপ্তকের স্বর ব্যতিরেকে পাই না, অর্থাৎ একটি গ্রামে আমরা সম, রপ, গধ ও মণ মাত্র এই চারিটি সঙ্গতি নিয়মানুগ উপায়ে পাইতে পারি। পরন্তু যদি পস, ধর,

নগ এই প্রকার সঙ্গতি ধার্য্য করি তবে তাহাই সপ সঙ্গতি অর্থাৎ ১৩ শ্রুতির পর অবস্থিত স্বরের সহিত সমবাদী সম্বন্ধ যুক্ত মনে করিতে পারি।

উপরোক্ত সম সঙ্গতির ক্ষেত্রে আমরা যে ব্যতিক্রমগুলি পাইয়াছি তাহার আলোচনা করিতেছি। একটি হইতেছে প্রকৃত 'ম' স্বরের সহিত 'ণ' স্বরের সঙ্গতি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি আমরা কোনও প্রকৃত স্বর সমাবেশ সম্পন্ন রাগ বা রাগিণীতে 'ম' স্বরকে বাদী স্বর রূপে ধার্য্য করি তাহাতে যদি আবার সেই রাগ রাগিণী সম্পূর্ণ জাতির হয় তবে নিয়মানুগ প্রথামত সমবাদী ধার্য্য করিবার জন্য কোথায় 'ণ' স্বর পাইব? দ্বিতীয় ব্যতিক্রম সম্বন্ধে বলা যায়, মুদারার সরগ মুদারার মপধ স্বর তিনটির সহিত নিয়মমতই সম ভাবাপন্ন কিন্তু তারা গ্রামের ঐ তিনটি স্বরই অর্থাৎ র্সর্র্গ মুদারার পধন এই তিন স্বরের সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন, মুদারার মপধ এই তিন স্বরের সঙ্গে যুক্ত হইলে সঙ্গতি রক্ষিত হইত। তৃতীয়ত পধন এই তিনটি স্বরকে যদি তারা গ্রামের সহিত সঙ্গতিরক্ষার্থে যুক্ত না করিয়া মুদারা গ্রামের স্বরের সহিত যুক্ত করি তবে ঐ সঙ্গতি সম না হইয়া সপ ভাবাপন্ন হইতেছে।

আমরা প্রকৃত স্বরগুলি হইতে সপ সঙ্গতিতে কিরূপ সঙ্গতি পাই তাহার বিচার করিতেছি। সপ সঙ্গতিতে আমরা স, ঋ, র, জ্ঞ, গ, ম, হ্ম, প, দ, ধ, ণ, ন এই সমাবেশ হইতে গণনায় ১ম স্বর হইতে পাই ৮ম স্বর। এইরূপ গণনায় একই সপ্তকের মধ্যে সপ, রধ, গন এবং অপর সপ্তকের স্বরের সহিত যুক্ত হইতে দেখিতেছি মর্স, পর্র, ধর্গ, নর্হ্ম, সপ সঙ্গতিতে। যদি মর্স, পর্র, ধর্গ, নর্হ্ম এই সঙ্গতিগুলি আমরা একই সপ্তকের স্বরের সহিত যুক্ত করিতে চাহি তখনই আমরা আর সপ সঙ্গতি পাই না। ইহারা সম সঙ্গতি সম্পন্ন হইতেছে। এখন সপ সঙ্গতি কথিত স্বরগুলি একই সপ্তকের মধ্যে কিছু কিছু সম

এবং কিছু কিছু সপ সঙ্গতি সম্পন্ন। আবার যদি পর পর আরোহী হিসাবে সপ সঙ্গতিতে স্বর যোজনা করি তবে তাহা অপর সপ্তকের স্বরের সহিত যুক্ত না হইয়া সপ সঙ্গতি ভাবাপন্ন হইতে পারে না।

এই আলোচ্য সপ সঙ্গতির ক্ষেত্রেও আমরা সম সঙ্গতির ন্যায় ব্যতিক্রম পাইতেছি। একটি প্রকৃত স্বরের সহিত বিকৃত স্বরের সঙ্গতি যেমন নহ্ম। অপর ব্যতিক্রম মুদারার পূর্ব্বাঙ্গ স্বর সরগ মুদারার স্বর তিনটির সঙ্গতি সম্পন্ন; যথা—সপ, রধ, গন। মুদারার উত্তরাঙ্গ স্বরগুলি তারা গ্রামের স্বর চারিটির সহিত যুক্ত, যথা—মর্স, পর্র, ধর্গ, নর্হ্ম। এখন দেখা যাইতেছে মুদারার পূর্ব্বাঙ্গ স্বর তিনটি অর্থাৎ সরগ মুদারার পধন এই তিনটি স্বরের সহিত সপ সঙ্গতি যুক্ত কিন্তু তারা গ্রামের পূর্ব্বাঙ্গ স্বরগুলি অর্থাৎ র্সর্রর্গ নিয়মানুগ ভাবে যুক্ত হওয়া উচিত, মুদারা গ্রামের পধন এই তিনটি স্বরের সহিত সপ সঙ্গতিতে, কিন্তু তাহা আমরা না পাইয়া পাইতেছি মপধ এই তিনটি স্বরের সহিত সপ সঙ্গতিতে। মুদারার 'ন' তারার 'হ্ম' স্বরের সহিত সপ সঙ্গতি যুক্ত কিন্তু মুদারার 'গ' মুদারার 'ন' স্বরের সহিত সপ সঙ্গতি সম্পন্ন। মুদারার 'স' মুদারার 'প' স্বরের সহিত যুক্ত কিন্তু তারার 'স' মুদারার 'ম' স্বরের সহিত সপ সঙ্গতিতে যুক্ত। 'প' স্বরটি তারার 'র' স্বরের সহিত যুক্ত সপ সঙ্গতিতে। এই সমস্ত ব্যতিক্রম আমরা পাইতেছি সম ও সপ এই উভয় প্রকার সঙ্গতি হইতে।

বিকৃত স্বরের বাদী সমবাদীর আলোচনা

বিকৃত স্বরগুলি হইতেও আমরা সম ও সপ সঙ্গতি পাই। কোন্ কোন্ স্বর সম সঙ্গতিতে এবং কোন্ কোন্ স্বর সপ সঙ্গতিতে পাইব তাহার উদাহরণ দিতেছি। এখন আমরা সম সঙ্গতিতে কোন্ কোন্ স্বর পাই তাহারই আলোচনা করিতেছি।

আমরা প্রকৃত স্বরগুলির সম সঙ্গতির বিচার কালে ৬ষ্ঠ স্বরকেই সম সঙ্গতি সম্পন্ন হইতে দেখিয়াছি, এই ক্ষেত্রেও নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তাহাই ধার্য্য করিতেছি। সম সঙ্গতিতে ঋক্ষ, জ্ঞদ, ক্ষন, দর্ঋ, ণর্জ্ঞ এই কয়েক প্রকার সম সঙ্গতি সম্পন্ন স্বর-সমন্বয় পাই। বিকৃত স্বরের ক্ষেত্রেও সম সঙ্গতিতে কিছু কিছু ব্যতিক্রম পাই। একটি বিকৃত স্বর অর্থাৎ 'ক্ষ' স্বরের সহিত অপর একটি প্রকৃত স্বর অর্থাৎ 'ন' সম সঙ্গতি সম্পন্ন। অপর ব্যতিক্রম মুদারার 'ঋ' (পূর্ব্বাঙ্গ) মুদারার 'ক্ষ' (উত্তরাঙ্গ) স্বরের সহিত সম সঙ্গতি সম্পন্ন কিন্তু মুদারার 'ক্ষ' (উত্তরাঙ্গ) স্বর মুদারার 'ন' (উত্তরাঙ্গ) স্বরের সহিত সম সঙ্গতি সম্পন্ন। মুদারার পূর্ব্বাঙ্গ স্বর 'জ্ঞ' মুদারার উত্তরাঙ্গ স্বর 'দ' স্বরের সহিত সম সঙ্গতি সম্পন্ন কিন্তু মুদারার উত্তরাঙ্গ স্বর 'দ' 'র্জ্ঞ' স্বরের সহিত যুক্ত না হইয়া তারার পূর্ব্বাঙ্গ স্বর 'ঋ' স্বরের সহিত সম সঙ্গতি সম্পন্ন। অনুরূপ ভাবে মুদারার উত্তরাঙ্গ স্বর 'ণ' তারার পূর্ব্বাঙ্গ 'র্জ্ঞ' স্বরের সহিত যুক্ত। এই প্রকার সঙ্গতিগুলি নিয়মানুগ নহে। আরও একটি ব্যতিক্রম হইতেছে যে, দর্ঋ এবং ণর্জ্ঞ সম্বন্ধ যুক্ত স্বর সম সঙ্গতিতে অপর সপ্তকের সহিত যুক্ত। পরন্তু ঐ স্বরগুলি মুদারা সপ্তকের অন্তর্ভুক্ত স্বরের সহিত যুক্ত হইলেই সপ সঙ্গতি সম্পন্ন হইতেছে।

'ম' স্বরটি যদি ঔড়ব, ষাড়ব, কিংবা স্বরান্তর জাতির স্বর সমাবেশের পূর্ব্বাঙ্গপ্রধান স্বর হিসাবে বাদীরূপে ধার্য্য করা হয় তবে ১৩ শ্রুতির পর একই সপ্তকের স্বরগুলির মধ্য হইতে আমরা সমবাদী পাইতেছি না, যথা—ম৪, প৪, ধ৩, এবং ন২=১৩ শ্রুতি এবং এই ১৩ শ্রুতির পরই আমরা পাইতেছি তারাগ্রামের 'স' স্বরটি। যেহেতু আমরা ১টি সম্পূর্ণ সপ্তকের অর্থাৎ ৫টি বিকৃত এবং ৭টি প্রকৃত স্বরের মধ্যে বাদীর সম্বন্ধে সমবাদী স্বর স্থাপনা করিতে

পারিতেছি না, সেইহেতু এই রীতিতে বা মতে এইরূপ স্বরসঙ্গতি নিয়মানুগ নহে।

'ম' স্বরটি যদি স্বরান্তর, ঔড়ব এবং ষাড়ব জাতির উত্তরাঙ্গ প্রধান স্বর হিসাবে বাদী রূপে ধার্য্য করি আমরা ম২, গ২, র৩, স-৪, ন-২ এই ১৩ শ্রুতি পাই। এখানে 'ম' স্বরের ২ শ্রুতি ধার্য্য করার হেতু 'ক্ম' এর ২ শ্রুতি গণনা করা হয় নাই। যুক্তিহেতু বলা হইতেছে যে স্বরের নিম্নাভিমুখী গতি হওয়ার কারণ 'ক্ম' যে দুইটি শ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে তাহা ব্যবহার করা যাইতেছে না। এইজন্যই ১৩ শ্রুতির গণনায় উদারা সপ্তকের 'ন' স্বরটি পর্য্যন্ত গণনা না করিলে নিয়মানুগ প্রথায় স্বর স্থাপনা করিতে পারি না। আমরা সম সঙ্গতিতে মণ স্বর দুইটিকে যুক্ত হইতে দেখিতেছি। এক্ষণে যুক্তির বিচারে 'ম' ও 'ণ' এই দুইটির স্বরসঙ্গতি পাই না।

'ম' স্বরটিকে যদি সম্পূর্ণ জাতির পূর্ব্বাঙ্গ স্বর হিসাবে বাদী রূপে ধার্য্য করি তবে আমরা সমবাদী স্বর পূর্ব্বকথিত মতে ৯ শ্রুতি পরে যে স্বরটি অবস্থিত তাহাকেই ধার্য্য করিব। এখন ম৪, প৪, ধ৩, এইরূপে ১১ শ্রুতি পাই। যদি সমবাদী স্বর নিয়মানুগ প্রথায় ধার্য্য করিতে হয় তবে ম৪, প৪ এবং ধ স্বরের ১ শ্রুতি পর্য্যন্ত ৯ শ্রুতি গণনা করিয়া এবং 'ধ' স্বরের শ্রুতি হইতে 'ণ' যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাকে যদি ১½ শ্রুতি বলা যায় তবে প্রকৃত 'ধ' মাত্র ১½ শ্রুতির স্বর হয়। তবে সমবাদী 'ধ' মাত্র ½ শ্রুতি পাইয়া থাকে। পরন্তু যদি 'ধ' স্বরের শ্রুতি হইতে 'ণ' স্বরকে মাত্র ১ শ্রুতিতে সম্পন্ন করা হয় তবে ১ শ্রুতি বিশিষ্ট 'ধ' স্বরকেই সমবাদী রূপে ধার্য্য করা উচিত কিন্তু তাহা না করিয়া 'ণ'কে সমবাদী ধার্য্য করা হইয়াছে এবং ইহাও যে কথিত মতে আইনানুগ নহে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

'ম' স্বরটিকে সম্পূর্ণ জাতির উত্তরাঙ্গ স্বর হিসাবে বাদী রূপে ধার্য্য করিলে সমবাদী রূপে যে স্বর আমাদের স্থির করিতে হইবে

তাহাকে নিয়মানুগ প্রথায় মুদারা সপ্তকের পূর্ব্বাঙ্গ স্বরগুলির মধ্যেই ধার্য্য করিতে হইবে। এই সঙ্গতি কথিত প্রকারে নিয়মানুগ।

অনুরূপ ভাবেই 'ন' স্বর বাদী হইলে (অর্থাৎ উত্তরাঙ্গপ্রধান স্বররূপে বাদী হইলে) ন২, ধ৩, প৪ এই ৯ শ্রুতির পর সমবাদী স্বর ধার্য্য করিতে হইলে আমরা 'হ্ম' স্বরকেই সমবাদী স্বররূপে পাইব এবং 'হ্ম' স্বরটিও উত্তরাঙ্গে অবস্থিত। এক্ষেত্রে উত্তরাঙ্গ স্বরের সহিত উত্তরাঙ্গ এবং বিকৃত স্বরের সহিত প্রকৃত স্বরের সম্বন্ধ হইতেছে।

এখন উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা দেখিয়াছি যে কতিপয় শুদ্ধ বা প্রকৃত স্বর সম বা সপ সঙ্গতিতে বিকৃত স্বরের সহিত এবং কতিপয় স্বর এক সপ্তকের স্বরের সহিত সঙ্গতি না করিয়া অপর সপ্তকের স্বরের সহিত সঙ্গতিভাবাপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণের কথিত মতের এইগুলি ব্যতিক্রম বলিয়া মনে করি। কি উপায়ে এবং ধারাবাহিক কোন্ রীতিতে এইগুলিকে আইন-সম্মত উপায়ে আমরা গ্রহণ করিতে পারি পরে তাহার আলোচনা করিব। সম ও সপ সঙ্গতিতে কিরূপে সহজে বাদী সমবাদী ধার্য্য করা যাইবে তাহার আলোচনা করিব। কেন এই বিভিন্ন প্রকার অসঙ্গতি বাদী সমবাদী সম্বন্ধ স্থাপনে পাওয়া যাইতেছে, তাহার কোন যুক্তি কোনও পুস্তক হইতেই পাওয়া যায় নাই।

বাদী স্বর কাহাকে বলে ইহা বহুপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা বাদী স্বর বলিতে রাগ রাগিণীতে ব্যবহৃত স্বরগুলির মধ্যে যেইটি প্রধান স্বর সেইটি মানিয়া লই। বক্তব্য এই যে, কেন এই একটি স্বরেরই এত প্রাধান্য? আমার মনে হয় যে, রাগ বা রাগিণী যে রসের বা ভাবের হইবে বাদী স্বরের মাধ্যমে সেই রসের বা ভাবের প্রকাশ হয়। 'রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ' অর্থাৎ রাগ রাগিণীর সাহায্যে মানব মন রঞ্জন করে যে

রসের মাধ্যমে, সেই রসসৃষ্টিকারী প্রধান স্বরই বাদী এবং সেই জন্যই রাগ রাগিণীর রূপ প্রকাশকালীন তাহার বহুল ব্যবহার সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বিভিন্নরূপ গুণাবলী তাহাতে আরোপ করিয়াছেন। বাদী স্বর হইতে যে রসের অনুভূতি সৃষ্টি হয়, রাগ বা রাগিণী সেই রসেরই অধীন হইবে। বাদী স্বর সম্বন্ধে মতামতগুলি কিরূপ তাহাই বলিতেছি। বাদী স্বরকে কেহ কেহ অংশ স্বর বলিয়াছেন, স্বরসমূহের মধ্যে ইহাকে নৃপতির সম্মান দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, কিন্তু কোন্ যুক্তির দ্বারা ব্যবহৃত স্বরসমূহের মধ্য হইতে একটি মাত্র স্বর যাহাকে এত সম্মান দেওয়া হয়, কিরূপে এবং কি প্রথায় সেই স্বর ধার্য্য করিতে হইবে তাহা কেহ বলিয়াছেন কিনা তাহা আমার জানা নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে রাগ রাগিণীর রসের বা ভাবের প্রকাশ বাদী স্বরের মাধ্যমেই করিতে হইবে। বাদী স্বর এই কারণেই প্রধান স্বর। স্বরের রস বা ভাব বলিতে আমরা এক এক স্বরের এক একপ্রকার রস বা ভাব জানি। ভাষা বা শব্দের দ্বারা যেমন নব নব রস প্রকাশ করা যায়, তেমন সাংগীতিক স্বরসমুহের দ্বারাও মনের ভাব বা রস প্রকাশ করা যায়। যদিও কোনও কোনও পুস্তক প্রণেতা কয়েকটি স্বরের রস বা ভাব সম্বন্ধে একই রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তথাপি কতিপয় স্বরের রস সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতামত অন্যান্য পুস্তক বা পণ্ডিতগণের মতামত হইতে পাওয়া যায়। কথিত আছে 'স' স্বর হইতে ধীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত, 'র' স্বর হইতে করুণ ও অদ্ভুত মিশ্র, 'গ' স্বর হইতে করুণ, 'ম' স্বর হইতে হাস্য, 'প' স্বর হইতে শৃঙ্গার, 'ধ' স্বর হইতে বীভৎস, 'ন' স্বর হইতে করুণ ও ভয়ানক মিশ্র রস পাওয়া যায়। রাগের বা রাগিণীর অধিকৃত এই সমস্ত রস বা ভাব প্রকাশ করার জন্যই বাদী স্বরের প্রয়োজন। রস বা ভাব প্রকাশ করার জন্যই, স্বরটি বহু ব্যবহৃত হয়। এই বহুল ব্যবহৃত স্বর বা বাদী

স্বর হইতে যে রস পাওয়া যাইবে, পরিবেশনকালে সেই রস বা ভাব অনুযায়ী প্রকাশ করিতে হইবে। রাগ বা রাগিণীর স্বর সমাবেশের রস যে শুধু বাদীর স্বরের রসের বা ভাবের প্রকাশেই সম্পূর্ণ হইবে তাহা নহে, বাদী স্বরের রসের বা ভাবের রসোপযুক্ত বাণীরও প্রয়োজন আছে। বলা যায় যে যদি করুণ রসের বাণীযুক্ত গীত-গুলিতে শৃঙ্গার রসোপযোগী রাগ রাগিণীর সুরারোপ করি তবে পরিবেশনকালে রসের মাধুর্য্য সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবে। এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না যে শ্রীভাতখণ্ডে 'দরবারী কানাড়া' রাগে (তিনি রাগ-রাগিণীর বিচারে অপারগ) 'পান বিড়ি খিলাইয়ে' এই বাণী দিয়া যে গীত স্বরলিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহা হিন্দী গানে প্রাচীনতার চরম নিদর্শন, তাহা হইতে ইতর বৃত্তি সম্পন্ন লোকরাই রস ও আনন্দ উপভোগ করিবে। যে রস তাহারা উপভোগ করিবে মনে হয় তাহাই হাস্য রস। কিন্তু 'দরবারী' রাগে 'র' স্বর বাদী হওয়ায় তাহা করুণ রসের উপযোগী। যদি আমরা করুণ রসের বাণী সমন্বিত গীতগুলিতে করুণ রসোপ-যোগী রাগ রাগিণীর সুরারোপ করি তবেই প্রকৃত রসোপলব্ধি করিতে পারিব, অন্যথা নহে। সমবাদী স্বর, যাহা বাদীর অনুপাতে ধার্য্য করিবার রীতি, তাহাও বাদীর রসের সহায়তা করিবে। অনুবাদীও বাদী সমবাদীর রসের সহায়তা করিবে।

বাদী, সমবাদী ও অনুবাদী রাগ রাগিণীর রূপ এবং রস উভয়ই প্রকাশ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে বসন্ত ঋতুর বর্ণনায় আমরা যে বাণী সমন্বিত গীত পাই তাহাতে যদি ভৈরবী, পূরবী কিংবা বেহাগ রাগ রাগিণীর স্বরারোপ করি তবে কি তাহা হইতে আমরা উদাস, করুণ, কিংবা উদাস করুণ মিশ্র কোন রস প্রকাশে সক্ষম হইব ? না—নিশ্চয়ই তাহা হইবে না। বাণীর যথার্থ অর্থ যে রাগ রাগিণীর স্বরারোপে পরিস্ফুট হইতে পারে সেইরূপ হিসাব

করিয়া স্বরারোপ করিলেই বাদী স্বরের সাহায্যে যথার্থ রস পাওয়া যাইতে পারিবে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে তাহা নির্ভুল নহে মনে করিব। রাগ বা রাগিণীর প্রকাশকালীন বাদী স্বরের রসের সহিত বাণীর রস একই প্রকৃতিগত হইলে প্রকৃত রসের বিকাশ হইবে। রসপ্রকাশে অর্থাৎ বাণীর উপযোগী রাগরাগিণী আরোপিত করিলে তবে শিল্পী ও শ্রোতার উভয়েরই আনন্দলাভ হইতে পারে নতুবা নহে।

এখন বলা যাইতেছে যে, অঙ্গ, অর্থাৎ সপ্তকের বিভাগ নামক এই অলংকার কেন রাগ রাগিণীর স্বরারোপে প্রয়োজন। আমরা বাদীর তাৎপর্য্য বিশেষরূপে জানিয়াছি। বাদী যদি পূর্ব্বাঙ্গ প্রধান হয় তবে আমরা রাগ রাগিণী হইতে প্রাপ্ত স্বরগুলিকে কেবল পূর্ব্বাঙ্গ প্রধান স্বরের মাধ্যমেই প্রকাশ করিতে নিয়মমত বাধ্য। সেই কারণে সমবাদী অর্থাৎ যে স্বর প্রায় বাদীর সমান তাহার স্থান আমরা উত্তরাঙ্গে ধার্য্য করিয়াছি। হেতুস্বরূপ বলা যায় যে স্বরের মাধ্যমে যখনই রাগ রাগিণীর রস সম্পূর্ণ করিতে হইবে তখনই সমবাদী স্বর না পাইলে আমরা উত্তরাঙ্গে অবস্থিত স্বরসমূহ ব্যবহার করার আইনত কোন পথ বা যুক্তি পাই না। সেইজন্যই সমবাদী বাদীর সহায়তাকারী এবং বাদীর সম প্রয়োজনীয়। এই অঙ্গ বা বিভাগকে এইজন্যই রাগ রাগিণীর রূপপ্রকাশকালে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

এক্ষণে মাতৃকার সাহায্যে বাদী এবং সমবাদী কিরূপে নিরূপণ করা যাইবে তাহাই বলা হইতেছে। প্রথমে বলিয়াছি কিরূপে তিনটি, তাহা হইতে সাতটি এবং সাতটি হইতে বারোটি স্বর আমরা পাইয়াছি। পুনরায় আবার বারোটি হইতে সাতটি এবং সাতটি হইতে সেই তিনটি স্বরে আমরা বৈদিক যুগের সংগীতের রূপ পাইতেছি। বৈদিক যুগের বা তৎপরবর্ত্তী যুগের মনীষীগণ কিরূপে

৩, ৩ হইতে ৭ এবং ৭ হইতে ১২টি স্বর নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহার কোন গাণিতিক হিসাব আমরা পাই না। কিন্তু এই রীতি সম্পূর্ণ গাণিতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমরা তিন স্বরের একত্র সমাবেশকে মাতৃকা নামে অভিহিত করিয়াছি। মাতৃকার সাহায্যে সমবাদী সম্বন্ধ নিরূপণ কি উপায়ে করিতে পারি তাহারই আলোচনা করিতেছি। বর্ত্তমানে আমরা কোন রাগরাগিণীতে ব্যবহৃত স্বরসমূহের মধ্যে বাদী স্বরকে প্রথমে ধার্য্য করিয়া লই এবং তৎপরে সম কিংবা সপ সঙ্গতিতে সেই বাদী স্বরের সহিত সমবাদী স্বর স্থাপনা করি ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই প্রকৃতিতে বাদী সমবাদী ধার্য্য করার জন্য রাগরাগিণীর রস ও রূপ প্রকাশে ভিন্ন ভিন্ন মত সৃষ্টির অবকাশ থাকিয়া যাইতেছে এবং যাইবেও। ইহার জন্যই তথাকথিত গুণী কালোয়াতগণ নিজ নিজ ইচ্ছামত বাদী স্বর স্থাপনা করিয়া রাগ রাগিণীর যথেচ্ছা প্রয়োগ ও পরিবেশন করিতে পারেন এবং নিজ নিজ ঘরোয়ানার দোহাই দিয়া সাধারণ শ্রোতাদের এবং ছাত্র-সমাজকে প্রতারিত করিতে পারেন। এই প্রকার বাদী সমবাদী প্রয়োগের যথেচ্ছাচার নিবারণ করার জন্যই প্রাচীন যুগের পণ্ডিতগণ বাদীর পরিবর্ত্তন করিলে রাগেরও পরিবর্ত্তন হইবে এই মত ধার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন। এই উপদেশ সর্ব্বদা মনে রাখা প্রয়োজন। যদি কোনো গুণী ব্যক্তি বাদী স্বরের এইরূপ যথেচ্ছা প্রয়োগ করেনও, তথাপি সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোন যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা করিবার অধিকারও নাই। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, হয় তিনি তাঁহার গুরুর নাম করিবেন নতুবা এমন এক প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির নাম বলিবেন যাহা হইতে তিনি, তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশধরগণ উত্তরাধিকারসূত্রে শিক্ষা করিয়াছেন ও করিবেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য, বংশধরগণ ব্যতিরেকে

অপর কোন ব্যক্তির সমক্ষে কেবল পুস্তকটির নাম এবং গুণাবলীর প্রকাশ করা যাইবে মাত্র, দর্শন বা স্পর্শন নিষিদ্ধ অর্থাৎ সেই পুস্তক 'গোপয়েৎ কুলবধূবৎ বা মাতৃজারবৎ' মনে করিতে হইবে। এইরূপ যথেচ্ছাচার প্রয়োগের দ্বারাই সংগীতের ধারাবাহিকতা নষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে।

৪ : ৫ : ৬ এই অনুপাতের সাহায্যে মাতৃকা আমরা পাইয়াছি। প্রাচীন যুগে মেরু নামে সংগীতে ব্যবহৃত বিশেষ অলংকার আমরা পাইয়াছি এবং তাহার প্রয়োগ জানিয়াছি। মেরু শব্দটি বর্ত্তমানে ব্যবহৃত আরোহী অবরোহীর সহিত সম প্রকৃতিসম্পন্ন। প্রথমেই আমাদের মনে রাখা দরকার মাতৃকার প্রথম স্বরকে মেরুস্থানে স্থাপন করিতে হইবে। মাতৃকার মাধ্যমে ভারতীয় রাগরাগিণীর গুণাবলীসমূহের যেইরূপ রীতিতে বিচার করিয়াছি, সেইরূপ প্রথায় বাদী স্বরকে মেরু ধার্য্য করিয়া সমবাদী স্বর ধার্য্য করিবার রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

'ম' স্বর কোন রাগ রাগিণীর বাদী স্বর (বাদী ধার্য্য করিবার রীতি পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি) হইলে সমবাদী স্বর কিরূপে ধার্য্য করিতে হইবে তাহাই বলিতেছি। 'ম' স্বরের মাতৃকা মধস কিংবা মদস (প্রকৃত ধ ব্যবহৃত হইলে 'ধ', কিংবা দ ব্যবহৃত হইলে 'দ') হইতে আমরা মেরু পাই 'মক্ষ্মপদধণনসঋরজ্ঞগ' এইরূপে। এখন মধস এই মাতৃকার প্রথম স্বর বাদী রূপে স্থিরীকৃত, সমবাদী মাতৃকার শেষ স্বর অর্থাৎ 'স' হইবে। এই 'ম' ও 'স' পরস্পর সপ সঙ্গতি সম্পন্ন এবং সম সঙ্গতি সম্পন্ন। বাদী স্বর যদি মাতৃকার শেষ স্বর অর্থাৎ ৩য় স্বর হয় তবে সমবাদী হইবে মাতৃকার ১ম স্বর। এখন এই মধস মাতৃকা হইতে 'ম' বাদী এবং 'স' সমবাদী এবং 'স' বাদী, 'ম' সমবাদী পাইতেছি অর্থাৎ ১ম স্বর বাদী হইলে ৩য় স্বর সমবাদী এবং ৩য় স্বর বাদী হইলে ১ম স্বর সমবাদী হইতেছে। ১ম

স্বরকে অর্থাৎ বাদী স্বরকে বা 'ম'কে মেরু ধার্য্য করিয়া আরোহণ করিলে সপ সঙ্গতি পাইতেছি এবং সমবাদী 'স' স্বরকে মেরু ধার্য্য করিয়া আরোহণ করিলে আমরা 'স' ও 'ম' পরস্পরকে সম সঙ্গতি সম্পন্ন পাইতেছি। পুনরায় একই প্রকার পদ্ধতিতে 'ম' বাদী 'স' সমবাদী হইলে আমরা আরোহে সম সঙ্গতি পাইতেছি এবং 'ম' সমবাদী হইলে আমরা 'ম' স্বরকে মেরু করিয়া 'ম' ও 'স' সপ সঙ্গতি পাইতেছি।

আরও কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়বস্তুটির বিশদ-রূপ আলোচনা করিতেছি যাহাতে বিষয়টি আরও সহজবোধ্য হইতে পারে। 'স' স্বরকে মেরু রূপে ধার্য্য করিলে আমরা সঋরজ্ঞগমহ্মপদধণন এই প্রকার স্বরসমূহ পাই। এই মেরুতে 'স' স্বর বাদী ধার্য্য করা হইয়া থাকিলে 'সগপ' কিংবা 'সজ্ঞপ' এই দুই প্রকৃতির যে কোনও এক প্রকৃতির মাতৃকা পাইবই। এই ক্ষেত্রেও ১ম স্বর বাদী হইলে ৩য় স্বর সমবাদী কিংবা ৩য় স্বর বাদী হইলে ১ম স্বর সমবাদী হইবে। 'স' বাদী হইলে 'স' স্বরকে মেরু করিয়া আমরা 'প' স্বরকে 'সপ' সঙ্গতিতে পাইতেছি এবং সমবাদী 'প' স্বরকে মেরু করিয়া আরোহে 'স' স্বরকে 'সম' সঙ্গতিতে পাইব। পুনরায় 'প' বাদী এবং 'স' সমবাদী হইলে 'প' স্বরকে মেরু ধার্য্য করিয়া আমরা 'সম' সঙ্গতি এবং 'স' অর্থাৎ সমবাদী স্বরকে মেরু ধার্য্য করিলে 'স' ও 'প' পরস্পর 'সপ' সঙ্গতি ভাবাপন্ন পাইতেছি। আমরা এইরূপ একই প্রথায় নিয়মানুগ রীতিতে বাদী সমবাদীর সম্বন্ধ কত সরল উপায়ে ধার্য্য করিতে পারিতেছি। এই প্রকার রীতিতে বিকৃত স্বর ব্যবহৃত হইতেছে বা না হইতেছে তাহার কোনও রূপ বিচারের প্রয়োজন নাই। বিকৃত স্বরের মাতৃকা হইতেও আমরা একই রূপে বিচার করিতে পারিব। আরও একটি উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতেছে, যথা—জ্ঞপণ এই মাতৃকায়

'জ্ঞ' বাদী 'ণ' সমবাদী 'সপ' অর্থাৎ 'জ্ঞ'কে মেরু করিয়া 'ণ' স্বর যাহা মেরুর ৮ম স্বর তাহা 'সপ' সঙ্গতি সম্পন্ন। এখন 'ণ' স্বর বাদী ও 'জ্ঞ' স্বর সমবাদী হইলে 'ণজ্ঞ' = 'সম' সঙ্গতি সম্পন্ন। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, স্বরদ্বয় আরোহে 'সপ' সঙ্গতি সম্পন্ন এবং অবরোহে 'সম' সঙ্গতি সম্পন্ন হইতেছে,—যথা—'ম'ও'স' = 'সপ', 'স'ও'ম' = 'সম','স'ও'প' = 'সপ', 'প'ও'স' = 'সম', 'জ্ঞ' ও 'ণ' = 'সপ', এবং 'ণ'ও'জ্ঞ' = 'সম' ভাবাপন্ন।

বাদী স্বরের পার্থক্যে রাগরাগিণীর নামেরও পার্থক্য ঘটিবে ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। 'বাদী ভেদে রাগ ভেদ' এই স্বল্প কয়েকটি শব্দ সব সময়ে মনে রাখিতে হইবে। মাতৃকার মাধ্যমে বাদী সমবাদী নিরূপণ করিবার রীতি, এইরূপ যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে করা সম্ভব। প্রাচীন মনীষীগণের 'সপ' ও 'সম' সঙ্গতির প্রয়োগ-রীতির তাৎপর্য্যও ইহাতে রক্ষিত। স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব কিংবা সম্পূর্ণ, যে কোনও জাতিরই রাগরাগিণী হউক না কেন মাতৃকার সাহায্যে একই রীতিতে সব জাতিরই বিচার করা যাইবে। বাদীর পরিবর্ত্তনে রাগের বা রাগিণীর রূপের কিরূপে পরিবর্ত্তন হয় তাহা পরে আলোচিত হইবে।

মাতৃকার সাহায্যেই অনুবাদী এবং বিবাদী স্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। ইহাও বাদী সমবাদীর বিচারের ন্যায় ধারাবাহিকতা সম্পন্ন। সগপ—গপন এইটি এক জোড়া মাতৃকা। বাদী 'স' হইলে সমবাদী 'প', বাদী 'প' হইলে সমবাদী 'স', বাদী 'গ' হইলে সমবাদী 'ন' এবং বাদী 'ন' হইলে সমবাদী 'গ' হইবে। ইহা কি প্রকারে হইবে তাহা বাদী সমবাদীর আলোচনায় বলা হইয়াছে। এখন যে মাতৃকা হইতে আমরা 'স' বাদী এবং 'প' সমবাদী পাইতেছি সেই মাতৃকার মধ্যবর্ত্তী 'গ' স্বরটি উভয় ক্ষেত্রেই অনুবাদী হইবে। অনুরূপ ভাবে গপন এই মাতৃকায় অবস্থিত বাদী সমবাদী স্বর

দুইটি ধার্য্য করিবার পর 'প' স্বরটি উভয় ক্ষেত্রেই অনুবাদী হইবে। এই প্রথায় মাতৃকার মধ্যবর্ত্তী স্বরটি সকল সময়েই অনুবাদী হইবে। মধ্যবর্ত্তী স্বরটি অনুবাদী স্বর হওয়ার সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হইতেছে যে, যদি একই স্বরের মাতৃকা এবং তাহার স্বাভাবিক জোড়-মাতৃকা হইতে কোনও রাগরাগিণী সৃষ্ট হয় তবে রূপ প্রকাশ-কালে সহজেই রাগরাগিণীর রূপের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা যাইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সগপ মাতৃকায় 'স' বাদী কিংবা 'প' বাদী যাহাই হউক না কেন, আমরা 'গ' অনুবাদী পাইব উভয় ক্ষেত্রেই। এখন 'গ'কে অনুবাদী স্বর হিসাবে ব্যবহার করিলে জোড় মাতৃকার অর্থাৎ গপন মাতৃকার 'গ' স্বরটি কোনও সময়ের জন্যই বাদী সমবাদীর স্থান অধিকার করিতে পারিবে না, ফলে যে রাগটি প্রকাশ করা হইতেছে তাহার রূপের কোনও হানিও ঘটিবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে সগপ অর্থাৎ পুংভাবাপন্ন মাতৃকা কোনও স্বর সমাবেশে বলবান হইলে তাহা রাগ নামে খ্যাত হইতেছে, এবং গপন প্রধান মাতৃকার স্বর সমাবেশকে রাগিণী বলা হইতেছে। 'গ' স্বর অনুবাদী ধার্য্য করার ফলে ঐ স্বর বাদী, সমবাদীর স্থান অধিকার করিতেছে না। সেইজন্য রাগটি শুদ্ধরূপে প্রকাশ করা সম্ভব এবং সহজ হইতেছে।

মাতৃকার মাধ্যমে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে আমরা বিবাদী স্বর নির্দ্ধারণ করিবার রীতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতেছি। মাতৃকা সগপ এবং জোড় গপন হইতে আমরা 'স' বাদী, 'প' সমবাদী ; 'প' বাদী, 'স' সমবাদী এবং উভয় ক্ষেত্রেই 'গ' অনুবাদী পাইয়াছি। আমরা উভয় মাতৃকায় ব্যবহৃত চারিটি স্বরের মধ্যে তিনটি স্বরের উপর তিনটি গুণাবলী আরোপ করিয়াছি। কেবল মাত্র 'ন' স্বরটির সম্বন্ধে কোনরূপ গুণ আরোপ করি নাই। গপন মাতৃকায় আমরা 'গ' বাদী, 'ন' সমবাদী, 'ন' বাদী, 'গ' সমবাদী এবং উভয় ক্ষেত্রেই

আমরা 'প' অনুবাদী পাইতেছি। এই ক্ষেত্রেও 'স' স্বরটির কোনও গুণ পাই না। এখন এই 'ন' স্বর এবং 'স' স্বর পরস্পর বিবাদী স্বর। ইহা কিরূপ তাহা উদাহরণ দ্বারা বুঝান হইতেছে। ধরা যাউক—স ২০, গ ১০, প ১২, ন ৮। সগপ = ৪২, গপন = ৩০, এই প্রকৃতির মাতৃকা হইতে প্রাপ্ত স্বর সমাবেশকে আমরা রাগ বলিব। এখন 'ন' স্বর যদি ৮ না হইয়া ১৮ হইত তবে আমরা গপন = ৪০ পাইতাম। তখন স্বর সমাবেশটিকে আর রাগ বলা যুক্তিযুক্ত হইত না। অন্ত্যজ প্রকৃতির স্ত্রীভাবাপন্ন রাগ বলা হইত। কেন তাহা বলা হইত? সগপ মাতৃকার মধ্যেই বাদী, সমবাদী এবং অনুবাদী থাকা উচিত কিন্তু তাহা কি আমরা পাইলাম? না পাই নাই, কারণ 'স' বাদী এবং বল হিসাবে 'ন' সমবাদী হইতেছে এবং রাগের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়া দিতেছে এই জন্য এই স্বরটি বিবাদী স্বর। যদি স২০, গ২০, প২০ এবং ন৮ হইত তখন আমরা সগপ ৬০, গপন ৪৮, পাইতাম এবং আমরা এই স্বরসমাবেশকে শুদ্ধ রাগই বলিতে পারিতাম। বাদী 'প' কিংবা 'স' যাহাই হউক কিংবা রাগের নাম যাহাই ধার্য্য করা হউক তাহাকে আমরা রাগই বলিতাম। অনুরূপ ভাবে গপন মাতৃকার সহিত 'স' স্বরটির বিবাদ। এখন দেখা যাইতেছে মাতৃকার ১ম স্বরের সহিত জোড়মাতৃকার ৩য় স্বরের সকল সময়েই বিবাদীর সম্বন্ধ। অনুরূপ প্রকারে জোড়মাতৃকার ৩য় স্বরের সহিত মাতৃকার ১ম স্বরেরও বিবাদীর সম্বন্ধ। আমরা মাতৃকার সাহায্যে কি প্রকারে বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, বিবাদী স্বর ধার্য্য করিতে পারি তাহার পরিচয় জানিলাম। এই প্রকার সরল এবং সহজ রীতিতে বাদী, সমবাদী ইত্যাদি ধার্য্য করিবার রীতি কাহারও দ্বারা রচনা করা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। এই প্রকার রীতিতে বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, বিবাদী প্রভৃতি স্বর ধার্য্য করিলে রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা যাইবে

এবং মতামতেরও কোন অবকাশ থাকিবে না। পণ্ডিত ও শিল্পীদিগের বিভিন্ন মতামতের জন্যই আজ সংগীতশাস্ত্রের এই জটিলতা। পুরাকালের মনীষীরা স্রষ্টা এবং রচয়িতা। তাঁহারা কোনও বিষয়ই বিশেষরূপে চিন্তা না করিয়া রচনা করেন নাই একথা আমরা নিশ্চয়ই মনে করিতে পারি। আমাদের অজ্ঞানতা এবং অহংকারই সংগীতশাস্ত্রকে এত জটিল করিয়া তুলিয়াছে এবং এখনও নিজ নিজ প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য আরও জটিলতর করিতেছে।

এখন, উদাত্তাদি স্বর সম্বন্ধে প্রাচীন এবং মধ্যযুগের মনীষীদিগের মতামতের, পুনরায়, আলোচনা করিতেছি। অধিকাংশ ব্যক্তি 'প', 'ম' ও 'স'-কে উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত বলিয়াছেন। 'ম' স্বর অর্থাৎ মধ্যমকে তাঁহারা স্বয়ম্ভুঃ বলিয়াছেন। স্বয়ম্ভুঃ অর্থে—যাহা আপনি সৃষ্ট। মধ্যম স্বরকে সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। 'প্রণব' ধ্বনিই কেবলমাত্র সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল এবং এই-জন্যই এই ধ্বনিকে সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণবিশিষ্ট বলিতে পারি। ইহা ন্যায়শাস্ত্রের মত।

উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত অর্থে প্রাচীন মনীষীরা যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়াছি। উচ্চারণস্থান সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামতও আমরা জানিয়াছি।

বর্ত্তমানে আমরা সাংগীতিক অনুপাত হইতে অর্থাৎ ৪ : ৫ : ৬ এই সম্বন্ধ হইতে 'প', 'ম', ও 'স' এই তিনটি স্বর পাই নাই। আমার মতে এই তিনটি স্বর উদাত্তাদি আখ্যা পাইবার যোগ্য নহে। যে তিনটি স্বর সাহায্যে প্রাচীন যুগের এবং বৈদিক যুগের মনীষীরা এত বিশাল সংগীতশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন তাহার কোনও গাণিতিক মর্য্যাদা নাই ইহা আমার কেন, কাহারও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। আমরা 'স', 'গ', 'প' এই তিনটি স্বর দ্বারা যেরূপে

ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন গুণাবলীর বিচার করিয়াছি, 'প', 'ম' ও 'স' কিংবা 'স', 'ম' ও 'প' এই তিন স্বর দ্বারা কিছুতেই সেইরূপ বিচার করা সম্ভব নহে। এইজন্যই আমরা 'প', 'ম', ও 'স'-কে উদাত্তাদি স্বর কিছুতেই বলিতে পারি না। উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত বলার মর্য্যাদা একমাত্র 'প', 'গ' ও 'স' পাইতে পারে। এই স্বর তিনটি উদাত্তাদির মর্য্যাদা কেন পাইবে তাহা এই বিশাল সংগীতশাস্ত্রের বিভিন্ন গুণাবলীর বিচারের মাধ্যমেই জানিয়াছি। এই বিশাল সংগীত শাস্ত্রের নানারূপ জটিল তত্ত্বগুলির ধারাবাহিক এবং নিয়মানুগ বিচার এবং মীমাংসা, যে ত্রয়ী স্বরের সাহায্যে করিতে পারা গিয়াছে সেই স্বরত্রয়ই উদাত্তাদি স্বরের মর্য্যাদা পাইবার যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারি।

প্রাচীন মনীষীদের "উচ্চৈরুচ্চারণানুদাত্ত, নীচৈরনুদাত্ত, সমাহারঃ স্বরিত" এই শব্দ কয়টি বিশ্লেষণ করিয়া আমরা কোনও যুক্তিযুক্ত অর্থ করিতে পারি কিনা দেখা যাক। প্রাচীনকালে বিলোমগতির স্বর স্থাপনা যে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ছিল তাহা আমরা নারদীয়শিক্ষার এবং নাট্যশাস্ত্রের শ্রুতির আলোচনা হইতে পাইয়াছি। এই কারণ ব্যতীত আরও একটি কারণে আমরা এই বিলোমগতির স্বরনির্ম্মাণ প্রণালীকে সুসংযত এবং সুবিবেচনা প্রসূত মনে করিতে পারি। ন্যায়শাস্ত্র হইতে আমরা জানিয়াছি যে, নাভি হইতে উৎপন্ন বায়ু আমাদের দেহের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করিয়া ধ্বনির সৃষ্টি করে। আমরা ১ সেঃ কোন স্বর উচ্চারণ করিতে যতখানি বায়ু ব্যয় করি, যদি সেই স্বরকে উচ্চারণ করিতে ১ মিনিট পর্য্যন্ত সময় ব্যয় করিতে হয় তখনই আমাদের দেহ মধ্যস্থিত বায়ু ক্রমশই কমিতে কমিতে ফুরাইয়া আসিবে এবং বায়ু নিঃশেষিত হওয়ার কারণে উচ্চারিত স্বরও ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। আমাদের নাভি হইতে উত্থিত বায়ু দেহের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করিয়া যে কম্পনের সৃষ্টি করে

তাহা হইতে স্বর যতখানি উচ্চ করিয়া উচ্চারণ করা যাইবে, কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত উচ্চারণকালকে একভাবে স্থায়ী করিলে দেহ-মধ্যস্থিত বায়ু ব্যয়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কম্পনের বেগও কমিয়া যাইবে এবং উচ্চারিত শব্দও ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইবে। বৈদিক যুগে মনে হয় এইজন্যই স্বরের গতি উপর হইতে নীচের দিকে করা হইয়াছিল। যদি আমরা প্রথম উচ্চারিত ধ্বনিকে উদাত্ত বলি নিশ্চয়ই তাহা ভুল বলা হইবে না এবং ঐ শব্দ, কিয়ৎকাল পরে বায়ু ব্যয়িত হওয়ার কারণে, পূর্ব্বাপেক্ষা ধীরে ধীরে মৃদু হইবে। উদাত্ত অপেক্ষা মৃদু স্বরই অনুদাত্ত আখ্যা পাইবে। সর্ব্বশেষ বায়ু যে স্থানে বা স্বরে নিঃশেষে শেষ হইয়া যাইবে তৎকালোচ্চারিত স্বরই স্বরিত নামে অভিহিত হইবে। এই স্থলে সমাহারঃ অর্থে বায়ু যে স্থানে কিংবা শব্দ যে স্থানে শেষ হইয়াছে মনে হয় এইরূপ অর্থই সমীচীন। আমরা বর্ত্তমানের অনুলোমগতির স্বরসমূহকে ৪ : ৫ : ৬ এই অনুপাতের মাধ্যমে বিচার করিয়া 'স', 'গ' ও 'প' এই তিনটি স্বরকে সাংগীতিক সহজ মিলে পাইয়াছি। এই তিনটি স্বরকে যদি আমরা উচ্চ দিক হইতে নীচের দিক পর্য্যন্ত উচ্চারণ করি অর্থাৎ বেশী কম্পনযুক্ত স্বরকে প্রথমে, তাহা অপেক্ষা অল্প কম্পনযুক্ত স্বরকে তৎপরে, এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম কম্পনের স্বরকে সর্ব্বশেষে উচ্চারণ করিতে চাই তবে আমরা 'স', 'গ' ও 'প' এই তিন স্বরের কম্পনসংখ্যার অনুপাতে প্রথমে 'প', তৎপর 'গ' এবং সর্ব্বশেষে 'স' স্বরকেই উচ্চারণ করিব। এখন আমরা 'প'-কে উদাত্ত, 'গ'-কে অনুদাত্ত এবং 'স' কে স্বরিত বলিতে পারি। 'স' স্বর হইতে অপর ছয়টি স্বরের উৎপত্তি, প্রাচীন মনীষীরা এইজন্যই "ষট্ জায়ন্তে যস্মাৎ" এই কথা বলিয়াছেন। আমরা জানিয়াছি যে, 'স' স্বরের সহিত অপর ছয়টি স্বরের কিছু কিছু মিল আছে। 'প' ও 'গ' স্বরের সহিত 'স' স্বরের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মিল, যাহা আমরা

অনুপাতের সাহায্যে জানিয়াছি। এই তিনটি স্বরের সাহায্যেই সংগীতশাস্ত্রের বিভিন্ন দোষগুণের নির্ভুল বিচার করা সম্ভব হইয়াছে এবং স্বর তিনটির সংগীতশাস্ত্রে কতখানি মর্য্যাদা তাহা জানা গিয়াছে। এইজন্যই আমার বিশ্বাস এবং মত যে, 'প', 'গ' ও 'স'ই প্রাচীনকালের উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত নামে কথিত সেই তিনটি স্বর।

ঠাট অথবা মেল কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। মধ্যযুগের পণ্ডিতগণ মেল বা ঠাট সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তাঁহাদের মতামত লিখিয়াছেন। আমরা ঠাট, ১৫শ শতাব্দীতে "স্বরমেল কলানিধি" প্রণেতা 'রামামাত্যে'র পুস্তকেই প্রথম পাইয়াছি। তিনি ২০টি মেল বা ঠাট রচনা করিয়াছিলেন। ১৬শ শতাব্দীতে 'বেঙ্কটমুখী' ৭২টি মেল বা ঠাট রচনা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। কথিত আছে 'বেঙ্কটমুখী'র সময় তিনি ১৯টি মাত্র ঠাটের ইতিহাস পাইয়াছিলেন। তৎকালীন প্রয়োজনানুসারে তিনি ৭২টি ঠাট রচনার উপকারিতা অনুভব করিয়াছিলেন। ১৯শ শতাব্দীতে শ্রীবিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে ৭২টি ঠাটকে ১০টি ঠাটে পর্য্যবসিত করিলেন। অধুনা সংগীতে এই মতের কিছু প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এই অধুনা প্রচলিত ১০টি মেল বা ঠাটের আলোচনা করিতেছি।

ঠাট বা মেল সম্বন্ধে বলা যায় যে যাহার দ্বারা রাগরাগিণীর গোষ্ঠীর স্বরসমাবেশকে বিশেষ রূপের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায় তাহাই মেল বা ঠাট। বর্ত্তমানে আমরা যে ১০টি ঠাট পাইয়া থাকি তাহাই আলোচনার বিষয়। প্রথমে বলা হইয়াছে আমরা বেলাবল, খাম্বাজ, কল্যাণ, কাফি, ভৈরব, আশাবরী, পূরবী, মারোয়া, ভৈরবী ও টৌড়ি নামধারী ১০টি ঠাট পাইয়াছি এবং প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ রূপে ব্যবহৃত স্বরসমূহের কথা উল্লেখ করিয়াছি।

এখন আমরা ঠাটের সংখ্যা কত হইতে পারে তাহারই আলোচনা করিতেছি। ১০টি, ৭২টি, কিংবা আরও বেশী ঠাটের প্রয়োজন আছে কিনা (বর্ত্তমানের রাগরাগিণীর স্বরসমাবেশগুলিকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করিতে) ইহা তাহারই সমালোচনা। মনে হয় প্রাচীন যুগের রাগরাগিণীর সংখ্যার অনুপাতে অধুনা রাগরাগিণীর সংখ্যা আমরা অনেক অধিক পাই কি পাই না তাহা আলোচনার বস্তু নহে, যাহা প্রচলিত পাইতেছি তাহার দ্বারাই বিচার করিয়া দেখিতেছি যে ঠাট বা মেলের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় নাই। ৭২টি মেলই যথেষ্ট নহে, তাহা হইতে সংখ্যা আরও কমাইয়া ১০টি ঠাট মাত্র প্রচলিত করা কতটা যুক্তি-যুক্ত তাহা বিচার্য্য। বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগে আমরা রাগ রাগিণীর সংখ্যা কিরূপ পাইয়াছি তাহা বলিতেছি। ১ম 'ঈশ্বর' মত যাহা 'গন্ধর্ব্ব' বা 'ভরত' মত বলিয়া জানিয়াছি তাহাতে আমরা ৬ রাগ এবং ৩৬ রাগিণী পাইয়াছি। তৎপরে 'হনুমন্' মতে ৬ রাগ, ৩০ রাগিণী, ৩৬টি পুত্র, ৩৬টি পুত্রবধূ, ৩৬টি পুত্রসখা, ৩৬টি পুত্রসখি পাইয়াছি। এই দুইটি মত ব্যতিরেকে 'নারদ সংহিতা'র মতে ৬ রাগ, ৩৬ রাগিণী পাইয়াছি। সংগীতরত্নাকরের টীকাকার 'কল্লি-নাথে'র মতে ৬ রাগ ৩০ রাগিণী পাইয়াছি। 'রাগার্ণবে'র মতে ৬ রাগ ৩০ রাগিণী (পরে ইনি রাগরাগিণীর প্রভেদ নিরূপণ করিতে না পারিয়া ইহাদের প্রভেদ অস্বীকার করিয়াছেন) পাইয়াছি। 'সংগীতনারায়ণ' রচিত 'সংগীতসারে'র মতে রাগরাগিণীর সংখ্যাও প্রায় ৫৫টি। 'ভরত', 'নারদ', 'মতঙ্গ', 'মাণ্ডুকী', 'দত্তিল' ইহারা পৌরাণিক যুগের। ভরতের মত হইতে আমরা ১৮ প্রকার জাতি হইতে ৩৬টি রাগরাগিণী পাইয়াছি। মতঙ্গের মতে ৭৩টি গ্রামরাগ বা ভাষারাগ এবং কিছু কিছু দেশী রাগেরও পরিচয় পাইয়াছি। শার্ঙ্গদেবের সংগীতরত্নাকরের পূর্ব্বে আমরা সংগীতমকরন্দ হইতে

রাগরাগিণীর সংখ্যার কোন উল্লেখ পাই না। সংগীতরত্নাকরে আমরা 'ভাষারাগ', 'বিভাষা রাগ', 'অন্তরভাষা রাগ', 'উপরাগ', 'গ্রামরাগ' ইত্যাদি প্রকারে ২৬৪টি রাগরাগিণীর পরিচয় পাই। এইরূপ প্রচলিত রাগরাগিণীগুলির নামের ও রূপের কিছু কিছু সাদৃশ্যও পাওয়া যায়। এই সকল রাগরাগিণীর রচয়িতা সকলেই ১৫শ শতাব্দীর আগের। বিশুদ্ধতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়া এই সকল রাগরাগিণীগুলিকে ১০টি মেল বা ঠাটের সাহায্যে কিরূপে বিচার করা সম্ভব তাহা বাস্তবিকই বিচার্য্য এবং চিন্তার বিষয়। অধুনা প্রচলিত রাগরাগিণীগুলিকেও শ্রীভাতখণ্ডে প্রবর্ত্তিত ১০টি মেলে কিছুতেই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিচার করা যাইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, অধুনা প্রচলিত খাম্বাজ ঠাটে আরোহণে 'ন' এবং অবরোহণে 'ণ' ব্যবহৃত হয়, 'কল্যাণে'র মেলে বা ঠাটে 'ম', 'হ্ম' ব্যবহৃত হয় অথবা মাত্র 'হ্ম' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনুরূপ প্রকারে আরও রাগরাগিণীও পাওয়া যাইবে মাত্র ১টি বিকৃত স্বর সহযোগে। তাহাদের এই ১০টি ঠাটের মাধ্যমে আমরা কিরূপে বিচার করিব? উদাহরণস্বরূপ বলিতেছি যে মাত্র 'ঋ' প্রয়োগে 'মালন', 'মঙ্গল', 'ধন্যধৈবৎ', মাত্র 'জ্ঞ' প্রয়োগে 'শিবরঞ্জনী', 'শোভাবরী', 'আভোগীকানাড়া', 'রাজেশ্বরী', 'পটদীপ' ইত্যাদি, মাত্র 'দ' প্রয়োগে 'জিলা'। 'জিলা'য় অন্যমতে 'জ্ঞ' ও 'দ', 'দেশী' ও চন্দ্রকৌশের স্বরসমাবেশেও 'জ্ঞ' ও 'দ' পাই, অনুরূপ প্রকারে 'ছায়া', 'পদ্মাবতী', 'শ্রীরঞ্জনী', 'মধুমাধবী', 'কমলরঞ্জনী', 'কলাবতী', 'খাম্বাবতী', ঝিঁঝিট প্রভৃতিতে 'ণ' পাই। 'ভূপাল টোড়ি'তে 'ঋ, জ্ঞ, দ', 'বসন্তমুখারী'তে 'ঋ, দ, ণ' পাই। এইরূপ বিকৃত স্বরসমূহের প্রয়োগে আরও বহু রাগরাগিণীর পরিচয় পাওয়া যাইবে, যাহার উদাহরণ দিতে হইলে মহাভারত অপেক্ষাও বৃহৎ এক গ্রন্থ প্রণীত হইবে, যাহার ইতিহাস এবং সংখ্যা পরে পরিশিষ্টে

উল্লেখ করিয়াছি। এই আলোচনায় বলা বোধহয় অযৌক্তিক হইবে না যে, প্রচলিত যে ১০টি মেল বা ঠাট শ্রীভাতখণ্ডে আমাদের বর্ত্তমান প্রচলিত সংগীতশাস্ত্রকে উপহার দিয়াছেন তাহার দ্বারা সমস্ত রাগরাগিণীগুলির বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ পাওয়া যাইবে না। তিনি বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তির ন্যায় এই অসামঞ্জস্য দেখিয়া তৎক্ষণাৎ একটি শব্দ আবিষ্কার করিয়া সব সমস্যারই একটি নিজমন-তৃপ্তিকর সমাধান করিলেন, যাহার দ্বারা জনসাধারণ বিজ্ঞানসম্মত পন্থা হইতে বঞ্চিত হইলেন; শব্দটি হইতেছে 'রসানুসারী' অর্থাৎ রসের অনুকরণ বা অনুসরণকারী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি কোনও রাগরাগিণীর স্বরসমূহে 'জ্ঞ' ও 'দ' এই দুইটি স্বর প্রযুক্ত হয় কিংবা শুধু 'জ্ঞ' ব্যবহৃত হয় তবে তাহাকে 'জ্ঞণ' ব্যবহৃত রাগের বা রাগিণীর রসের অনুসারী জানিয়া তাঁহার মতে প্রচলিত কাফি ঠাটের অন্তর্গত করিতে হইবে। এখন যদি 'জ্ঞ' ও 'দ' এই দুই স্বর যুক্ত স্বরসমাবেশ পাই তাহাকেও 'আশাবরী' ঠাটের রসানুসারী বলা যাইতে পারে। এই যথেচ্ছা প্রয়োগেই সংগীতের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। ইহার প্রচুর উদাহরণ পরে রাগরাগিণী বিচারকালে দেওয়া যাইবে। পঃ ভাতখণ্ডের আরও গভীর গবেষণা করিয়া এ সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করা উচিত ছিল। তাঁহার পুস্তক হইতে দাক্ষিণাত্য সংগীতের মতামতই বেশী পাওয়া যায়। তিনি সুষ্ঠুরূপে উত্তরভারতীয় প্রাচীন যুগের সংগীতের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া দাক্ষিণাত্য সংগীতকে খাপ খাওয়াইতে পারেন নাই। কোনও বস্তুর বিচার বা সমন্বয় করিতে হইলে তাহার যুক্তি, ধারাবাহিকতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা থাকা চাই। এই প্রকৃতির ঠাট বা মেলের রচনা, প্রচলন এবং প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক এবং ইহার সংশোধন হওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন। বর্ত্তমানে সংগীতের প্রসার এবং প্রচার পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ অধিক।

এই ত্রুটিপূর্ণ মতগুলি যদি অবিলম্বে সংশোধিত না হয় তবে ছাত্র তথা সংগীতানুরাগী জনসমাজের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। পং ভাতখণ্ডে বলিয়াছেন যে, বেঙ্কটমুখী বলিয়াছেন ৭২টি ঠাট রচনার পর আর অধিক কোনও ঠাট রচনার প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের এই ঠাট রচনার মতের সহিত আমি একমত নহি। বিজ্ঞানসম্মত, আইনানুগ এবং ধারাবাহিক পন্থায় যে মেল বা ঠাট রচনা করা যাইবে তাহার সংখ্যা হইবে, ১০টি নয়, ৭২টি নয়, ১০২৪টি। এই ঠাটগুলির সাহায্যে ভারতীয় সংগীতের প্রতিটি রাগরাগিণীর নির্ভুল বিচার করা যাইবে। এই ঠাটগুলির লক্ষণ পরিশিষ্টে আলোচিত হইবে।

আমরা শ্রীভাতখণ্ডের হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি নামক পুস্তক পাঠ করিলেই জানিতে পারিব যে ঠাট রাগ হইতে প্রাচীন অর্থাৎ পূর্ব্বে সৃষ্টি হইয়াছিল। অন্য কোনও পুস্তকে এইরূপ মত পাওয়া যায় কিনা জানি না। ভাতখণ্ডেই হউন কিংবা অন্য যে কেহই হউন না কেন আমার মনে হয় যে, এই মত প্রচার করার উদ্দেশ্য কেবল নিজ প্রাধান্য বিস্তারের ব্যর্থ প্রয়াস। ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়া পরে এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। সাধারণ বিশ্বাসে বা জ্ঞানে আমরা কি প্রকার আলোচনা করিতে পারি তাহারই ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। বিশ্বসৃষ্টির সময় প্রথমে প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছিল না তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ সৃষ্ট হইয়াছিল? মানবের মানবোচিত শিক্ষার প্রয়োজনে গ্রন্থাদি কি মনুষ্যসৃষ্টির পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল? নিশ্চয়ই তাহা হয় নাই। যে যুগে তিনটি মাত্র প্রকৃত স্বরসাহায্যে রাগরাগিণী গীত হইয়াছে, সেই যুগে কি ঠাটের বা মেলের কোন প্রয়োজন ছিল? আমরা সে যুগে ঠাট পাই নাই। বৈদিক যুগের স্বরের অর্থাৎ প্রকৃত স্বরের আলোচনায় এই বিষয় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। এখন ঠাট অর্থে আমরা

কি বুঝি? ১ম—'ইস্ রাগকে ইয়ে ঠাট', এই শব্দ কয়টি মধ্য-ভারতীয় বা উত্তরভারতীয়, অতীতের পণ্ডিতগণের মুখ হইতে শোনা গিয়াছে অথবা তাঁহাদের পুস্তক হইতে জানা গিয়াছে। হয়তো আজও ঐ প্রদেশের ২।৪ জন বৃদ্ধ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে ঠাট সম্বন্ধে ঐরূপ কথা শোনা যায়। এই শব্দ কয়টিতে আমরা ইস্ রাগকে অর্থে এই রাগের, ইয়ে ঠাট অর্থে এই গায়ন-রীতি বা স্বরবিন্যাস মনে করিতে পারি। গায়নরীতি বা গায়ন-শৈলী কাহাকে বলা হয় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গায়নরীতি অর্থাৎ রাগরাগিণীর স্বরসমূহ অলংকারাদির সহযোগে প্রকাশ করা। (প্রকৃত বিচার করিয়া অলংকার প্রয়োগ করা বিশেষ জ্ঞান তথা সাধনাসাপেক্ষ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, প্রকাশযোগ্য স্বর-সমাবেশটি যদি রাগ নামে খ্যাত হয় তবে তাহার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য যাবতীয় পুরুষজাতীয় অলংকার প্রয়োগ করিতে হইবে। যুক্তিস্বরূপ বলা যায় যে, অলংকারগুলির নাম হইতেই আমরা কোন্‌টি স্ত্রীজাতীয় কোন্‌টি পুরুষজাতীয় তাহা জানিতে পারিব। অনুরূপ ভাবে রাগিণীর স্বরসমূহ প্রকাশকালেও আমরা স্ত্রীজাতীয় অলংকার প্রয়োগ করিব)। আমরা ২য় প্রকার অর্থে ঠাট সম্বন্ধে কি জানিতে পারি তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রথম প্রকার অর্থে গায়কী বা গাহিবার রীতি তথা ঢং। দ্বিতীয় প্রকার অর্থে রাগরাগিণীর স্বরালংকারের ভেদনিরূপণ। যেমন আমাদের সমাজে মনুষ্যজাতির ভেদনিরূপণকল্পে আকৃতি ও জাতিভেদ, পুস্তকাদির বিষয়বস্তুর অনুপাতে পুস্তকাদির আকৃতি ও নামভেদ, বস্তুর গুণাবলী হিসাবে রূপ ও নামভেদ, ঠিক এই প্রকার ভেদ রাগরাগিণীর ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। এই বিভেদকে জানার জন্যই ঠাট বা মেল ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শেষোক্ত প্রকার অর্থেই ঠাটকে ব্যবহৃত হইতে দেখিতেছি। এখন আমরা

ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিব রাগ প্রাচীন না ঠাট প্রাচীন।

বৈদিক যুগের আলোচনায় আমরা জানিয়াছি যে, ব্রহ্মা বেদাদি অন্বেষণ করিয়া নারদ, ভরত ইত্যাদিকে সংগীত শিক্ষা দিয়াছিলেন এই বাক্যকে আমরা যুক্তি বা তর্কের খাতিরে প্রবাদবাক্য বলিতে পারি। নারদীয় শিক্ষায় নারদ (২য়-৩য় শ) বৈদিক যুগে স্বর-রাগ, গ্রামরাগ ইত্যাদি নামকরণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বরের বর্ণ ও রাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। স্বরের বর্ণ, যথা—'স' রক্তবর্ণ, 'র' কমলাবর্ণ, 'গ' পীতবর্ণ, 'ম' সবুজ বর্ণ, 'প' নীলবর্ণ, 'ধ' অতিনীল প্রায় কাল, 'ন' বেগুনী বর্ণ। এখন আমরা আচার্য্যগণ, কে কোন্ সময়ের, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়া কোন্ কোন্ অলংকারের তাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাহাই উল্লেখ করিতেছি।

(১) ব্রহ্মা—আনুমানিক (১ম—২য় শতাব্দী)—স্রষ্টা।
(২) 'নারদীয় শিক্ষা' প্রণেতা—শিক্ষাকার নারদ (২য়—৩য় শ) আনুমানিক।
(৩) 'মাণ্ডুকী শিক্ষা' প্রণেতা—টীকাকার মাণ্ডুকী (২য়—৩য় শ) আনুমানিক।
(৪) 'নাট্যশাস্ত্র' প্রণেতা—আচার্য্য ভরত (৩য়—৫ম শ) আনুমানিক।
(৫) 'দত্তিলম্' প্রণেতা—টীকাকার দত্তিল (৩য়—৫ম শ) আনুমানিক।
(৬) 'বৃহদ্দেশী' প্রণেতা—আচার্য্য মতঙ্গ (৭ম—৯ম শ) আনুমানিক।
(৭) 'সংগীতমকরন্দ' প্রণেতা- আচার্য্য নারদ (৭ম—৯ম শ) আনুমানিক।

(৮) 'নারদসংহিতা' প্রণেতা—আচার্য্য নারদ (১০ম—১১শ শ) আনুমানিক।

(৯) 'সংগীতরত্নাকর' প্রণেতা—শার্ঙ্গদেব (শিবপ্রিয়া) (১২শ—১৩শ শ) আনুমানিক।

(১০) 'সংগীতরত্নাকরের টীকা'—টীকাকার সিংহভূপাল (১২শ—১৩শ শ) আনুমানিক।

(১১) 'সংগীতরত্নাকরের টীকা'—টীকাকার কল্লিনাথ (১৫শ—১৬শ শ) আনুমানিক।

(১২) 'স্বরমেল কলানিধি' প্রণেতা—রামামাত্য (১৫শ—১৬শ শ) আনুমানিক।

(১৩) 'চতুর্দ্দণ্ডী প্রকাশিকা' প্রণেতা—বেঙ্কটমুখী (১৬শ—১৭শ শ) আনুমানিক।

(১৪) 'হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতি ক্রমিক পুস্তক' প্রণেতা—শ্রীভাতখণ্ডে (২০শ শ)

এই সময়ের মধ্যে আরও সংগীত পুস্তক পাওয়া যায় কিন্তু বাহুল্যবোধে উল্লেখ করিলাম না। এই পুস্তকগুলিও বহুল প্রচলিত। এই পুস্তকগুলি হইতে আমাদের আলোচনার বিষয় কোন্ কোন্ পুস্তকে কিরূপ পাইয়াছি এবং কাহার কিরূপ চিন্তাধারা তাহার আলোচনা হইতেই আমরা আমাদের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পাইব।

ব্রহ্মা ও শিক্ষাকার নারদের বিষয় আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। উপরোক্ত নারদীয় শিক্ষা এবং মাণ্ডুকী শিক্ষা নামক পুস্তক ছুইখানি ছাপার অক্ষরে পাওয়া যায় না। কাশী এবং বরোদায় হস্তলিখিত পুঁথি ছুইখানি, যাহা কাশী সংস্করণ এবং বরোদা সংস্করণ রূপে পাওয়া যায় তাহা আমরা আজও পাইতে পারি। অন্যান্য পুস্তকগুলি আমরা ছাপার অক্ষরেই পাইব। বহু পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তিরা এই সমস্ত পুস্তকাদি হইতে বহু গবেষণা-

মূলক আলোচনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। অতীতে যাঁহারা এই সমস্ত পুস্তক আলোচনা করিয়া তৎসংক্রান্ত বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাও পরস্পর মতবিরোধী। আমরা প্রতিটি পুস্তক হইতে সংগীতের কোন্ কোন্ রূপের এবং গুণের পরিচয় পাইয়াছি তাহার উল্লেখ করিতেছি।

আলোচনার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি। নারদীয় শিক্ষা এবং মাণ্ডুকী শিক্ষা হইতে আমরা ষড়জ গ্রাম, গান্ধার গ্রাম এবং মধ্যম গ্রাম অর্থাৎ এক একটি গ্রাম বলিতে আমরা এক এক-প্রকার সপ্তক জানিয়াছি। ইহা ব্যতিরেকেও জাতিরাগ, স্বররাগ, (কোন কোন পুস্তক রচয়িতার মতে জাতিরাগকেই জাতিস্বররাগ বলা হইয়াছে), গ্রামরাগ এবং কিছু কিছু অলংকারপরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে। মেল্ বা ঠাট এই প্রকার কোন শব্দ পাই নাই এবং অন্য কেহ পাইয়াছেন কিনা জানা নাই।

আচার্য্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আমরা একত্রে বাদ্য, নৃত্য ও গীত এই পৃথক পৃথক নামের সহিত পরিচিত হইয়াছি। তিনি গান্ধর্ব্ব গানেরও পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন গান তিন প্রকার অলংকারযোগে গীত হইত। চারি শ্রেণীর গান, ধাতু, অলংকার, শ্রুতির সংখ্যা, নাম ও স্থান তিনি নিরূপিত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ১৮ প্রকার জাতি গান, মধ্যম গ্রাম ও ষড়জ গ্রামের আলোচনা করিয়াছেন। তিনিই জাতির দশ লক্ষণ সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই আমরা মনে করিতে পারি, তাঁহার সময়ে রাগপদ্ধতি উন্নত রূপেই প্রচলিত ছিল। নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার দত্তিলও দত্তিলম্ পুস্তকে শ্রুতির সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। উভয়ের পুস্তকেই মেল বা ঠাট শব্দের কোন নাম ও লক্ষণ পাওয়া যায় না।

শিক্ষাকার নারদ এবং নাট্যাচার্য্য ভরতের যুগের পর পাই

পৌরাণিক যুগের ইতিহাস। রামায়ণ, হরিবংশ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ এই যুগের গ্রন্থ। বৈদিক যুগে সাত স্বর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মূর্চ্ছনা, শ্রুতি ইত্যাদি অলংকার সহযোগে গানক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়া গানক্রিয়াকে উন্নত করিবার ইতিহাস আমরা জানিয়াছি। রামায়ণের সুরারোপ করিয়াছিলেন নাট্যাচার্য্য ভরত এইরূপই আমরা জানিয়াছি এবং যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে গানক্রিয়া কত উন্নত অবস্থায় সেই সময়ে ছিল তাহা আমরা নিশ্চয় জানিতে পারি।

রামায়ণের যুগের পরই আমরা মহাভারতের যুগ পাই। সেই সময় হইতেই (মনীষীগণ) সাত স্বরের সাহায্যে কিভাবে ছয়টি গ্রাম রাগ, ভিন্ন ভিন্ন রাগরাগিণীর স্বরস্থান নিরূপণ করিয়া অর্থাৎ 'মন্দ্র, মধ্য, তার, সপ্তক ধার্য্য করিয়া, মূর্চ্ছনা ইত্যাদির প্রচলন করিয়াছেন তাহারও ইতিহাস পাইয়াছি। সংগীত সেই যুগে যথেষ্ট সমাদর না পাইলে আমরা বিরাট রাজকন্যা 'উত্তরা'কে সংগীত শিক্ষা দিবার বিষয় জানিতে পারিতাম না। ইহা হইতেই আমরা তৎকালে সংগীতের সমাদর এবং প্রচার কিরূপ ছিল তাহা জানিতে পারি।

হরিবংশ পুরাণেও আমরা গান, উদ্গান, সামগান প্রভৃতি যজ্ঞকালে উদ্গাতৃ কর্ত্তৃক গীত হইত তাহার প্রমাণ পাই।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে আমরা ৭ স্বর, ৫ প্রকার গ্রামরাগ, শুদ্ধাদি ৫ প্রকারের জাতি, মূর্চ্ছনা, ৪৯ প্রকার তাল, ৪ প্রকার পদ বা তুক, ৩ প্রকার যতি ইত্যাদির পরিচয় পাইয়াছি।

বায়ুপুরাণে ৭ স্বর, ৩ গ্রাম, ২১ মূর্চ্ছনা, ৪৯ প্রকার তাল এবং শ্রুতির আলোচনার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাইয়াছি।

বায়ুদ্ধর্ম্মপুরাণেও আমরা খুব উন্নত ধরণের সংগীত আলোচনার পরিচয় পাইয়াছি। শ্রুতিগুলির গুণানুসারে নামকরণ ইহাতেও

আমরা পাইয়াছি। (ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বা নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার দত্তিলের প্রণীত দত্তিলম্-এর শ্রুতির নামের সহিত বায়ূদ্ধর্ম্ম-পুরাণের কথিত শ্রুতির নামের যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে।) এই সমস্ত গ্রন্থাদি হইতে আমরা মেল বা ঠাট, এই অলংকারের কথা কোথাও পাই নাই।

'সংগীত মকরন্দ' প্রণেতা নারদ তাঁহার সময়ে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রাগরাগিণীর আলোচনা করিয়াছিলেন এইরূপ ইতিহাস পাওয়া যায়। তিনি রাগ ও রাগিণীর পৃথক পৃথক রূপের আলোচনা করিয়া এই দুইটি শব্দ পৃথক পৃথক রূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি কিরূপ গুণাবলী অথবা কোন্ রূপের দ্বারা রাগ ও রাগিণীর পার্থক্য নিরূপণ করা যাইবে তাহার পরিচয় দেন নাই। ইনি তিন গ্রামের অর্থাৎ মধ্যম, গান্ধার ও ষড়্জ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। মেল বা ঠাট শব্দ ইঁহার সময়ও পাই নাই।

ইহার পর 'বৃহদ্দেশী' প্রণেতা মতঙ্গও রাগরাগিণী সম্বন্ধে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে দেশী সংগীতই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই সমস্ত রচনা, গবেষণা ইত্যাদি হইতে আমরা নিশ্চয়ই মনে করিতে পারি যে রাগরাগিণী সেই সময়ও প্রচলিত ছিল। ইহারা কেহই ঠাট বা মেল শব্দটির সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই।

মতঙ্গের পর আমরা পাই শার্ঙ্গদেবের রত্নাকরের যুগ। তিনি সংগীতরত্নাকরে ভিন্ন ভিন্ন নামে ও রূপে ২৬৪টি রাগ, তাহাদের নাম ও গুণাবলী সমেত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

'নারদসংহিতা' প্রণেতা নারদও রাগ এবং রাগিণীর সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। আমরা ২য় শতক হইতে ১৩শ শতক পর্য্যন্ত রচিত কোনও পুস্তকেই মেল বা ঠাট শব্দটির

ব্যাখ্যা বা আলোচনা তো দূরের কথা তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত পাই নাই।

ঠাট বা মেল শব্দটি ১৫শ শতাব্দীতে 'স্বরমেল কলানিধি' প্রণেতা রামামাত্যের সময়ে আমরা প্রথম জানিতে পারিয়াছি। সংগীত-পারিজাত পুস্তকেও (১৬শ-১৭শ) আমরা মেল বা ঠাট শব্দটি পাইয়াছি। বিদ্যারণ্য নামক কোন এক মুনি (যাঁহার অন্য পরিচয় অজ্ঞাত) ২০টি মেল রচনা করিয়াছিলেন এইরূপ মত পাওয়া যায়। ইহার পর 'চতুর্দ্দণ্ডী প্রকাশিকা' প্রণেতা বেঙ্কটমুখী কর্ত্তৃক ৭২টি ঠাট রচনার ইতিহাস আমরা জানিয়াছি, যাহা অদ্যাবধি দাক্ষিণাত্যের সংগীতে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার পর বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে ১০টি ঠাট প্রবর্তিত করিয়া 'স্বরমেল কলানিধি' প্রণেতা রামামাত্যের এবং "'চতুর্দ্দণ্ডী প্রকাশিকা' প্রণেতা বেঙ্কটমুখীর মত উল্লেখ করিয়াছেন।

আমরা শ্রুতি, গ্রাম, জাতি, তান, তাল, মূর্চ্ছনা, পদ, গ্রহ, অংশ, ন্যাস, পদ বা তুক্, অলংকার ও তাহার সংখ্যা, বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, বিবাদী, বর্জ্জিত, মার্গ প্রকরণ অর্থাৎ মন্দ্র, মধ্য ও তার, রাগরাগিণীর লক্ষণ, অনুলোম, বিলোম, নামপ্রকরণ ইত্যাদি পাইয়াছি কিন্তু মেল বা ঠাট শব্দটি ১৫শ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোথাও পাই নাই। যাঁহাদের সময় সংগীতের এই প্রচার, প্রসার, অনুশীলন, গবেষণা ইত্যাদি এত উন্নত পর্য্যায়ের ছিল তাঁহারা মেল বা ঠাট শব্দটি যদি সেই সময়ে সৃষ্টি করিতেন তবে নিশ্চয়ই কেহ কেহ ইহার পরিচয় ও গুণাবলী ইত্যাদি ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থিগণের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেন। আমরা নিশ্চয়ই মনে করিতে পারি যে, মেল বা ঠাট ১৫শ শতাব্দীতেই রামামাত্য কর্ত্তৃক রচিত এবং এই সৃষ্টি সংগীতসম্পদের আরও একটি অলংকার বিশেষ। আমরা এই আলোচনাগুলি হইতে মনে করিতে পারি যে, রাগ ঠাট অপেক্ষা বহু প্রাচীন। ঠাট সৃষ্টি হওয়ার বহু পূর্ব্বেই অর্থাৎ যে সময়ে মানুষের

মনে সংগীতের প্রথম অনুভূতির বা চিন্তার উদয় ঠিক সেই সময় হইতেই রাগের সৃষ্টি। আমরা আরও মনে করিতে পারি যে, যখন বহু রাগরাগিণী সৃষ্ট হইয়া গিয়াছিল তখন রাগরাগিণীর দল বা গোষ্ঠী নিরূপণ করিবার চিন্তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং এই চিন্তার ফলেই মেল বা ঠাটের উৎপত্তি। রাগের ঠাট হইতে উৎপত্তি ইহা বিকৃত চিন্তা। এক মতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কোন রাগ সম্বন্ধে গায়কীর রীতির কথা না বলিতেছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঠাট শব্দটির উৎপত্তির কথা মনেই আনিতে পারি না। এই বিষয়ের পূর্ব্বেই আলোচনা হইয়াছে। অন্যান্য পুস্তকের কথা না বলিয়া শুধু রত্নাকরের কথা বলাই যথেষ্ট। তিনি রাগাধ্যায়ে, বাদ্যাধ্যায়ে এবং তালাধ্যায়ে তাঁহার গ্রন্থে সংগীতের বিশেষ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মেল বা ঠাট সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা তাঁহার পুস্তকে পাওয়া যায় নাই। সেই সময় তাঁহারও এই মেল বা ঠাট শব্দটির গুণাবলী সম্বন্ধে হয়তো সম্যক চিন্তার অভাবহেতু তিনি এই শব্দটির সহিত পরিচিত হইতে পারেন নাই। এই আলোচনা হইতে আমরা নিশ্চয়ই জানিয়াছি যে, রাগ ঠাট অপেক্ষা বহু পূর্ব্বেই সৃষ্ট হইয়াছে।

আমরা মাতৃকার মাধ্যমে, সামিক, স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ যে কোনও জাতির স্বরসমাবেশেরই বিচার করিতে পারিব। স্বরান্তর জাতির 'মালশ্রী'র স্বরসমাবেশের আলোচনার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে পুনরায় বলা যায় যে, মাত্র ৪টি স্বরযুক্ত স্বরান্তর জাতির রাগরাগিণী বর্ত্তমানেও প্রচলিত এবং ৪ ঃ ৫ ঃ ৬ এই সহজ অনুপাতে আমরা একই সপ্তকের মধ্যস্থিত স, গ, প, ন এই ৪টি স্বর 'মালশ্রী'তে পাইতেছি। স্বরসংখ্যা অল্প থাকার কারণেই বিষয়বস্তুটি বুঝিতে অসুবিধা হইবে না। মাতৃকার মূল্য এবং মর্য্যাদা—সংগীতের ধারাবাহিকতা এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা

রক্ষা করা। 'মালশ্রী' স্বরসমাবেশের প্রতিটি রূপের বিচারে সেইটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাগরাগিণীর পার্থক্য নির্ণয়ে কিংবা শ্রেণী বিচারে মাতৃকার মূল্য কিরূপ তাহা বিশেষরূপে জানা যাইবে। এই স্বল্প স্বরসমাবেশ দিয়া রচিত 'মালশ্রী'র বিচার করিবার আরও একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে যে, অধুনা প্রায়শই গায়কী বা ঘরোয়ানার দোহাই দিয়া একের উপর অন্যের মিথ্যা প্রাধান্য বিস্তারের হীন চেষ্টা কতখানি অজ্ঞতার পরিচায়ক এবং ভিত্তিহীন তাহাই এই মাতৃকার সাহায্যে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইবে।

স্বরসমাবেশগুলির অনুশীলন করিলেই জানা যাইবে যে, ব্যবহৃত স্বরসমূহের মধ্য হইতেই কোনও ১টি মাত্র স্বরের বহু বা অল্প প্রয়োগেই কতগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির রাগরাগিণীর সৃষ্টি হইতে পারে। এক্ষণে যদি গায়কীর বা ঘরোয়ানার দোহাই দিয়া মালশ্রীতে 'র' স্বরটির প্রয়োগ করা হয় তবে আমরা কি তাহাকে 'মালশ্রী' বলিব ? নিশ্চয়ই নহে এবং কেন নহে তাহা পরে জানা যাইবে।

মাতৃকা বিচার কালে আমরা সগপ (পুং)-গপন (স্ত্রী), গপন (স্ত্রী)-পনর (পুং) এই প্রকার মাতৃকা পাইব। আমরা ২টি পুং এবং ২টি স্ত্রী-মাতৃকা পাইতেছি। শ্রেণীবিচারকালে বলিয়াছি যে, শুদ্ধ প্রকৃতির রাগরাগিণীতে ১টি পুং এবং ১টি স্ত্রী-মাতৃকার স্বাভাবিক জোড় থাকিবে অর্থাৎ কোনও মিশ্রণ থাকিবে না। সালঙ্ক শ্রেণীর রাগরাগিণীতে ২টির মিশ্রণ থাকিবে। 'র' স্বরহীন 'মালশ্রী' শুদ্ধশ্রেণীর এবং 'র' যুক্ত 'মালশ্রী' সালঙ্ক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। 'র' স্বরহীন মালশ্রীর জাতি স্বরান্তর এবং 'র' স্বরযুক্ত মালশ্রী ঔড়ব জাতির। এই প্রকার পার্থক্যে নামেরও পার্থক্য হওয়া উচিত। রাগ বা রাগিণীর নাম, রূপ ও

গুণানুসারে পৃথক হইবে বা হওয়া যুক্তিযুক্ত। ধারাবাহিকতা নিয়মানুবর্ত্তিতার সৌষ্ঠব রক্ষার জন্যই নামের পার্থক্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীবিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে প্রণীত হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতি ক্রমিক পুস্তকমালিকা, যাহা আজকাল প্রায় ভারতের প্রতিদেশে প্রামাণ্য গীতিপুস্তকরূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সেই পুস্তকের ৫ম ভাগে লিখিত মালশ্রীর যে সমস্ত স্বরসমাবেশ আমরা গীত-গুলিতে ব্যবহৃত স্বরলিপি হইতে পাইয়াছি তাহা হইতে কয়েকটির আলোচনা এবং বিচার করিতেছি। তিনি উক্ত পুস্তকে তিন প্রকার স্বরসমাবেশ মালশ্রীর পরিচয়ে ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথম প্রকারে 'সগন্ধপন', দ্বিতীয় প্রকারে 'সগপন' এবং তৃতীয় প্রকার 'সরগপ'।

'সগপন' স্বরসমাবেশটির আলোচনা করিতেছি। এই স্বর-সমাবেশটির বিশদ আলোচনা প্রথমেই করিয়াছি। ৪টি স্বর সমন্বিত স্বরসমাবেশকে আমরা স্বরান্তর জাতির সমাবেশ জানিয়াছি। রাগ ও রাগিণীর পার্থক্য নিরূপণকালে সূত্র ও উদাহরণ দ্বারা 'স' বাদী ও 'প' সমবাদী রূপের মালশ্রীকে রাগ আখ্যা দিয়াছি। 'প' বাদী 'স' সমবাদী ঐ প্রকৃতির স্বরসমাবেশকেও রাগ আখ্যা দেওয়া যাইবে কিন্তু মালশ্রী নামে নয়। যদি 'গ' বাদী ও 'ন' সমবাদী এই প্রকৃতির কোনও স্বরসমাবেশে পাই তাহাকে রাগিণী আখ্যা দেওয়া হইবে কিন্তু মালশ্রী নামে নয়। আবার যদি 'ন' বাদী, 'গ' সমবাদী ঐরূপ প্রকৃতির স্বরসমাবেশ পাই তবে তাহাকেও মালশ্রী নামে অভিহিত করা যাইবে না যদিও তাহাকে রাগিণী আখ্যা দেওয়া যাইবে। এই স্বরসমূহের বাদী সমবাদীর সমতা না থাকায় প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক নামে অভিহিত হইবে। উপরোক্ত আলোচ্য স্বরসমাবেশের যদি 'প' বাদী, 'স' সমবাদী

কিংবা 'স' বাদী, 'প' সমবাদী যে কোনও একটিকে মালশ্রী বলা হয় তবে অপরটিকে আর মালশ্রী বলা যাইবে না যদিও তাহার বাদী সমবাদী পুং-মাতৃকাভুক্ত। অনুরূপভাবে 'গ' বাদী, 'ন' সমবাদী কিংবা 'ন' বাদী, 'গ' সমবাদী যে কোনও একটিকেই মালশ্রী রাগিণী বলা যাইবে যদিও উভয়েরই বাদী সমবাদী স্ত্রী-মাতৃকাভুক্ত। এক্ষণে আরও বলা যায় যে, যদি মালশ্রী রাগ হয় তবে অপর তিন প্রকার বাদী সমবাদী সমন্বিত স্বরসমাবেশগুলিকে আর মালশ্রী বলা যাইবে না কিংবা যদি মালশ্রীকে রাগিণী আখ্যা দেওয়া হয় তবে অনুরূপ প্রকারে অপর তিন প্রকার স্বর-সমাবেশকেও আর মালশ্রী বলা যাইবে না। প্রাচীনকালেও যেমন রাগের মধ্যে নানাপ্রকার পার্থক্য পাওয়া গিয়াছে, এই প্রকার বিচারেও আমরা ভিন্ন ভিন্ন পার্থক্য পাইব। পার্থক্য হইবার কারণস্বরূপ বলা যায় যে, স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব কিংবা সম্পূর্ণ যে কোনও জাতির রাগ বা রাগিণী যাহাই হউক না কেন কাহারও সহিত কাহারও রস ও ভাবের সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না। রস ও ভাব একপ্রকৃতিগত না হওয়ার কারণেই রাগরাগিণীর নামের পার্থক্য হইবে।

হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতি ক্রমিক পুস্তকমালিকা, যাহা অধুনা বহুলপ্রচারিত সংগীতপুস্তকরূপে পরিচিত এবং যাহা হইতে বিভিন্ন দেশের বহু ছাত্রছাত্রী সংগীত শিক্ষা ও সংগীতবিষয়ক জ্ঞান অর্জ্জন করিতেছে বা করিবার চেষ্টা করিতেছে, যাহার মাধ্যমে বর্ত্তমান ভারত সরকার সংগীতশিক্ষার মান নির্ণয় করিতেছেন তাহা হইতে মালশ্রীর কয়েক প্রকার রূপের বিচার করিতেছি। স্বরলিপিগুলি পর পর মালশ্রী গানের 'স্থায়ীর'। স্থায়ী অর্থে যেই স্থানে রাগ বা রাগিণীর রূপ পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত বা অবস্থিত। শ্রীভাতখণ্ডে নিজ পদ্ধতি অনুসারে স্বরের সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়া স্বরলিপি

করিয়াছেন। আমি এই স্বরলিপি আকার মাত্রিক পদ্ধতিতে দিতেছি। ১নং সংখ্যা হইতে ৮নং সংখ্যা পর্য্যন্ত স্বরসমাবেশ হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতি ক্রমিক পুস্তকমালিকার। ৯নং এবং ১০নং স্বরসমাবেশ ও স্বরলিপি ২টি আমার গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত। এই স্বরলিপি ২টি অন্য কাহারও নিকট না থাকাই সম্ভব বিবেচনায় স্বরসমাবেশ ২টি সম্পূর্ণরূপে স্বরলিপি করিয়া দিলাম।

উদাহরণ "মালশ্রী"।

(১) স১১, গ১০, ন্ধ৪, প১০, ন২ : স্বরসংখ্যা = ৩৭, মাতৃকাসংখ্যা = ৫৩।
বিচার :—সগপ (পুং) ৩১, গপন (স্ত্রী) ২২ : 'ন্ধ' অলঙ্কার।

(২) স১২, গ১৩, প২২, ন১ : স্বরসংখ্যা = ৪৮, মাতৃকাসংখ্যা = ৮৩।
বিচার :—সগপ (পুং) ৪৭, গপন (স্ত্রী) ৩৬ : অলঙ্কার নাই।

(৩) স১৫, গ১২, ন্ধ১, প১১, ন১ : স্বরসংখ্যা = ৪০, মাতৃকাসংখ্যা = ৬৪।
বিচার :—সগপ (পুং) ৩৮, গপন (স্ত্রী) ২৪ : 'ন্ধ' অলঙ্কার।

(৪) স১৪, র১, গ১০, প১৬ : স্বরসংখ্যা = ৪০, মাতৃকাসংখ্যা = ৪০।
বিচার :—সগপ (পুং) ৪০, স্ত্রীমাতৃকা নাই : 'র' অলঙ্কার (অশুদ্ধ)।

(৫) স১৩, গ৭, ন্ধ১, প১৫, ন১ : স্বরসংখ্যা = ৪০, মাতৃকাসংখ্যা = ৬৪।
বিচার :—সগপ (পুং) ৩৮, গপন (স্ত্রী) ২৬ : 'ন্ধ' অলঙ্কার।

(৬) স১৭, গ৭, ন্ধ৪, প১১, ন২ : স্বরসংখ্যা = ৪১. মাতৃকাসংখ্যা = ৫৫।
বিচার :—সগপ (পুং) ৩৫, গপন (স্ত্রী) ২০ : 'ন্ধ' অলঙ্কার।

(৭) স১৫, গ১২, প১৩, ন১ : স্বরসংখ্যা = ৪১, মাতৃকাসংখ্যা = ৭২।
বিচার :—সগপ (পুং) = ৪৩, গপন (স্ত্রী) = ২৯ : অলঙ্কার নাই।

(৮) স১০, গ১১, ন্ধ৪, প১৭, ন২ : স্বরসংখ্যা = ৪৪, মাতৃকাসংখ্যা = ৬৮।
বিচার :—সগপ (পুং) ৩৮, গপন (স্ত্রী) ৩০ : 'ন্ধ' অলঙ্কার।

২´ ৩ ০ ১
(৯) II সান্‌া সাগা I গা গা গা গা I না পা পা গা I পা গা গা সা I

২´ ৩ ০ ১
গাগা পানা I নানা র্সানা I র্সা র্গা র্সা না I ননা পগা পগা সা II

২´ ৩ ০ ১
(১০) II গাগা সান্‌া I সাগা গাগা I পানা নানা I র্সনা ননা পগা পগা I

২´ ৩ ০ ১
সাগগা গগাপা I পা ননা পগা গগা I পনা ননা ননা পা I র্সনা ননা পগা পগা I

৯নং এবং ১০নং স্বরসমাবেশের উদাহরণ এবং বিচার।

(৯) স৭, গ১১, প৬, ন১০ : স্বরসংখ্যা ৩৪, মাতৃকাসংখ্যা = ৫১।

বিচার :—সগপ (পুং) ২৪, গপন (স্ত্রী) = ২৭ বাদী 'গ', সমবাদী 'ন'।

(১০) স৫, গ১৯, প৭, ন১৬ : স্বরসংখ্যা = ৪৭, মাতৃকাসংখ্যা ৭৩।

বিচার :—সগপ (পুং) ৩১, গপন (স্ত্রী) = ৪২ : বাদী 'গ', সমবাদী 'ন'।

স্বরসমাবেশগুলির সংখ্যা অনুসারে আলোচনা করিতেছি। রাগ মালশ্রীর পরিচয়ে অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রবেশে ৫ম ভাগের ২৬ পৃষ্ঠায় শ্রীভাতখণ্ডে বলিয়াছেন, কল্যাণঠাট, 'র' ও 'ধ' স্বর দুইটি বর্জ্জিত, জাতি ঔড়ব-ঔড়ব, বাদী 'প' সমবাদী 'স'।

আমরা ১নং স্বরসমাবেশটি হইতে বাদী 'স' এবং দুইটি স্বর, 'প' ও 'গ', সমবাদী রূপে পাইতেছি। বাদী সমবাদীর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু একটি বাদী স্বরের দুইটি সমবাদী স্বর পাওয়া যাইতে পারে এমন কোনও শাস্ত্রীয় নজীর আমার জানা নাই। এই কারণে বাদীর সহিত দুইটি সমবাদী স্বর-যুক্ত রাগরাগিণীকে অশুদ্ধ বলিব। শ্রীভাতখণ্ডের কথিত শাস্ত্র-প্রবেশে আমরা 'প' বাদী, 'স' সমবাদী জানিয়াছি কিন্তু স্বরসমাবেশে তাহা পাই নাই। কথিত মত অনুসারে বাদী সমবাদী না পাওয়ায় রসের ও ভাবের পার্থক্য ঘটিতেছে। সেইজন্য এই স্বরসমাবেশটিকে মালশ্রী নামে অভিহিত করা হইবে না। বাদীভেদে রাগভেদ এই তাঁহার নিজেরও মত এবং এই রস ও ভাবের পার্থক্য হওয়ার জন্যই রাগনাম ভিন্ন হইবে। স্বরসমাবেশটির নাম যাহাই দেওয়া যাউক, অন্যান্য গুণাবলীর ব্যাখ্যায় আমরা ইহাকে উত্তম

প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণীর অন্ত্যজ প্রকৃতির ঔড়ব জাতির ১৬ মাত্রার চতুর্মাত্রিক ছন্দে গঠিত রাগরূপে পাইতেছি।

২য় স্বরসমাবেশ হইতে আমরা 'প' বাদী, 'গ' সমবাদী পাইতেছি। পূর্ব্বকথিত সঙ্গতিতে অর্থাৎ সপ সম্বন্ধযুক্ত স্বরসঙ্গতিতে আমরা বাদীর সহিত সমবাদীর সঙ্গতি ধার্য্য করিতে পারি নাই। এই ক্ষেত্রেও রসের ও রূপের পার্থক্য ঘটিতেছে। শাস্ত্র-পরিচয়ে মালশ্রীকে তিনি কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত রাগ বলিয়াছেন কিন্তু ২য় স্বরসমাবেশে, আমরা যাহার মাধ্যমে কল্যাণ ঠাটের পরিচয় পাইয়াছি, সেই 'ম' কিংবা 'ম্ব' স্বর পাইতেছি না। ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক। এইরূপ স্বেচ্ছাচার প্রয়োগেই এই সংগীত-শাস্ত্রের মর্য্যাদা নষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে। স্বরসমাবেশটির অন্যান্য গুণাবলী হইতেও ইহাকে মালশ্রী বলা যায় না। আমরা ইহাকে উত্তম প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণীর অন্ত্যজ প্রকৃতির স্বরান্তর জাতির ১৪ মাত্রার অসমমাত্রিক ছন্দে গঠিত রাগরূপে পাইতেছি। শাস্ত্রে কথিত মালশ্রী ঔড়ব কিন্তু ইহা স্বরান্তর।

৩য় স্বরসমাবেশ হইতেও 'স' বাদী, 'প' ও 'গ' সমবাদী পাইয়াছি। ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার রস ও ভাবের পার্থক্য ঘটিতেছে। অন্যান্য গুণাবলীর ব্যাখ্যায় আমরা ইহাকে উত্তম প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণীর অন্ত্যজ প্রকৃতির ঔড়ব জাতির ১০ মাত্রার অসমমাত্রিক ছন্দে গঠিত রাগরূপে পাইতেছি।

৪র্থ স্বরসমাবেশ হইতে আমরা 'স' বাদী এবং 'প' সমবাদী পাইতেছি। শাস্ত্রলিখিত মতের সহিত ইহার পার্থক্য রহিয়াছে। ইহাতে চারিটি স্বরের ব্যবহার পাইয়াছি। মাতৃকা ১টি মাত্র পাইয়াছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ১টি মাত্র মাতৃকা তাহা পুং-ই হউক কিংবা স্ত্রী-ই হউক, কোনও স্বরসমাবেশে ব্যবহৃত হইলে সেই স্বরসমাবেশকে অশুদ্ধ বলা যাইবে এবং কত প্রকার অশুদ্ধ

রাগরাগিণী পাওয়া যাইবে তাহার সূত্র এবং উদাহরণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রসের অভাবই এই অশুদ্ধতার কারণ। প্রকৃতি ও পুরুষের রসবৈচিত্র্যই ভিন্ন ভিন্ন রসসৃষ্টির সহায়ক। প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনের অভাবজনিত কারণেই রস অসম্পূর্ণ হওয়ায় এই প্রকৃতির রাগরাগিণী অশুদ্ধ হইবে। উক্ত কারণসমূহে এইটিকেও মালশ্রী বলা যাইবে না। 'র' স্বরের বল যদি 'ন' স্বরের বল হইত এবং 'র' স্বর বর্জ্জিত হইয়া 'ন' স্বরটি ব্যবহৃত হইত তবে সগপ =৪০ (পুং) গপন=২৭ (স্ত্রী) এইরূপ মাতৃকা পাইতাম। এই রূপের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমানের সংশোধিত রূপ পাইলেই তাহাকে আমরা কথিত ব্যাকরণমতে উত্তম প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণীর শুদ্ধ প্রকৃতির স্বরান্তর জাতির ১০ মাত্রার সমমাত্রিক ছন্দে গঠিত রাগরূপে পাইতাম।

৫ম স্বরসমাবেশ হইতে আমরা কথিত মতে বাদী 'প' এবং সমবাদী 'স' পাইয়াছি। অন্যান্য গুণাবলী হইতেছে উত্তম প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণীর শুদ্ধ প্রকৃতির ঔড়ব জাতির ১৬ মাত্রার সমমাত্রিক ছন্দে গঠিত রাগ। ইহাই একমাত্র রাগ, কথিত মত মত আমরা পাইয়াছি।

৬ষ্ঠ স্বরসমাবেশ হইতে আমরা 'স' বাদী এবং 'প' সমবাদী পাইয়াছি। অন্যান্য গুণাবলী হইতেছে উত্তম প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণীর শুদ্ধ প্রকৃতির ঔড়ব জাতির ১৬ মাত্রার সমমাত্রিক ছন্দে গঠিত রাগ, যাহার বাদী সমবাদী কথিত মতে না পাওয়ায় মালশ্রী বলা যাইবে না।

৭ম স্বরসমাবেশ হইতে আমরা 'প' বাদী, 'স' সমবাদী পাইতেছি। অন্যান্য গুণাবলী হইতেছে উত্তম প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণীর শুদ্ধ প্রকৃতির স্বরান্তর জাতির সমমাত্রিক ছন্দে ১২ মাত্রায় গঠিত রাগ, যাহার কথিত মতে জাতি পাওয়া যায় নাই বলিয়া মালশ্রী বলা যায় না।

৮ম স্বরসমাবেশের 'প' বাদী এবং 'গ' সমবাদী। কথিত মতে বাদী সমবাদী সপ সম্বন্ধযুক্ত নহে। ইহাই ঘরোয়ানার যথেচ্ছা প্রয়োগ। এইরূপ প্রয়োগ আমরা ১ম স্বরসমাবেশেও পাইয়াছি। এই স্বরসমাবেশে স্ত্রী-মাতৃকার বল কিছু বেশী হওয়ায় এইটি স্ত্রীভাবাপন্ন রাগ হইবে। অন্যান্য গুণাবলী হইতেছে উত্তম প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণীর অন্ত্যজ প্রকৃতির ঔড়ব জাতির স্ত্রীভাবাপন্ন রাগ।

৯ম স্বরসমাবেশে বাদী 'গ'. সমবাদী 'ন'। মাতৃকার অনুপাতে স্ত্রী-মাতৃকা বলবতী। পুং-মাতৃকাও খুব তুর্ব্বল নহে, প্রায় সমবলী। সেই কারণে পুং-মাতৃকার প্রাধান্যও একবারে অস্বীকার করা যাইতেছে না। ইহা উত্তম প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণীর শুদ্ধ প্রকৃতির স্বরান্তর জাতির ১৬ মাত্রার সমমাত্রিক ছন্দে গঠিত পুংভাবাপন্ন রাগিণী।

১০ম স্বরসমাবেশে বাদী 'গ', সমবাদী 'ন'। স্ত্রী-মাতৃকা পুং-মাতৃকা অপেক্ষা যথেষ্ট বলবতী হইয়াছে এবং এই কারণে ইহা রাগিণী হইতেছে। ইহাকে উত্তম প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণীর শুদ্ধ প্রকৃতির স্বরান্তর জাতির ১৬ মাত্রার সমমাত্রিক ছন্দে গঠিত রাগিণী বলিব।

আমরা কথ্য ভাষায় যাহাকে 'বন্দেজ' বলি অর্থাৎ যাহা রাগ-রূপের স্থায়ীভাব, তাহাও আমরা মাতৃকার মাধ্যমেই পাইব। ব্যবহৃত স্বরসমাবেশে, স্বরের সংখ্যার যোগফল অপেক্ষা যদি প্রধান মাতৃকা ও তাহার জোড়ের সংখ্যার সমষ্টি অধিক হয় তবে সেই সমাবেশে আমরা রাগরূপের স্থায়িত্ব অধিক মনে করিব। মাতৃকার এবং জোড়-মাতৃকার সংখ্যাসমষ্টি যত অধিক হইবে রাগরূপও তত অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে। যে স্বরসমাবেশে আমরা এইরূপ মাতৃকা ও তাহার জোড় সংখ্যার প্রাধান্য পাইব সেই স্বর-সমাবেশকেই আমরা উৎকৃষ্ট স্থায়ী রস ভাবাপন্ন জানিব। যেখানে

মাতৃকার সংখ্যা অপেক্ষা স্বরসমূহের সংখ্যা অধিক পাইব সেই ক্ষেত্রেই আমরা স্থায়ীভাবের অভাব জানিব। সেই প্রকার স্বর-সমাবেশ অন্যান্য গুণাবলী দ্বারা পুষ্ট হইলেও তাহা নিকৃষ্ট স্তরের মনে করিতে হইবে।

এখন বিচার্য্য মালশ্রী রাগ না রাগিণী? প্রাচীন ও পৌরাণিক যুগের মনীষীদিগের মতামত কি? ১ম—ঈশ্বর মত, যাহা ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্রহ্মা মত বা গন্ধর্ব্ব মত, অথবা ভরত মত নামে প্রচলিত, সেই মতে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী পাই এবং এই মতে মালশ্রীকে শ্রীরাগের ১মা রাগিণীর পরিচয়ে পাইয়াছি। তাঁহার মতে মালশ্রী সম্পূর্ণজাতীয়া, গ্রহাংশকন্যাস 'স', উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনাযুক্ত।

২য়—হনুমন্ মতে ছয় রাগ, ত্রিশ রাগিণী। এই মতে মালশ্রী, 'শ্রীরাগের তৃতীয়া রাগিণী। ইনি বলিয়াছেন মালশ্রী সম্পূর্ণজাতীয়া, গ্রহাংশকন্যাস 'স', উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনাযুক্তা। সংগীতসারের মতে মালবশ্রী নামে এক রাগ বা রাগিণী পাওয়া যায় সেইটিও সম্পূর্ণ-জাতীয়া, গ্রহাংশকন্যাস 'স'। যাহা ভরত মত বা গন্ধর্ব্ব মত, নারদ মত, কল্লিনাথ মত, হনুমন্ মত, রাগার্ণবের মত অথবা সংগীত-সারের মত, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রত্যেকেই রাগরাগিণীগুলিকে এমনভাবে লিখিয়া গিয়াছেন যে রাগরাগিণী-গুলির নামের ও রূপের পরস্পরের প্রায়ই সাদৃশ্য আছে। ইহাদের সময় হইতেই অর্থাৎ ৭ম ও ৯ম শতাব্দীতে মকরন্দকার প্রণেতা নারদ রাগরাগিণীগুলির পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু অধুনা আমরা সবগুলিকেই রাগ নামে অভিহিত হইতে দেখি। রাগ ও রাগিণীর রসের অনুভূতি এবং রূপের গঠন যাহা আমরা সূত্র ও উদাহরণ দ্বারা বিচার করিয়া পাইয়াছি তাহা নিশ্চয়ই এক নহে। কেহ বা কাহারাও রাগরাগিণীর রূপের পার্থক্য করিবার পদ্ধতি না জানিয়া সবগুলি স্বরসমাবেশকেই রাগ নামে

অভিহিত করিতেছেন ইহা যুক্তিসম্মত নহে বলিয়া মনে করিতে পারি। রস বা ভাবের ব্যতিক্রমে নামের ও রূপের পার্থক্য হইবেই এবং এই কারণেই এক নামে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বরগঠন যুক্তিযুক্ত তথা জ্ঞানবত্তার পরিচায়ক নহে। প্রাচীন যুগের মালশ্রীকে আমরা সম্পূর্ণজাতীয়া বা অন্যান্য গুণাবলীযুক্ত পাইলেও অধুনা আমরা সেই রূপের বিষয় সম্যক পরিচিত নহি, কিন্তু যখন আমরা মালশ্রী নামটি ব্যবহার করিতেছি তখন যতদূর সম্ভব প্রাচীন যুগের প্রয়োগ-রীতির অনুসরণ করাই উচিত বলিয়া মনে করি। বলা যায় যে, সেই যুগের মালশ্রী সম্পূর্ণজাতীয়া, বর্ত্তমান কালে আমরা পাইতেছি স্বরান্তর কিংবা ঔড়বজাতীয়া, কিন্তু ক্ষতি কি? আমরা যদি কোনও রাগকে সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে চাহি তবে আমাদের জানিতে হইবে কোন্ কোন্ অলংকার দ্বারা তাহার পূর্ণ রূপ ও রস উপভোগ করিতে পারিব। প্রাচীন যুগের মনীষীরা মনে হয় এই কারণেই রাগরাগিণীর কল্পনা করিয়াছিলেন। পুরুষপ্রকৃতিভাবাপন্ন স্বর-সমাবেশকে যে রূপের অলঙ্কারে যুক্ত করা যায়, স্ত্রীপ্রকৃতিভাবাপন্ন স্বরসমাবেশকে সেই রূপের অলংকারে যুক্ত করা যায় না। সেই কারণে মালশ্রীকে যখন প্রাচীনেরা রাগিণী আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন এবং আমরাও রাগিণী রূপে পাইতেছি তখন তাহা রাগিণী রূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? যে কোনও স্বর-সমাবেশ বা যে কোনও শ্রেণী কিংবা জাতি যাহাই পাই না তাহাকেই আমরা রাগিণী বলিতে পারি। মালশ্রীকে রাগিণী রূপে চিন্তা করা কিংবা তাহার স্বরবিন্যাস করার অসুবিধা কোথায়? শ্রীভাতখণ্ডে কথিত একটি স্বরবিন্যাসকেও মালশ্রী বলা যাইবে না। শ্রীভাতখণ্ডে রচিত স্বরবিন্যাস যাহা জনসমাজে প্রচলিত তাহার কোন ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় নাই। ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা করিতেছি।

১মটি, যাহা শাস্ত্রমতের বিরোধী, তাহা শুদ্ধ নহে তবে ধারাবাহিকতা রক্ষা না করিয়া দেশী সংগীতের প্রয়োগরীতির কারণে শাস্ত্র অমান্য করিবার যুক্তি গ্রহণ করিলে শুদ্ধাশুদ্ধ কোন প্রশ্নেরই উৎপত্তি হয় না। ২য় ও ৩য় স্বরসমাবেশগুলিও ১ম স্বরসমাবেশের অনুসরণকারী। ৪র্থ স্বরসমাবেশটি রসের ও ভাবের অভাবে সম্পূর্ণ নহে। ৫ম স্বরসমাবেশ শাস্ত্রমতে শুদ্ধ। ৬ষ্ঠ স্বর সমাবেশও শাস্ত্রমতবিরোধী এবং ৭ম ও ৮ম স্বরসমাবেশও শাস্ত্রমতবিরোধী। এই স্থলে শাস্ত্র বলিতে আমি শ্রীভাতখণ্ডে কথিত শাস্ত্রের কথাই বলিতেছি এবং এই ৮টি স্বরসমাবেশও তাঁহার পুস্তক হইতে প্রাপ্ত। তাঁহার কথিত শাস্ত্রমত মানিতে হইলে একমাত্র ৫ম স্বরসমাবেশকেই মালশ্রী বলা যাইবে, অন্যান্য সব কয়টিই ভুল বলিব। হেতুস্বরূপ বলা যায় মালশ্রীর আখ্যায় অভিহিত যে স্বরসমাবেশ, তাহার একই প্রকার রূপ হওয়া চাই। কিন্তু তাঁহার কথিত পুস্তকে কি আমরা একই প্রকৃতির সব মালশ্রী কয়টির রূপগুণ পাইয়াছি? না, তাহা পাই নাই। ইহার কারণ, তাঁহার রাগ বা রাগিণীর পার্থক্য করার পদ্ধতি সম্বন্ধে এবং তথাকথিত রাগরূপের প্রকৃত গুণাবলীর পরিচয় সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাব ছিল, মনে না করিয়া পারি না। প্রাচীন মতের অনুসরণ না করিয়াও বলা যায় যে, ৫ম স্বরবিন্যাস ব্যতিরেকে, অন্যান্য সব কয়টি স্বরবিন্যাস মালশ্রী ব্যতীত অন্য যে কোন রাগের হইতে পারে, তাঁহারই কথিত শাস্ত্র অনুসারে।

এখন ৯ম স্বরসমাবেশকে বিচার করিয়া বলা হইতেছে যে, যদিও ইহা রাগিণী তথাপি পুংভাবাপন্ন হওয়ায় ইহাকেও মালশ্রী রাগিণী বলা যাইবে না। ইহা যদিও আমার ৺গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত তথাপিও ইহাকে ত্রুটিশূন্য বলিতে পারি না। মনে হয় তিনিও তাঁহার ৺গুরুর নিকট হইতে মালশ্রী রাগিণী এই মত

জানিয়া এবং বিশ্বাস করিয়া, বলিষ্ঠ স্বর সংস্থাপন না করিয়া, বাদী সমবাদী যাহা অল্পশ্রুতিসম্পন্ন, স্বরদ্বয়কে ধার্য্য করিয়া রূপ গঠন করিয়াছেন কিংবা তাঁহার ৺গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন। মনে হয় তাঁহার কিংবা তাঁহার ৺গুরুর, যিনিই হউন কাহারও রাগ ও রাগিণী পৃথক করিবার পদ্ধতি জানা ছিল না।

১০ম স্বরসমাবেশটিকে বর্ত্তমানের প্রচলিত স্বরসমন্বয়ে যাহা গঠিত তাহাকেই মালশ্রী নামে অভিহিত করা যাইবে। এই স্বর-সমাবেশটি সম্পূর্ণাঙ্গ অর্থাৎ রস ও ভাবের সমৃদ্ধতায় সমৃদ্ধ। অন্যান্য স্বরসমাবেশগুলি যাহা আমরা মালশ্রী নামে পাইয়াছি তাহাদের সহিত এই ১০ম স্বরসমাবেশটির তুলনা করিলেই পার্থক্য জানা যাইবে।

আমরা এক্ষণে উদাত্তাদি প্রাচীন যুগের স্বরনির্ম্মাণের রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। যাহা আলোচনা করিতেছি পূর্ব্বেও তাহার সম্বন্ধে কিছু-কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এখন সমস্ত বিষয়টি একসঙ্গে বিভিন্ন মতামতের উল্লেখে আলোচিত হইতেছে। প্রাচীন যুগের স্বরের গতি নিম্নাভিমুখী ছিল। সেই বিলোম-গতিতেই প্রয়োগ কারণে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি স্বর নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। আমরা নিশ্চয়ই মনে করিতে পারি যে, উদাত্ত স্বরটি অনুদাত্ত এবং স্বরিত অপেক্ষা তীব্র এবং অনুদাত্ত স্বরটিও স্বরিত অপেক্ষা তীব্র। বর্ত্তমানে আমরা কম্পনসংখ্যার সাহায্যে এই স্বরগুলিকে বিচার করিতে পারি কি না তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। কম্পনসংখ্যার সাহায্যে বিচার করিলে আমরা উদাত্ত স্বরটির কম্পনসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাইব। তৎপরে অনুদাত্তের কম্পনসংখ্যা এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম কম্পনসংখ্যার স্বর হিসাবে পাইব স্বরিতকেই। ইহা, প্রাচীন যুগের বিলোমগতির স্বরনির্ম্মাণের রীতিকে গ্রহণ করিয়া বিচার

দ্বারা ধার্য্য করা হইল। যেহেতু আমরা বর্ত্তমানে অনুলোমগতির স্বরস্থাপনা পাইতেছি এবং ব্যবহার করিতেছি সেইজন্য আমরা প্রথমেই পাইব স্বরিত, তাহার পরে অনুদাত্ত এবং সকলের পরে উদাত্ত। ইহাই যুক্তিযুক্ত। উদাত্তাদি স্বরের আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন মনীষীদের মতামতও দেওয়া হইয়াছে। নারদীয় শিক্ষা, নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি পুস্তক হইতে আমরা উদাত্তাদি স্বর তিনটির নাম জানিয়াছি, কিন্তু বর্ত্তমানের স্বরনামগুলির মধ্য হইতে কোন্ তিনটি স্বরকে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত বলা হইবে এবং কি কারণে বলা হইবে তাহা তাঁহারা কেহই বোধ করি বলেন নাই এবং আমরাও সঠিক জানিতে পারি নাই। বেদে উক্ত "উচ্চৈরুচ্চারণাদুদাত্ত, নীচৈরনুদাত্ত, সমাহারঃ স্বরিতঃ"। পাণিনি বলিয়াছেন, উদাত্তাদি স্বর ও বর্ণের ধর্ম্ম। পারিজাত বলিয়াছেন, ২ শ্রুতি বিশিষ্ট অর্থাৎ 'গ' ও 'ন'কে উদাত্ত, ৩ শ্রুতি বিশিষ্ট স্বর অর্থাৎ 'র' ও 'ধ'কে অনুদাত্ত এবং ৪ শ্রুতি বিশিষ্ট স্বরকে স্বরিত। কেহ কেহ আবার ইহাদের গ্রাম বলিয়াছেন। সংগীতরত্নাকর, যাহাকে প্রাচীন পুস্তক এবং প্রামাণ্য পুস্তকরূপে মনে করা হয় তাহা ভারতীয় এবং পারসিক মতের সমন্বয়ে রচিত মনে করিতে পারি এবং ঐ পুস্তকেই লিখিত হইয়াছে 'স', 'ম' ও 'প' এই তিনটি স্বরই উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত। তৎপরবর্ত্তী অধিকাংশ পুস্তকপ্রণেতারও রত্নাকর মত অনুসরণ করিয়া 'স' 'ম' ও 'প' এই তিন স্বরকেই উদাত্তাদি আখ্যা দিয়াছেন। কোনও কোনও পুস্তক রচয়িতা 'স' 'গ' ও 'প' এই তিন স্বরকে উদাত্তাদি বলিয়াছেন। কিন্তু কি কারণে এবং কোন্ কোন্ গুণাবলীর সমাবেশে উদাত্তাদি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে বা হইবে তাহা তাঁহারা বলেন নাই। সেকারণ মনে হয় যে, যখন এই তিনটি স্বরের নাম উদাত্তাদি হিসাবে কেহ বলেন নাই তখন ঐ স্বরসংজ্ঞা এই স্বরগুলিতে

আরোপ করিলে ক্ষতি কি? বরং নূতন একটা কিছু করা বা বলা ত যাইতেছে। তাঁহারা মনে করিয়াছেন যে, আমরাই যখন উদাত্তাদি স্বরসমূহ, মার্গরীতির গীতপদ্ধতি জানিতে পারি নাই পরবর্ত্তী সময়ের জনসমাজের পক্ষেও তাহা নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা অনেকেই অনেক দুর্ব্বোধ্য শব্দসকলের প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে দৃঢ়প্রযত্ন না হইয়া যথেচ্ছা অর্থ করিয়া সংগীতশাস্ত্রানুসন্ধানের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। না সংগীতরত্নাকর, না অন্যান্য পুস্তকপ্রণেতারা, কেহই উদাত্তাদি স্বরসম্বন্ধের (কোনও রূপে ধার্য্য বা স্থিরীকৃত স্বর-সমূহের) কারণাদি নির্দ্দেশ করেন নাই।

আমার মতে কেন রত্নাকর কথিত 'স' 'ম' ও 'প'কে উদাত্তাদি আখ্যা দেওয়া যাইবে না তাহার ব্যাখ্যা করিতেছি। যে তিন স্বরের সাহায্যে ভারতীয় সংগীতে ব্যবহৃত সমস্ত প্রধান প্রধান অলংকারগুলির প্রয়োগরীতি তথা বিচার করা সম্ভব হইয়াছে এবং যাহাদের সাহায্যে রাগরাগিণীর পৃথক করিবার উপায় পাওয়া গিয়াছে সেই তিনটি স্বরই বেদোক্ত উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত নামের মর্য্যাদার যোগ্য অধিকারী। রত্নাকর স্থিরীকৃত 'স' 'ম' ও 'প' এই তিন স্বরের উক্ত গুণাবলীর অভাবহেতু উদাত্তাদি স্বরের মর্য্যাদা পাওয়ার কোনই হেতু নাই। বলা হইয়াছে বিলোমগতিতে উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত বলা হইত এবং বর্ত্তমানে অনুলোম গতিতে স্বরিত, অনুদাত্ত এবং উদাত্ত বলাই যুক্তিযুক্ত। এইরূপে 'স' স্বরকে স্বরিত, 'গ' স্বরকে অনুদাত্ত এবং 'প' স্বরকে উদাত্ত বলা যাইবে। আমরা গাণিতিক হিসাবে জানিয়াছি যে, 'স' স্বরের সহিত অন্যান্য ছয়টি স্বরের কিছু-কিছু মিল আছে বা থাকিবেই। 'গ' ও 'প' স্বরের সহিত 'স' স্বরের মিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ৪ : ৫ : ৬ এই সহজ অনুপাতে আমরা এই তিনটি স্বরই পাইয়াছি।

কম্পনসংখ্যার উদাহরণে আমরা জানিয়াছি যে, কম্পন যত বেশী দ্রুত হইয়াছে স্বরও তত বেশী তীব্র হইয়াছে। 'স' স্বরের কম্পন অপেক্ষা 'গ' স্বরের কম্পন অধিক হওয়ায় 'স' অপেক্ষা 'গ' অধিক তীব্র এবং 'স' ও 'গ' স্বরের কম্পন অপেক্ষা 'প' স্বরের কম্পন অধিক হওয়ায় 'স' ও 'গ' স্বর অপেক্ষা 'প' স্বর তীব্র। আমরা বিলোমগতিতে স্বরস্থাপনায় একই প্রকৃতির স্বররূপ পাইয়াছি। সেই কারণেই 'স' স্বরিত, 'গ' অনুদাত্ত এবং 'প' উদাত্ত আখ্যা পাইবে। এখন বেদোক্ত শ্লোকের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই আমার মতের যৌক্তিকতা পাওয়া যাইবে। আরও বলা যায় যে, যে ষড়জ হইতে ছয়টি স্বরের উৎপত্তি, সেই ষড়জ স্বরেই স্বর কয়টির নিষ্পত্তি। এই উদাত্তাদি স্বরের আলোচনা অর্থাৎ বিলোমগতির স্বর স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

আমরা কম্পন, শ্রুতি এবং মেরুর সাহায্যে মধ্যম স্বরটির প্রকৃত রূপ জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। কারণস্বরূপ বলা যায় যে, যে স্বরকে স্বয়ম্ভূঃ বলিয়াছেন সংগীতরত্নাকর, যে মধ্যম স্বরের প্রাধান্য দিয়া বেণোর্মধ্যম প্রথম সঃ বলা হইয়াছে প্রাচীন সংগীত-শাস্ত্রের সেই স্বরটিকে জানার ইচ্ছা স্বাভাবিক। বলা হইয়াছে বেণুর প্রথম স্বরের কোন উল্লেখ না পাওয়ায়, সেই যুগের কিংবা বর্ত্তমানের অন্যান্য স্বরগুলি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্থিরীকৃত করার কোনও যুক্তি না পাইবার হেতুতে আমরা নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই বা পারিব না। আরও বলা হইয়াছে যে, নাদের কম্পন বা আন্দোলন সংখ্যার কোনও উল্লেখ না পাওয়ায় আমরা শুধু মধ্যম কেন কোনও স্বরই ধার্য্য বা নির্ম্মাণ করিতে পারি না। ইহার ফলে প্রাচীনের "ষট্ জায়ন্তে যস্মাৎ" এই বাক্যের প্রকৃত মর্ম্মও উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। এখন এই স্বরের বিভিন্ন প্রকার আলোচনার দ্বারা আমরা ইহা স্বয়ম্ভূঃ কিনা তাহাই বুঝিতে পারিব

কম্পনসংখ্যার বিচারে আমরা উদারা গ্রামের 'ম'ও'ধ' এবং মুদারা গ্রামের 'স', এই তিনটি স্বরের অনুপাত পাইয়াছি ৪ : ৫ : ৬। এই সহজ মিলের বা সম্বন্ধের বিচারে 'ম' স্বরটিকে আমরা প্রকৃত স্বররূপেই পাইতেছি। পারিজাতমতে ষড়জ গ্রামের 'ম' স্বরটির শ্রুতি হইতে আমরা বর্ত্তমানের 'গ' স্বরটি পাই এবং প স্বরের শ্রুতি হইতে আমরা 'হ্ম' স্বর পাইতেছি। বিলোমগতিতে এই শ্রুতিস্থান নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই প্রকার শ্রুতিস্থাপনার রীতি রত্নাকরেও পাওয়া যায়। উদাহরণ শ্রুতি (১২) হইতে জানা যাইবে।

সংগীতরত্নাকরবর্ণিত মধ্যম গ্রামের স্বরালোচনায় বিলোম-গতিতে শ্রুতি স্থাপনায় আমরা নিজ শ্রুতি অধিকৃত 'ম' স্বরের মৃদুরূপ পাই, অর্থাৎ 'ম' স্বর 'গ' সৃষ্টি করিতেছে যাহা উদাহরণ শ্রুতি (৪) হইতে জানা যাইবে। এই যদি মধ্যম গ্রামের 'ম' স্বরের প্রকৃত রূপ হয় তবে আমরা নিশ্চয়ই মনে করিতে পারি যে, মধ্যম গ্রাম প্রচলিত যুগে প্রকৃত স্বর ব্যতিরেকে অন্য কোনও স্বরস্থানের অবস্থানের কথা সেই যুগের মনীষীদের মনে জাগে নাই। এই সম্বন্ধে আমার আরও কিছু চিন্তা হয়, যথা—

(১) শার্ঙ্গদেব যিনি রত্নাকর প্রণেতা হয় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদের মতের সম্যক অর্থ করিতে পারেন নাই নতুবা আমাদের বর্ত্তমান মনীষীরা একই কারণে রত্নাকরকে সম্যক বুঝিতে পারেন নাই।

(২) আমরা জানিয়াছি দত্তিল, যাহাকে অনেকে দন্তিল বলেন, তিনি এবং নন্দিকেশ্বর উভয়েই মূর্চ্ছনার সাহায্যে ১২টি স্বর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যদি তাহাই ইতিহাস হয় তবে তৎপরবর্ত্তী যুগের পুস্তক রচয়িতা কিরূপে এই প্রকার স্বরস্থান নির্ম্মাণ করিতে পারেন ? এই কারণেই মনে হয় রত্নাকর-প্রমুখ পুস্তক প্রণেতাগণ

হয়ত সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। ইহা পরে জানা যাইবে।

বর্ত্তমানের 'স' স্বর যদি 'ম' স্বরের রূপ গ্রহণ করে অর্থাৎ শ্রুতির সংখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং অনুলোমগতিতে শ্রুতি স্থাপনা করা হয় তখন আমরা 'ম' স্বর হইতে 'ম' স্বরের তীব্র রূপ অর্থাৎ 'হ্ম' পাইব। ষড়জ গ্রামের বিলোমগতিতে শ্রুতি স্থাপনা করিয়া বিকৃত স্বরস্থান নির্ম্মাণকালেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার অর্থাৎ 'ম' স্বরের শ্রুতি হইতে 'গ' স্বর পাইব এবং অনুলোম প্রথায় শ্রুতি স্থাপনা করিলে আমরা 'ম' স্বরের শ্রুতি হইতে 'হ্ম' স্বরই পাইতেছি।

বিলোমগতিতে শ্রুতিস্থাপনায় স্বরনির্ম্মাণকালে আমরা মধ্যম গ্রামের 'ম' স্বর কিংবা ষড়জ গ্রামের 'ম' স্বর যাহারই নিয়মানুগ বিচার করিব তাহার সম্বন্ধেই আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যতিক্রম-গুলি পাইব। শার্ঙ্গদেবের 'ম' স্বরকে স্বয়ম্ভূঃ বলার তাৎপর্য্য, আমরা নিশ্চয়ই, 'হ্ম' স্বর সম্বন্ধে মনে করিতে পারি না। বিলোম-গতিতে শ্রুতি স্থাপনা করিলে তাহা হইতে সৃষ্ট স্বর 'ম' স্বরাপেক্ষা মৃদুই হইবে। আমি পূর্ব্বে যে দুইটি কারণ আলোচনা করিয়াছি এই ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই মনে করিতে পারি। আরও মনে হয় তৎসাময়িক মনীষীদের মনে হয়ত বিকৃত স্বরস্থান সম্বন্ধে চিন্তা হয় নাই, না হয় তাঁহারা শ্রুতি স্থাপনার রীতি বুঝিতে পারেন নাই। 'ম' স্বরের সার্থকতা কেবলমাত্র সপ্তকের মধ্যস্থিত স্বর হিসাবে। এই মধ্যস্থানে অবস্থান হেতুই কি এই স্বর স্বয়ম্ভূঃ? অর্থাৎ যাহা আপনি সৃষ্ট এই আখ্যা পাইয়াছে। তাহা বলা কঠিন। কিন্তু আমরা জানিয়াছি, নাদ হইতে শ্রুতি, শ্রুতি হইতে স্বর এবং মধ্যমও একটি স্বরবিশেষ বলিয়া কথিত। কি প্রকারে মনে করিব 'ম' স্বর আপনি সৃষ্ট? বর্ত্তমান যুগে আমরা কম্পনসংখ্যার দ্বারা স্বরনির্ম্মাণের ইতিহাস জানিয়াছি। বস্তুর কম্পন হইতে

ধ্বনি, তাহা হইতে স্বর এবং 'ম'-ও একটি স্বর বলিয়া কথিত এবং স্বয়ম্ভূঃ আখ্যা পাওয়ার যোগ্য নহে। এই 'ম' স্বর, স্বরমধ্যবর্ত্তী স্বর হওয়ায়, নানা ক্ষেত্রে অর্থাৎ অলংকারসৃষ্টির ক্ষেত্রে নানারূপ জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে এবং মনে হয় মনীষীরা ঐ সব জটিল মীমাংসার সমাধানে অপারগ হইয়া স্বয়ম্ভূঃ বলিয়াছেন।

বর্ত্তমানে কি প্রকারে স্বরস্থান নির্ম্মাণ করা হয় এবং কোন্ কোন্ স্থানে স্বরস্থান পাওয়া যায় তাহা শ্রুতির আলোচনায় বিশেষ-রূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। আমরা সমস্ত বিকৃত স্বরগুলিকে মৃদু এবং তীব্র আখ্যা না দিয়া যদি সমস্তই তীব্র বলি তবে কি প্রকার স্বর পাইব তাহার আলোচনা করিতেছি। এখন তীব্রতাজ্ঞাপক

∧

চিহ্ন হিসাবে ∧ (নিশান) এই প্রকার চিহ্ন দিতেছি। সস,

∧ ∧ ∧ ∧

রর, গ, মম, পপ, ধধ, এবং ন। এখন আমরা 'গ' ও 'ন' স্বর দুইটিকে প্রকৃতরূপে পাইলাম এবং এই দুইটি অচল স্বর। পুনরায় সমস্ত স্বরগুলিকে মৃদু আখ্যা দিয়া আমরা স, ঋ, র, জ্ঞ, গ, ম, প-মৃদু প, দ, ধ, ণ, ন স্বর রূপ পাই। আমরা তীব্র নামীয় প্রথার অন্তর বিচারে ১ম, ৪র্থ ও ৫ম বৃহৎ, ২য় ও ৬ষ্ঠ মধ্য, এবং ৩য় ও ৭ম পাই ক্ষুদ্র অন্তর রূপে। মৃদু নামীয় প্রথায় স্বরনির্ম্মাণকালেও একই প্রকার অন্তরবিচার পাইতেছি। পার্থক্য মাত্র স্বরনাম-গুলির উচ্চারণকালে। ১ম প্রথায় স্বরস্থাননির্ম্মাণে 'গ' ও 'ন' স্বর দুইটির বিকৃত রূপ পাওয়া যায় নাই এবং ২য় প্রথায় 'স' ও 'ম' স্বর দুইটির বিকৃত রূপ পাওয়া যায় নাই। ধারাবাহিকতা মানিলে বর্ত্তমানের স্বরস্থানে 'স' ও 'ম' অচল স্বর। প্রত্যেক স্বরের নিম্নেই অবস্থিত মৃদু স্বরগুলিকেই বিকৃত স্বর বলা হইতেছে। ব্যতিক্রম মাত্র 'ম' স্বরের ক্ষেত্রে। এই আলোচনায়ও মধ্যমকে স্বয়ম্ভূঃ বলার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া যাইতেছে না, যেহেতু 'প' স্বরই

বর্ত্তমানের অচল স্বর এবং ৪ ঃ ৫ ঃ ৬ এই সহজ অনুপাতের নিজ সপ্তকের প্রকৃত স্বর।

বাদী সমবাদীর আলোচনায় জানা গিয়াছে যে সঙ্গতি সম্বন্ধেও তীব্র মৃদুর সহিত এবং মৃদু তীব্র স্বরের সহিত সঙ্গতিভাবাপন্ন। বিকৃত স্বরগুলিকে তীব্র আখ্যা দিয়াও সঙ্গতিবিচারে আমরা ব্যতিক্রমই পাইব। এই প্রথাও ধারাবাহিক নহে। এই সমস্ত আলোচনা হইতে মনে হয় যে, যখন সপ্তক রচনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল সেই সময়ে প্রকৃত স্বরের সাহায্যেই তাহা রচিত হইয়াছিল, বিকৃত স্বর স্থাপনার চিন্তা মনীষীদের মনে হয় নাই। প্রকৃত স্বর নির্ম্মাণের পরবর্ত্তী যুগে নন্দিকেশ্বর বিকৃত স্বর যখন স্থাপনা করিলেন তখন তাঁহার স্থান বা শ্রুতির সংখ্যার পরিবর্ত্তন করিবার কোনও রূপ উপায় ছিল না কিংবা পান নাই। এই কারণে অন্যান্য পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণও নিপাতনে সিদ্ধ বা আর্ষ প্রয়োগ করিয়াই এতকাল কাটাইলেন। ইহা মনে করা নিশ্চয়ই অন্যায় নহে। তাঁহারা কেবল 'স' স্বর সম্বন্ধে বলিলেন মীমাংসার জন্য 'স' যদিও অচল স্বর তথাপি পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ নিম্নাভিমুখী শ্রুতি এবং পরবর্ত্তী অর্থাৎ উচ্চাভিমুখী শ্রুতিতে স্বরনিষ্পত্তি করিতে পারিবে। সুবিধামত প্রয়োগ করা বা সঙ্গতি রক্ষার নিমিত্ত ব্যবহার করা যাইবে। এই প্রথা আমরা 'ম' স্বরটির ক্ষেত্রেও পাইতেছি। মধ্যম গ্রামই প্রাচীন গ্রাম। প্রাচীনকালের 'ম' এই গ্রামের ১ম স্বর যদিও ধারাবাহিকতার অভাব এবং ব্যতিক্রম এই স্বরটির ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

আমরা 'ম' স্বরটির সম্বন্ধে যত প্রকার আলোচনা এযাবৎ করিয়াছি তাহার দ্বারা 'ম' স্বরকে স্বয়ম্ভূঃ বলার মত কোনও যুক্তি এতাবৎ পাই নাই। প্রাচীনকালের ব্যক্তিগণ কেন এই স্বরকে স্বয়ম্ভূঃ বলিয়াছেন এবং তাহার প্রকৃত কোনও যুক্তি আছে কিনা, এই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তিহেতু আমরা প্রাচীন প্রথায় বিচার করিলে কি

প্রকার মীমাংসা করিতে পারি তাহাই আলোচনা করিতেছি। প্রাচীন যুগে আমরা মধ্যম গ্রাম, গান্ধার গ্রাম ও ষড়্জ গ্রাম নামে তিন গ্রাম পাইয়াছি। বর্ত্তমানে মাত্র ষড়্জ গ্রামই প্রচলিত। প্রাচীনকালে প্রকৃত স্বরদ্বারাই সপ্তক বা মেরু গঠিত হইয়াছিল। আমরা কেবল মাত্র প্রকৃত স্বর সাহায্যে বৈদিক রীতির গীত-পদ্ধতির জন্য সামিক জাতিকে ধার্য্য বা নিরূপিত না করিয়া যদি স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব এবং সম্পূর্ণ জাতির স্বরসমূহের দ্বারা প্রকৃত স্বরের মাধ্যমে রাগরাগিণী ইত্যাদির রূপ মার্গ প্রথায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি তখন আমরা ২৭,৮৩৬টি রাগ এবং রাগিণী পাই এবং তৎকালীন দেশী প্রথা অনুযায়ী উপরোক্ত ৪টি জাতি হইতে অনুরূপ ভাবেই ২৭,৮৩৬টি রাগরাগিণী পাইব। অবশ্য তৎসময়ে তাঁহারা এরূপ চিন্তা করেন নাই, কেননা আমরা বহু পরে রচিত রত্নাকর হইতে মাত্র ১৭৮টি মার্গ সমেত ২৬৪টি রাগসংখ্যা পাই। হয়ত রত্নাকর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে আরও রাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকিবেন। নিশ্চয়ই আমরা মনে করিতে পারি যে, হয়ত রত্নাকর এই সব রাগিণী বা রাগের তথ্য জানিতে পারেন নাই। আমরা যখন এতগুলি রাগরাগিণী, দেশী এবং মার্গপ্রথায়, কেবলমাত্র প্রকৃত স্বর-সাহায্যে পাইতেছি, তখন নিশ্চয়ই মনে করিতে পারি যে, তাঁহাদের বিকৃত স্বরের কোনও রূপ চিন্তার প্রয়োজন না হওয়াই স্বাভাবিক। বর্ত্তমানে আমরা যখন বিকৃত স্বরগুলি পাইয়াছি তখন তাহা হইতে 'ম' স্বরকে স্বয়ম্ভূঃ বলার অন্য কোনও যুক্তি পাইতে পারি কিনা তাহা দেখা যাউক।

যে বিশাল সাংগীতিক সংস্কৃতি প্রাচীন যুগের মনীষীগণ কল্পনার দ্বারা ধারাবাহিক রীতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশও এযাবৎ বুঝিতে পারা যায় নাই নিশ্চয়ই কোনও একটি যুক্তিদ্বারা তাহার মীমাংসা করা যাইবে। যত প্রকারে মীমাংসা

করা যাইতে পারে এবং তাহার জন্য যতখানি সংযম এবং শিক্ষা দরকার তাহা যদি আমরা আয়ত্ত করিতে পারিয়া থাকি তবে আমরাও নিশ্চয়ই কোনও একটি যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা করিতে পারিব। এখন আমরা প্রাচীন যুগের মেরুর সাহায্যে বিচার করিয়া কোনও রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি কিনা তাহাই দেখা যাউক।

মেরু ধার্য্য করিয়া প্রাচীনকালের মধ্যম, গান্ধার এবং বর্ত্তমানের ষড়্জ গ্রামের স্বরবিচারে আমরা কিরূপে সঙ্গতি পাইব তাহাই বলা যাইতেছে। মেরুস্বর অর্থে ১ম এবং প্রধান স্বর। বর্ত্তমানে আমরা 'স' স্বরকে ষড়্জ গ্রামের মেরু বলিতে পারি। আমরা বর্ত্তমানে ১ম স্বর ও ৫ম স্বরকে সর্ব্বদাই প্রকৃত স্বররূপে পাইতেছি। অনুরূপভাবে গান্ধার এবং মধ্যম গ্রামের ১ম ও ৫ম স্বরকেও আমরা প্রকৃত স্বর হিসাবেই গ্রহণ করিব। তৎকালে যদিও কোনও গ্রামের অর্থাৎ মধ্যম এবং গান্ধার গ্রামের স্বরের কোনও বিকৃত রূপ ছিল কিনা তাহা জানা নাই তথাপি যুক্তি দিয়া বিচার করিলে বিকৃত স্বর থাকা উচিত মনে করি। যাহাই হউক ঐ যুগের প্রকৃত স্বর সম্বন্ধে আমরা যাহা পাই তাহার সাহায্যেই আমাদের ধারাবাহিক রীতিকে রক্ষা করিতে পারি কিনা তাহা জানা প্রয়োজন।

অনুলোমগতিতে আমরা মধ্যম গ্রামের ১ম স্বর 'ম' এবং ৫ম স্বর 'স'-কে সর্ব্বদা অবিকৃত মনে করিব। গান্ধার গ্রামের ১ম স্বর 'গ' এবং ৫ম স্বর 'ন'-কেও সর্ব্বদা অবিকৃত মনে করিব। এখন মধ্যম গ্রামের ১ম ও ৫ম ভাবাপন্ন কোন্ কোন্ স্বরসঙ্গতি পাইতে পারি তাহার আলোচনা করিতেছি। 'ম', 'প', 'ধ', মধ্যম গ্রামের এই তিনটি পূর্ব্বাঙ্গ স্বর ধারাবাহিকরূপে একই গ্রামের উত্তরাঙ্গ তিনটি স্বর 'স', 'র', 'গ' পরস্পর যুক্ত হইয়া ১ম ও ৫ম

ভাবের সঙ্গতি সৃষ্টি করিতেছে। এই সঙ্গতিগুলি মস, পর এবং ধগ। এখন মধ্যম গ্রামের ৪র্থ স্বরটি 'ন' স্বর। এই 'ন' স্বরের অবস্থান আমাদের ষড়জ গ্রামের 'ম' স্বরস্থানের ন্যায়। 'ন' স্বরটি সপ্তকের মধ্যবর্ত্তী স্বর। ধারাবাহিক রীতিতে বিচারকালে উভয় অঙ্গের স্বরগুলির সহিত সঙ্গতিভাবাপন্ন হওয়া উচিত। 'ন' স্বরকে পূর্ব্বাঙ্গ স্বর হিসাবে ধার্য্য করিয়া আমরা মেরুস্থান হইতে গণনায় 'নসরগম' এই প্রকারে 'ম' স্বরকে ৫ম স্বরস্থানে পাই। মধ্যম গ্রামের শেষ স্বর আমরা পাইতেছি 'গ' স্বর। 'ম' স্বরটি উচ্চ সপ্তকের একটি স্বর। 'ন' স্বরকে উত্তরাঙ্গ স্বর হিসাবে ধার্য্য করিয়া আমরা মেরুস্থান হইতে গণনায় 'নধপমগ', এই 'গ' স্বরকে ৫ম স্বরস্থানে পাই। মধ্যম গ্রাম অপেক্ষা নিম্ন সপ্তকের স্বর এই 'গ' স্বরটি না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা ১ম ও ৫ম ভাবাপন্ন সঙ্গতি পাই না। ইহাতেও কোন ধারাবাহিকতার পরিচয় আমরা পাই না। আমরা ১ম ও ৫ম, ২য় ও ৬ষ্ঠ, ৩য় এবং ৭ম স্বরকে সঙ্গতি-সম্পন্ন স্বররূপে পাইয়াছি। একই প্রকৃতিতে আমাদের ৪র্থ স্বরকে ৮ম স্বরের সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন করিতে হয়। ভারতীয় সংগীতে ৭টির অধিক প্রকৃত স্বর নির্ম্মাণ করা যায় না, সেই কারণে ৮ম স্বরের সহিত সঙ্গতি নিয়মানুগ নহে। অবরোহণকালেও গধ, রপ ও সম স্বরগুলিকে পরস্পর ৫ম ভাবাপন্ন স্বরের সহিত সঙ্গতি-সম্পন্ন পাইতেছি। 'ন' স্বরকে তাহার ৫ম স্বরসহ সঙ্গতিযুক্ত করিতে হইলে আমাদের নিম্ন সপ্তকের একটি স্বর গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৮টি স্বরের সপ্তক নির্ম্মাণ না করা পর্য্যন্ত আমরা সঙ্গতি পাইতে পারি না।

এখন গান্ধার গ্রামের বিচারেও আমরা অনুরূপ সঙ্গতি হইতে কিরূপ প্রকার স্বরসঙ্গতি পাই তাহাই বলিতেছি। 'গ' স্বরকে মেরু করিয়া গন, মস, পর, এই তিনটি পূর্ব্বাঙ্গপ্রধান স্বর অর্থাৎ

'গ', 'ম' ও 'প', উত্তরাঙ্গপ্রধান স্বর 'ন', 'স' ও 'র' এই তিনটির সহিত পরস্পর ১ম ও ৫ম ভাবাপন্ন এবং অবরোহেও উত্তরাঙ্গ 'র', 'স' ও 'ন' এই তিনটির সহিত পূর্ব্বাঙ্গের 'প', 'ম' ও 'গ' স্বরগুলিও পরস্পর অনুরূপ সঙ্গতিসম্পন্ন। গান্ধার গ্রামের 'ধ' স্বরটি ৪র্থ স্বর এবং সপ্তকের মধ্যবর্ত্তী স্বর। এই স্বরটির উভয় অঙ্গের স্বরের সহিত সঙ্গতিভাবাপন্ন হওয়া উচিত। 'ধ' স্বরকে মেরু ধার্য্য করিয়া, পূর্ব্বাঙ্গ স্বর হিসাবে, আমরা মেরুস্থান হইতে গণনায় 'ধনসরগ' এই প্রকারে উচ্চ সপ্তকের 'গ' স্বরটির সহিত সঙ্গতিভাবাপন্ন পাইতেছি। পুনরায় 'ধ' স্বরকে উত্তরাঙ্গ স্বর হিসাবে ধার্য্য করিয়া আমরা মেরুস্থান হইতে গণনায় 'ধপমগর' এই প্রকার নিম্ন সপ্তকের 'র' স্বরটির সহিত সঙ্গতিভাবাপন্ন পাইতেছি। এইরূপ সঙ্গতি ধার্য্য করিতে হইলে আমাদের ৮টি স্বরদ্বারা সপ্তক রচনা করিতে হয় যাহা মোটেই অনুমোদনযোগ্য নহে।

ষড়জ গ্রামেও আমরা ৪র্থ স্বরটির সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যতিক্রম পাইব। 'স,র,গ' এই তিনটি পূর্ব্বাঙ্গ স্বরকে উত্তরাঙ্গের 'প,ধ,ন' এই তিনটি স্বরের সহিত পরস্পর সঙ্গতিযুক্ত পাওয়া যাইবে যাহা ১ম ও ৫ম ভাবাপন্ন সঙ্গতি। একই প্রকারে পুনরায় উত্তরাঙ্গ স্বর 'ন, ধ, প', তিনটি স্বর পূর্ব্বাঙ্গ 'গ, র, স' এই তিনটি স্বরের সহিত পরস্পর ১ম ও ৫ম ভাবাপন্ন সঙ্গতিতে যুক্ত। এই সপ্তকের ৪র্থ স্বর 'ম', সপ্তকের মধ্যবর্ত্তী স্বর, উভয় অঙ্গের স্বরের সহিত সঙ্গতিভাবাপন্ন হওয়া উচিত। 'ম' স্বরকে পূর্ব্বাঙ্গপ্রধান স্বর হিসাবে ধার্য্য করিয়া আমরা মেরুস্থান হইতে গণনায় 'মপধনস' এইপ্রকার উচ্চ সপ্তকের 'স' স্বরটির সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন পাই। পুনরায় 'ম' স্বরকে উত্তরাঙ্গ স্বর হিসাবে ধার্য্য করিয়া আমরা মেরু-স্থান হইতে গণনায় 'মগরসন' এই প্রকার নিম্ন সপ্তকের 'ন' স্বরটির সহিত সঙ্গতিভাবাপন্ন পাইতেছি। এই প্রকার সঙ্গতিতে

আমাদের ৮টি স্বরের সপ্তক হওয়া চাই যাহা বর্ত্তমানে নাই এবং ভারতীয় সংগীতে হয় না। যদি বিকৃত স্বরযোগে সপ্তক রচিত হয় তবে নিম্ন সপ্তকের 'ন' স্বরটির পরিবর্ত্তে 'ণ' স্বর হইবে, তখন ১ম ও ৮ম ভাবাপন্ন স্বরের সহিত সঙ্গতি নির্ম্মাণ করিতে হইবে 'ণ' স্বর-সাহায্যে।

তিন গ্রামের অর্থাৎ মধ্যম, গান্ধার এবং ষড়জ গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সাতটি প্রকৃত স্বরের মধ্যস্থিত ৪র্থ স্বরটির সম্বন্ধে ১ম ও ৫ম ভাবাপন্ন স্বরের সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন স্বর আদৌ পাইতেছি না, ইহা ব্যাখ্যা এবং উদাহরণ সহ বলিয়াছি। এই বিভিন্ন গ্রামের ৪র্থ স্বরটি 'ম' বা মধ্যমভাবাপন্ন স্বর। এইরূপ বিভিন্ন প্রকার আলোচনা হইতে মনে হয় রত্নাকর প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতাগণ এই স্বরটির, অন্য স্বরের সহিত সম্বন্ধ নিরূপিত করিতে অপারগ হইয়াই ইহাকে স্বয়ম্ভূঃ বলিয়াছেন। আমার মনে হয় স্বয়ম্ভূঃ অর্থে আপনি সৃষ্ট অর্থ আভিধানিক। ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভূঃর অর্থ হওয়া উচিত "নিপাতনে সিদ্ধ," অর্থাৎ যাহার বিচারকালে ব্যাকরণাদির প্রয়োজন হয় না এবং ধারাবাহিকতা রক্ষারও কোনই প্রয়োজন হয় না।

এই ৪র্থ স্বরটির, যাহার মীমাংসার জন্য এত কৌশল, প্রচেষ্টা এবং যাহার সঙ্গতি ধার্য্য করার কালে এত বৈষম্য, তাহার সঙ্গতি নিরূপণে আমার মতের ব্যাখ্যা করিতেছি। যে কম্পনসংখ্যার অনুপাতে স্বর, যে কম্পনসংখ্যার অনুপাতে ত্রয়ীস্বর নির্ম্মাণ, যে ত্রয়ীস্বর হইতে মাতৃকা এবং যে মাতৃকা হইতে রাগরাগিণীর ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলীর বিচার করিয়াছি সেই মাতৃকা হইতে আমরা ৪র্থ স্বরটির কিরূপ প্রকার সঙ্গতি পাইয়াছি তাহারই ব্যাখ্যায় এই অংশের সমাপ্তি।

মধ্যম গ্রামের ৪র্থ স্বর 'ন'। প্রকৃত স্বর সপ্তক গ্রহণ করিলে আমরা 'ন' স্বরের মাতৃকা পাই না কিন্তু মাতৃকা গঠনের এবং

প্রয়োগের রীতিটি পাই। এখন 'ন' স্বরকে মেরু ধার্য্য করিলে পূর্ব্বাঙ্গস্বররূপে, উত্তরাঙ্গে আমাদের সঙ্গতি পাইতে হইবে। 'ম' স্বরের মেরু বলিতে 'ম, প, ধ, ন, স, র, গ,' এই সাতটি স্বর অনুলোমগতিতে এবং 'ম, গ, র, স, ন, ধ, প,' এই সাতটি স্বর বিলোমগতিতে। আমরা 'ন' স্বরকে মেরু ধার্য্য করিলে অনুলোম-গতিতে 'ন, স, র, গ' স্বরের 'গ' স্বরটিকে 'ন' স্বর হইতে ৪র্থ স্বররূপে পাই এবং বিলোমগতির মধ্যম গ্রামের সাতটি স্বরের অন্তর্গত শেষস্বররূপে পাইতেছি। এই 'নগ' সম্বন্ধ সম সঙ্গতিসম্পন্ন। প্রাচীন যুগের স্বরগঠনপ্রণালী বিলোমগতিতে। 'গ' স্বরকে ১ম স্বর ধার্য্য করিয়া যদি বিলোমগতিতে অবরোহণ করি তবে 'গরসন' যাহা মধ্যম গ্রামের, 'মগরস' তাহা ষড়জ গ্রামের; 'নসরগ' যাহা মধ্যম গ্রামের, 'সরগম' তাহা ষড়জ গ্রামের। ইহারা অনুলোম প্রকার। পুনরায় যদি 'গ' স্বরকে মেরু ধার্য্য করি এবং বর্ত্তমানের ১ম ও ৫ম স্বরযোগে সঙ্গতি স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি তবে অনুলোম-গতিতে 'গমপধনসর' এই মেরুস্বরারোপ হইতে 'গন' হয় সপ ভাবাপন্ন অর্থাৎ ১ম ও ৫ম সঙ্গতিসম্পন্ন। পুনরায় প্রাচীন প্রথায় অর্থাৎ বিলোমগতিতে যদি 'গ' স্বরকে মেরু ধার্য্য করি সে ক্ষেত্রেও আমরা 'গরসন' অর্থাৎ ৪র্থ স্বর পাই 'ন' স্বরকে এবং এই 'ন' স্বর হইতেছে 'ম' মেরুর ৫ম স্বর যাহা বর্ত্তমানের সপ ভাবাপন্ন। পুনরায় বিলোমগতিতে 'ন' স্বরকে মেরু করিয়া 'নধপমগরস' স্বরসমাবেশের 'গ' স্বর হয় ৫ম স্বর এবং 'গ' স্বরকে মেরু করিয়া অর্থাৎ 'গমপধন' স্বর-সমাবেশের অবরোহ 'ন' স্বর হয় ৫ম স্বর। এই 'গন' কিংবা 'নগ' ১ম ও ৫ম ভাবাপন্ন।

অনুরূপ প্রকারেই গান্ধার গ্রামের ৪র্থ স্বর 'ধ'। 'গ' মেরু করিয়া অনুলোমগতিতে আমরা 'গমপধনসর' এবং বিলোমগতিতে 'গরসনধপম' স্বরগুলি পাইতেছি। 'ধ' স্বরকে মেরু করিলে অনুলোম

গতিতে ৪র্থ স্বরস্থানে পাই 'র', এই 'র' স্বর ও 'ধ' স্বর সম ভাবাপন্ন। পুনরায় 'র' স্বরকে মেরু করিয়া 'রগমপধ' স্বরসমাবেশে আমরা 'র' ও 'ধ' স্বর দুইটি পাই সপ অর্থাৎ ১ম ও ৫ম ভাবাপন্ন। ভিন্ন প্রকারে অর্থাৎ বিলোমগতিতে 'ধ' স্বরকে মেরু করিয়া 'ধপমগর' স্বর-সমাবেশের 'ধ' ও 'র' ১ম ও ৫ম অর্থাৎ সপ ভাবাপন্ন এবং পুনরায় 'র' স্বরকে মেরু করিয়া বর্ত্তমান স্বরস্থান অনুসারে 'রসনধ' স্বরগুলি হইতে 'র' ও 'ধ' ১ম ও ৪র্থ অর্থাৎ সম ভাবাপন্ন। বিলোমগতি অনুসারে শেযোক্ত বিচার করা হইল।

ষড়্জ গ্রামেরও ৪র্থ স্বর 'ম'। 'ম' স্বরকে মেরু ধার্য্য করিয়া আমরা 'মগরস' পাই। এই 'ম' ও 'স' ১ম ও ৪র্থ সঙ্গতিসম্পন্ন পাই বিলোমগতিতে। অনুলোমগতিতে 'স'কে মেরু ধার্য্য করিয়া আমরা 'সরগম' পাই। এই 'স' ও 'ম' ১ম ও ৪র্থ সঙ্গতিসম্পন্ন। উভয় প্রকার রীতিই সম ভাবাপন্ন। অনুরূপভাবে অনুলোমগতিতে 'ম' স্বরকে মেরু ধার্য্য করিয়া 'মপধনস' এই সঙ্গতি সপ অর্থাৎ ৫ম ভাবাপন্ন এবং 'স' স্বরকে মেরু ধার্য্য করিয়া 'সনধপম' বিলোমগতিতে সপ অর্থাৎ ৫ম ভাবাপন্ন। এইরূপ প্রকৃত স্বরের বিচারে ৪র্থ স্বর বা 'ম' স্বর পাই ষড়্জ গ্রামে। অনুরূপ ভাবেই আমরা আমাদের ১২টি স্বর দ্বারা রচিত সপ্তকের মধ্য হইতে 'ম' স্বরের বিচার করিতেছি। এই প্রকার মেরুতে 'ম' স্বর ৬ষ্ঠ স্থানাধিকারী। আমাদের বর্ত্তমানে ষড়্জ গ্রামের মেরু "সঋরজ্ঞগমহ্মপদধণন" এই প্রকার। ইহা 'স' স্বরের মেরু। এই মেরুস্থানে আমরা সম সঙ্গতিতে ১ম ও ৬ষ্ঠ এবং সপ সঙ্গতিতে ১ম ও ৮ম স্থান পাইতেছি। বর্ত্তমানে 'ম' স্বরকে মেরু করিলে আমরা অনুলোম-গতিতে 'ণ' স্বর পাইতেছি যাহা সম ভাবাপন্ন, এবং 'ণ' স্বরকে মেরু ধার্য্য করিলে পুনরায় ঐ 'ম' স্বরই হয় ৮ম স্বর অর্থাৎ সপ ভাবাপন্ন। অনুরূপ প্রথায় 'হ্ম' স্বরকে মেরু ধার্য্য করিলে 'ন'

স্বরকে ৬ষ্ঠ স্থানে পাই এবং 'ন' স্বরকে মেরু ধার্য্য করিলে 'ক্ষ' স্বরকেই ৮ম স্থানে পাই। ১মটি সম এবং শেষেরটি সপ ভাবাপন্ন। সপ্তকের স্বরসংখ্যা ১২টি হওয়ায় আমরা আরও ২টি করিয়া সঙ্গতি পাইব। 'ম' স্বরকে মেরু করিয়া ৮ম স্বরের সঙ্গতি করিলে আমরা 'ম' ও 'স' সপ সঙ্গতিতে এবং 'স' স্বরকে মেরু করিলে ৬ষ্ঠ স্থানেই 'ম' স্বরকে পাইব সম সঙ্গতিতে। পুনরায় 'ক্ষ' স্বরকে মেরু ধার্য্য করিলে 'ঋ' স্বরকে পাইব ৮ম স্থানে যাহা সপ সঙ্গতিযুক্ত এবং 'ঋ' স্বরকে মেরু ধার্য্য করিলে ৬ষ্ঠ স্থানেই 'ক্ষ' স্বর পাইব যাহা সম সঙ্গতিপন্ন।

প্রাচীন যুগের মনীষীদের এই মেরুপ্রকৃতি দ্বারা স্বরসঙ্গতির বিচার যথেষ্ট নিয়মানুগ। মাতৃকা গঠনেও এই প্রকার রীতি পাওয়া যাইবে। পরিশেষে এই কথাই বলিতে চাই যে, বর্ত্তমানের প্রচলিত স্বরসমূহের অর্থাৎ বিকৃত স্বরগুলিকে মৃদু বা তীব্র আখ্যা না দিয়া যদি অন্য কোন নাম স্থির করিয়া প্রকৃত স্বররূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি তবে কেবলমাত্র আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতগণের অমর্য্যাদা হইবে। ইহা ব্যতিরেকে স্বরগঠন ও স্বরসম্বন্ধ নিরূপণে কিছুমাত্র অসুবিধা হইবে না। উদাহরণ দ্বারা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিতেছি। প্রাচীন মনীষীগণের উচিত ছিল পরবর্ত্তী সমাজের জন্য এই সহজ পন্থাটি লিপিবদ্ধ করা। তাহা করিলে স্বরসম্বন্ধ এবং সঙ্গতির জন্য এত জটিল তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন হইত না। এই সহজবোধ্য এবং সহজসাধ্য বিষয়টি বিশদরূপে আলোচিত হইতেছে।

'সরগম' প্রভৃতি স্বরনামগুলি ত্যাগ করিয়া যদি আমরা সংখ্যা দ্বারা বর্ত্তমানের ষড়জ গ্রামের প্রকৃত ও বিকৃত স্বরগুলির নামকরণ করি, প্রাচীনযুগের ন্যায়, তবে আমরা ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ এই কয়টি স্বরনাম পাইব। মধ্যম গ্রামের সঙ্গতিতে আমরা ৪র্থ ও ৫ম স্বরের সঙ্গতি পাইয়াছি

যাহা বর্ত্তমানের কথিত সপ্তকের ৬ষ্ঠ এবং ৮ম স্বরের সঙ্গতি। আমরা ৬ষ্ঠ স্বরের সঙ্গতিতে কোন্ কোন্ স্বর পাইব তাহা বলিতেছি। ১ম-৬ষ্ঠ, ২য়-৭ম, ৩য়-৮ম, ৪র্থ-৯ম, ৫ম-১০ম, ৬ষ্ঠ-১১শ, ৭ম-১২শ। এই সঙ্গতিগুলি পাই সম সঙ্গতিতে। এখন ৮ম স্বরের সঙ্গতিতে আমরা কোন্ কোন্ স্বর পাইতেছি—১ম-৮ম, ২য়-৯ম, ৩য়-১০ম, ৪র্থ-১১শ, ৫ম-১২শ এই প্রকার সঙ্গতি সপ ভাবাপন্ন। ইহা হইতেই জানা যাইবে কোন্ কোন্ স্বর কোন্ কোন্ স্বরের সহিত সম এবং সপ ভাবাপন্ন। স্বরের নাম যাহাই হউক ইহাতে নিয়মশৃঙ্খলার কোনও রূপ অভাব হইবে না। বর্ত্তমানের যে ১২টি স্বর দ্বারা সপ্তক গঠিত তাহার দ্বারাই ইহার বিচার করা যাইবে। এখানে বলা বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, যে মনীষী সংখ্যা দ্বারা স্বরনাম ধার্য্য করিয়াছিলেন তিনিই কেবল মাত্র বুঝিয়াছিলেন যে, এইরূপ জটিলতা স্বর-সঙ্গতি বা স্বরনির্ম্মাণকালে ভবিষ্যতে ঘটিবে বা ঘটিতে পারে। যাহাতে কোনও বিশৃঙ্খলা না ঘটে বা জটিলতার সৃষ্টি না হয় স্বর-নির্ম্মাণে বা স্বরসঙ্গতি স্থাপনে, সেইজন্যই তিনি স্বরনাম ধার্য্য না করিয়া স্বরকে সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন-কালের মনীষীগণ কত বড় জ্ঞানী এবং কত গভীর এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন তাহা ধারণা বা কল্পনা করিবার মত জ্ঞানও আমাদের নাই। এই প্রকার বোধ এবং অনুভূতিও হওয়া প্রায় একরূপ অসম্ভব। এই কারণে তাঁহাদের লিখিত মতগুলি আমরা ঠিক মত গ্রহণ করিতে না পারিয়াই এই শাস্ত্রকে ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর করিয়া তুলিতেছি। এখানেই আলোচনা অধ্যায়ের সমাপ্তি।

পরিশিষ্টাধ্যায়

স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব এবং সম্পূর্ণ জাতির সাহায্যে ভারতীয় সংগীতে ব্যবহৃত কত প্রকার আরোহী এবং অবরোহী রচনা করা যায় তাহাই বলিতেছি। প্রাচীন পুস্তক প্রণেতারা প্রায় স্থানেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় বলিয়াছেন আর কোনও কিছু করিবার প্রয়োজন নাই, অথবা যাহা হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট, এইরূপ উপদেশাদি। আমার মনে হয় যে, তাঁহারা নিজের জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য অপরের জ্ঞানের মূল্য দিতে ইচ্ছুক নহেন। এই প্রকার মতকে কোন সময়েই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। এই আরোহী অবরোহীর সমাবেশেও এই প্রকার মতামত হয়ত হইবে কিন্তু তাঁহারা কি নিজেরা এইরূপ আরোহীর, অবরোহীর গুণাবলীর কথা চিন্তা বা কল্পনা করিয়াছেন? কোনদিন কি তাঁহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কেবলমাত্র প্রকৃত স্বরসাহায্যে ৫৫,৬৭২ রাগরাগিণী পাওয়া যাইবে। নিশ্চয়ই না। যদি কেহ কোনও দিনও এইরূপ করিতেন তবে নিশ্চয়ই আমরা তাহা জানিতাম। যাহা হউক, এখন আরোহী ক্রমকে জাতি অনুসারে দিতেছি।

সরগম, সরগপ, সরগধ, সরগন, সরমপ, সরমধ, সরমন, সরপধ, সরপন, সরধন, সগমপ, সগমধ, সগমন, সগপধ, সগপন, সগধন, সমপধ, সমপন, সমধন, সপধন—**২০টি আরোহী ক্রম স্বরান্তর জাতির।**

সরগমপ, সরগমধ, সরগমন, সরগপধ, সরগপন, সরগধন, সরমপধ, সরমপন, সরমধন, সরপধন, সগমপধ, সগমপন, সগমধন, সগপধন, সমপধন—**১৫টি আরোহীক্রম ঔড়ব জাতির।**

সরগপধন, সরমপধন, সরগমপধ, সরগমপন, সরগমধন, সগমপধন—**৬টি আরোহী ক্রম ষাড়ব জাতির।**

সরগমপধন—**ভারতীয় সংগীতে ব্যবহৃত সম্পূর্ণ জাতির আরোহ ক্রম।**

বর্ত্তমানে আমরা, সামিক জাতির স্বরসমাবেশ পাই না, যাহা বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল, কিন্তু স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব এবং সম্পূর্ণ জাতির রাগরাগিণী প্রচলিত থাকায় কেবল মাত্র ঐ জাতির আরোহ ক্রমগুলি দিলাম। এখন, অবরোহ ক্রমগুলিও দিতেছি এবং ইহাদের সাহায্যে কতগুলি রাগরাগিণী পাওয়া যাইবে তাহারও উল্লেখ করিতেছি।

মগরস, পগরস, ধগরস, নগরস, পমরস, ধমরস, নমরস, ধপরস, নধরস, নপরস, পমগস, ধমগস, নমগস, ধপগস, নপগস, নধগস, ধপমস, নপমস, নধমস, নধপস—**২০টি স্বরান্তর জাতির অবরোহী।**

পমগরস, ধমগরস, নমগরস, ধপগরস, নপগরস, নধগরস, ধপমরস, নপমরস, ধপমগস, নপমগস, নধমরস, নধমগস, নধপরস, নধপগস, নধপমস—**১৫টি ঔড়ব জাতির অবরোহী।**

সরগপধন, সরমপধন, সরগমপধ, সরগমপন, সরগমধন, সগমপধন—**৬টি ষাড়ব জাতির অবরোহী।**

নধপমগরস—**সম্পূর্ণ জাতির অবরোহী।** এই আরোহী এবং অবরোহী ক্রমগুলি প্রকৃত স্বরের সাহায্যে রচিত। আমরা এই লিখিত আরোহী এবং অবরোহীর সাহায্যে কতগুলি শুদ্ধ অর্থাৎ মার্গ এবং কতগুলি অন্ত্যজ অর্থাৎ লৌকিক বা দেশী রীতির রাগ রাগিণী পাইব তাহার সংখ্যার উল্লেখ করিতেছি। প্রতিটি আরোহী, অবরোহী হইতে আমরা কতগুলি করিয়া রাগরাগিণী পাইব তাহা আমরা মাতৃকার সাহায্যেই নির্ভুল উপায়ে জানিব।

সরগম-৪৮০, সরগপ-৫৭৬, সরগধ-৫৮৮, সরগন-৫০৪, সরমপ-৪৯৬, সরমধ-৫৮৮, সরমন-৪৭৬, সরপধ-৫৯২, সরপন-৫১৪, সরধন-৫১২, সগমপ-৫৭৬, সগমধ-৬৪৮, সগমন-৫৩৬, সগপধ-৬৫২, সগপন-

৬৫৮, সগধন-৫৮০, সমপধ-৫৮৮, সমধন-৫৪৪, সমপন-৫০০, সপধন-৫৪৪, সরগমপ-৬৬৮, সরগমধ ৭২৪, সরগমন-৬২৬, সরগপধ-৭৫২, সরগপন-৭৪০, সরগধন-৬৬৮, সরমপধ-৭০৮, সরমপন-৬২৪, সরমধন-৬৬৪, সরপধন-৬৯২, সরমপধ-৭৮৪, সগমপন-৭১৬, সগমধন-৬৮৮, সগপধন-৭৭২, সমপধন-৬৮০, সরগপধন-৮৮০, সরমপধন-৮২৮, সরগমপধ-৯৭২, সরগমপন-৮১৬, সরগমধন-৮১৬, সগমপধন-৮৮৮ এবং সরগমপধন-১০০৮।

ভারতীয় সংগীতে ব্যবহৃত স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব, সম্পূর্ণ, স্বরান্তর ঔড়ব, ঔড়ব স্বরান্তর, স্বরান্তর ষাড়ব, ষাড়ব স্বরান্তর, স্বরান্তর সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ স্বরান্তর, ঔড়ব ষাড়ব, ষাড়ব ঔড়ব, ষাড়ব সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ ষাড়ব, ঔড়ব সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ ঔড়ব জাতির ১৭৬৪টি আরোহাবরোহ ক্রম প্রকৃতিগত ভাবেই প্রকৃত স্বরের মাধ্যমেই আমরা পাইব। এই কথিত আরোহাবরোহ ক্রম হইতে মাতৃকার সাহায্যে আমরা শুদ্ধ প্রকৃতির অর্থাৎ বৈদিক যুগের মার্গশ্রেণীর ২৭,৮৩৬টি রাগরাগিণী পাইব এবং অন্ত্যজপ্রকৃতি ভাবাপন্ন অর্থাৎ বৈদিক যুগের লৌকিক তথা দেশী শ্রেণীর ২৭,৮৩৬টি রাগরাগিণী পাইব। আমরা উভয় শ্রেণীর মিলিত রাগরাগিণী ৫৫,৬৭২টি পাইতেছি। কি প্রকার পদ্ধতিতে কথিত সংখ্যক রাগরাগিণীগুলি পাওয়া যাইবে বারান্তরে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিব। এই রাগ-রাগিণীগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির পাওয়া যাইবে, যথা—রাগ, স্ত্রীভাবাপন্ন রাগ, ক্লীব রাগ, রাগিণী, পুং-ভাবাপন্ন রাগিণী, ক্লীব রাগিণী। এই প্রসঙ্গে বলিতে চাই যে, যে সংগীতরত্নাকরকে আমরা একটি প্রামাণ্য সংগীত পুস্তকরূপে মনে করি, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপের মাধ্যমে মাত্র ২৬৪টি রাগসংখ্যা ধার্য্য করা হইয়াছে। তিনি রাগ-রাগিণীর বিভাগ করেন নাই, সকলের নাম 'রাগ' ধার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে কতক রাগ, অন্য রাগ হইতে জনিত নয় এবং কতক

রাগ অন্য রাগ হইতে জনিত। তিনি জনিত রাগগুলিকে 'জন্য' এবং যাহাদের হইতে বা যেই রাগ হইতে অন্য রাগ জনিত তাহাকে 'জনক' আখ্যা দিয়াছেন। তিনি মার্গশ্রেণীর কতগুলি জনক রাগ, জনক রাগ হইতে জনিত "ভাষা রাগ", "ভাষা রাগ" হইতে জনিত "বিভাষা রাগ" এবং "বিভাষা" হইতে জনিত "অন্তরভাষা রাগ" এই চারিপ্রকার বিভাগ করিয়াছেন। তিনি ৫৮টি "জনক রাগ," ৯৬টি "ভাষা রাগ, ২০টি "বিভাষা রাগ", ৪টি "অন্তরভাষা রাগ" এই প্রকারে সর্ব্বসমেত ১৭৮টি রাগ মার্গশ্রেণীভুক্ত করিয়া সংখ্যা ধার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সংগ্রহ ৩৪টি দেশী রাগ এবং তাঁহার সময়ে ৫২টি দেশী রাগ সমন্বয়ে আমরা দেশী রাগের সংখ্যা পাই ৮৬টি। এই প্রকারে তিনি ২৬৪টি রাগসংখ্যা ধার্য্য করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে জানার জন্য গীতিসূত্রসার দ্রষ্টব্য। সংগীত-রত্নাকরে রাগসংখ্যা মাত্র ২৬৪টি পাইয়া নিশ্চয় মনে করিব যে, রাগরাগিণী সৃষ্টির মূলকথা তিনিও জানিতে পারেন নাই এবং ঐ বৃহৎ পুস্তকে, বিভিন্ন পুস্তকাদির মতের আলোচনাই করিয়াছেন। তিনি উক্ত ২৬৪টি রাগেরও সম্যক সর্ব্বপ্রকার উদাহরণ এবং সূত্রও উল্লেখ করিতে অপারগ হইয়া, মনে হয়, পুস্তকে জটিল হইতে জটিলতর বহু অর্থযুক্ত বাক্য সংযোজনায় দুর্বোধ্য করিয়াছেন। যাহা হউক আমরা আমাদের পরবর্ত্তী বিষয়ের আলোচনা সুরু করি।

এখন আমরা মেল বা ঠাট সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। বেঙ্কটমূখীর ঠাট এবং রাগ রচনার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই আলোচনাকালে সমস্ত মতই বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার অর্থাৎ বেঙ্কটমুখীর ৭২ ঠাটে ৪৮৪টি রাগ এবং এই মতে ৫৫,৬৭২টি রাগরাগিণী প্রকৃত স্বরসাহায্যে অর্থাৎ ১টি ঠাটেই যদি পাওয়া যায় তবে ৭২ ঠাটে আরও ৭২ গুণ বেশী রাগরাগিণী পাওয়া

যাইবে। যাহাই পাওয়া যাউক পূর্ব্বাপর আলোচনায় আমরা জানিয়াছি প্রায় প্রত্যেকেই কাহাকেও না কাহাকেও অনুকরণ বা অনুসরণ করিয়াছেন। এক্ষণে ভারতীয় সংগীতে ৭টি প্রকৃত এবং ৫টি বিকৃত স্বরসাহায্যে কতগুলি ঠাট বা মেল হয় তাহার আলোচনা করিতেছি। আমার জ্ঞানমতে এই স্বরসমূহের দ্বারা অর্থাৎ ১২টি স্বর দ্বারা ১০২৪টি মেল বা ঠাট পাওয়া যাইবে। পূর্ব্বোক্ত সংখ্যক স্বরসাহায্যে ইহাপেক্ষা আর ১টিও অধিক ঠাট রচনা করা যাইবে না।

রামামাত্য ২০টি, বিদ্যারণ্য মুনি ১৯টি, বেঙ্কটমুখী ৭২টি এবং পঃ ভাতখণ্ডে ১০টি ঠাট রচনা করিয়া ক্লান্ত এবং ক্ষান্ত হইলেন কেন তাহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ জানি না। বেঙ্কটমুখী যাহাতে তাঁহার প্রাধান্য না খর্ব্ব হয় এইজন্য আর অধিক ঠাট রচনা প্রয়াসকে সংযত করিতে উপদেশও দিয়াছেন। ১৫শ শতাব্দীর পূর্ব্বেই আমরা বিকৃত স্বরসমুহের প্রচলন পাইয়াছি। কিন্তু কেন ধারাবাহিক রূপে ঠাট বা মেল সৃষ্টি হয় নাই তাহা বলিতে পারিলাম না। এক্ষণে আমার কথিত সংখ্যক ঠাট কিরূপে পাইব তাহার উদাহরণ দিতেছি এবং উদাহরণ হইতেই জানা যাইবে যে, পূর্ব্ব রচিত বা প্রাপ্ত ঠাটসংখ্যা নির্ভুল নহে।

আমরা ৭টি প্রকৃত এবং ৫টি বিকৃত স্বরের মিশ্রণ হইতে ১০২৪টি ঠাট পাইতে চাই। আমরা ৫টি বিকৃত স্বর হইতে নিম্নলিখিত স্বর-রচনাগুলি পাইব। ঋ, জ্ঞ, হ্ম, দ, ণ, ঋজ্ঞ, ঋহ্ম, ঋদ, ঋণ, জ্ঞহ্ম, জ্ঞদ, জ্ঞণ, হ্মদ, হ্মণ, দণ, ঋজ্ঞহ্ম, ঋজ্ঞদ, ঋজ্ঞণ, ঋহ্মদ, ঋহ্মণ, ঋদণ, জ্ঞহ্মদ, জ্ঞহ্মণ, জ্ঞদণ, হ্মদণ, ঋজ্ঞহ্মদ, ঋজ্ঞহ্মণ, ঋজ্ঞদণ, ঋহ্মদণ, জ্ঞহ্মদণ, ঋজ্ঞহ্মদণ। আমরা পাঁচটি বিকৃত স্বর সাহায্যে এই ৩১টি স্বরসঙ্গতি রচনা করিলাম।

এখন কিরূপে আমরা ঠাটগুলি পাইব তাহার ব্যাখ্যা করিতেছি, যথা ঃ—

আরোহে ৭টি প্রকৃত এবং অবরোহে ৭টি প্রকৃত স্বর যোগে ১টি।
আরোহে শুদ্ধ স্বর এবং অবরোহে বিকৃত স্বরগুলির যোগে ৩১টি।
আরোহে সব বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সব প্রকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে "ঋ" বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'জ্ঞ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'হ্ম' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'দ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'ণ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে "ঋজ্ঞ" বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে "ঋহ্ম" বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে "ঋদ" বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে "ঋণ" বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'জ্ঞহ্ম' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'জ্ঞদ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'জ্ঞণ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'হ্মদ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'হ্মণ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'দণ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'ঋজ্ঞহ্ম' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'ঋজ্ঞদ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'ঋজ্ঞণ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'ঋহ্মদ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'ঋহ্মণ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'ঋদণ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'জ্ঞহ্মদ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'জ্ঞহ্মণ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।

আরোহে 'জ্ঞদণ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'ক্ষদণ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'ঋজ্ঞক্ষদ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'ঋজ্ঞক্ষণ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'ঋজ্ঞদণ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'ঋক্ষদণ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'জ্ঞক্ষদণ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।
আরোহে 'ঋজ্ঞক্ষদণ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি।

আমার রচিত এই মেল বা ঠাট পদ্ধতির দ্বারা ভারতীয় সংগীতের ৭টি প্রকৃত এবং ৫টি বিকৃত স্বরের সাহায্যে, সমস্তগুলি রাগরাগিণী ইহার অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে। কোনও রূপ ধাপ্পাবাজি বা নিপাতনে সিদ্ধ রীতির অনুকরণ কিংবা ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রের কোনও পুস্তকের অনুকরণ করা হয় নাই। ঠাটসংখ্যা কি প্রকারে পাওয়া গিয়াছে তাহা বলা যাইতেছে। বিকৃত স্বরসংখ্যাক্রম {৩১ × (শুদ্ধ ও বিকৃত ১টি + বিকৃত ও শুদ্ধ ১টি + বিকৃত অবরোহী ৩১) + শুদ্ধ আরোহী এবং অবরোহী ১টি }=৩১ × ৩৩ + ১ = ১০২৪টি। এই প্রকার ঠাট রচনায় খুব পাণ্ডিত্যের পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না, সাধারণ একটু গণিতের সাহায্যেই ইহা পাওয়া গিয়াছে। ঠাটসংখ্যার আলোচনার সমাপ্তিতে বলিতেছি যে, ভারতীয় সংগীতে এই প্রকৃতির স্বরসমষ্টি হইতে এইরূপ সামঞ্জস্যপূর্ণ রীতিতে আর কেহ ১টি অধিক ঠাট ইহাপেক্ষা নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না।

রাগরাগিণীর সংখ্যা নিরূপণ কালে জানা গিয়াছে যে, কেবলমাত্র প্রকৃত স্বরগুলির সাহায্যে আমরা ৫৫,৬৭২টি রাগরাগিণী পাইয়াছি। ইহা হইতে ২৭,৮৩৬টি মার্গ তথা শুদ্ধ প্রকৃতির এবং ২৭,৮৩৬টি দেশী তথা অন্ত্যজ প্রকৃতির। উক্ত ৫৫,৬৭২ সংখ্যক স্বরসমাবেশ-

গুলকে মাতৃকার সাহায্যে কোন্‌টি রাগ, স্ত্রীরাগ, ক্লীব রাগ, রাগিণী, পুং রাগিণী, ক্লীব রাগিণী ইহা ধারাবাহিকভাবে জানা যাইবে। এই সংখ্যার মধ্যে একটিও অশুদ্ধ রাগরাগিণীর স্বর-সমাবেশ পাওয়া যাইবে না। ভারতীয় সংগীত রাগসম্পদে এত পুষ্ট যে, তাহার আর অশুদ্ধ প্রকৃতির রাগরাগিণীর প্রয়োজন নাই।

মাতৃকার সাহায্যে ভারতীয় সংগীতের ব্যবহৃত স্বরগুলির সাহায্যে ১০২৪টি ঠাটে আমরা সর্ব্বসমেত অর্থাৎ উভয় প্রকার জাতিভুক্ত রাগরাগিণীর সংখ্যা ৫,৭০,০৮,১২৮টি পাইব। মার্গ তথা শুদ্ধ প্রকৃতির রাগরাগিণী ইত্যাদির সংখ্যা ২,৮৫,০৪,০৬৪টি। অনুরূপভাবেই দেশী তথা অন্ত্যজ প্রকৃতির রাগরাগিণী ইত্যাদির সংখ্যা ২,৮৫,০৪,০৬৪টি। বারটি স্বরসাহায্যে ইহাপেক্ষা আর একটিও অধিক রাগরাগিণী ভারতীয় সংগীতে কিছুতেই পাওয়া যাইবে না। আমার মতে, যেখানে মার্গ পদ্ধতিতে আমরা ভারতীয় সংগীতে রাগরাগিণীর সংখ্যা ২,৮৫,০৪,০৬৪টি পাইতেছি, সেইখানে আমাদের অন্ত্যজ তথা দেশী প্রকৃতির রাগরাগিণী পরিবেশনের সার্থকতা কিংবা যৌক্তিকতা কিছু আছে কিনা, তাহা বলিতে পারি না। সংগীতের ধারাবাহিকতা যদি রক্ষা করা সম্ভব হয় তবেই সংগীত পরিবেশনের যথার্থ সার্থকতা।

মার্গ সংগীত এবং দেশী সংগীতের আলোচনায় আমরা পূর্ব্বে জানিয়াছি ইহা বৈদিক যুগের সংগীতরীতির শ্রেণীবিশেষ। এখন এই দুই প্রকার শ্রেণীর, অর্থাৎ মার্গ এবং দেশী প্রথার, বিশদ আলোচনা করিতেছি। কোন্ কোন্ গুণাবলীর দ্বারা মার্গ এবং দেশী সংগীতের পার্থক্য নিরূপণ করিব তাহার কোনও সূত্র আজও পর্য্যন্ত আমরা পাই নাই। পাই নাই বলিলে ভুল বলা হয়, কিরূপে এই পার্থক্য পাওয়া যাইবে কিংবা মার্গ সংগীতের ব্যবহৃত স্বরসমূহই বা কিরূপ হইবে বা হইতে পারে তাহার সম্বন্ধীয় সমস্ত

সূত্র বা রীতি তাঁহারা নিঃশেষে গোপন করিয়াছেন। ২য় শতাব্দী হইতে আজ পর্য্যন্ত কেহই সূত্র ও উদাহরণসহ মার্গ হইতে দেশী সংগীতের পার্থক্য করিবার কোন উপায়ই লিপিবদ্ধ করেন নাই। পরিচয় গোপনের কারণেই আমরা মার্গ সংগীত শব্দটি যত্রতত্র ব্যবহার করিয়া তাহার মর্য্যাদা হানি করিতেছি। মার্গ সংগীত সম্বন্ধে কেবল বলা হইয়াছে ব্রহ্মা বেদাদি অন্বেষণ করিয়া যে সংগীতের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা ধারাবাহিকতায় ও নিয়মানু-বর্ত্তিতায় সুশৃঙ্খলাবদ্ধ। সেই যুগেই অর্থাৎ মার্গ সংগীতের যুগেই দেশী সংগীতের প্রচলন আমরা পাইয়াছি। মার্গ সংগীত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ধারাবাহিক নিয়মানুগ সংগীত এবং দেশী সংগীতকে "কামাচারং প্রবর্ত্তিতং" অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিকতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা না করিয়া নিজ নিজ ইচ্ছাবশে সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার নিমিত্ত যে সংগীত পরিবেশিত হইত। তাঁহারা এই শেষোক্ত প্রকৃতিগত সংগীতকে দেশী সংগীত বলিয়াছেন। আমার মনে হয় মার্গ যে যুগে সৃষ্ট, অর্থাৎ সামিক বা সামবেদের যুগে, ঠিক সেই সামবেদের যুগেই তাহা লুপ্ত বা অপ্রচলিত হইয়াছিল। আমার এই যুক্তির সমর্থনে বলিতে চাই যে, যদি মার্গ সংগীত সেই যুগেই অর্থাৎ সৃষ্টির পরই লুপ্ত, অপ্রচলিত কিংবা গোপন করা না হইত, তবে নিশ্চয়ই আমরা ২য়, ৩য় শতাব্দীতে রচিত পুস্তকাদিতে তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগরীতির কিছু না কিছু উল্লেখ পাইতাম। নারদ (২য়—৩য় শ), ভরত (৩য়—৫ম শ) লিখিত পুস্তকসমূহে আমরা সর্ব্ব সময়ে, সর্ব্ব ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য পুস্তকেও মার্গ, যাহাকে গান্ধর্ব্ব সংগীতও বলা হইয়াছে, শব্দটির মাত্র উল্লেখ পাইয়াছি কিন্তু কোন্ কোন্ গুণাবলীর দ্বারা মার্গ তথা গান্ধর্ব্ব সংগীতকে দেশী হইতে পৃথকরূপে প্রকাশ করিতে পারিব তাহার কোনও সূত্র বা নির্দ্দেশ পাই নাই। ইহা হইতে আমরা মনে করিতে পারি যে, মার্গ বা

গান্ধর্ব্ব সংগীত এই নামই তাঁহারা শুধু জানিয়াছেন। তাঁহারাও হয়ত মার্গ সংগীতের গুণাবলীর কোন প্রকার রহস্যের বা সূত্রের সন্ধান বা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। যদি তাঁহারা মার্গ সংগীতের কোন রহস্যের আবিষ্কার করিয়া থাকেন, মনে হয় তাঁহারা পরবর্ত্তী যুগের জনসমাজের নিকট মার্গ সংগীতের একমাত্র মর্ম্মজ্ঞ হিসাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভের আশায় সেই প্রয়োগরহস্য গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। মনে হয় এই দুইটি কিংবা ইহার যে কোনও একটি কারণেই আমরা মার্গ সংগীতের স্বর ও অলঙ্কার প্রয়োগের রহস্য বা রীতি অবগত হইতে পারিতেছি না।

সংগীতশাস্ত্র বলিতে যাহা বুঝায় সংগীত পুস্তক বলিতে ঠিক তাহা বুঝায় না। প্রতিটি পুস্তক রচয়িতা মার্গ সংগীত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু আলোচনা করিয়াছেন দেশী সংগীতেরই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মতঙ্গ তাঁর বৃহদ্দেশীতে, নারদ তাঁর সংগীত-মকরন্দে। শিক্ষাকার নারদ তাঁহার নারদীয় শিক্ষায় এবং নাট্যাচার্য্য ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে কেবল মাত্র মার্গ সংগীতের গুণাবলী সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু স্বরগঠনপ্রণালী সম্বন্ধে উভয়েই নীরব। কি প্রকার ধারাবাহিকতা, কোন্ কোন্ নিয়ম বা শৃঙ্খলা দ্বারা এবং কি প্রকার স্বরসমন্বয়ে মার্গ সংগীতকে প্রকাশ করা যাইবে বা যাইতে পারে তাহা কেহই বলেন নাই। মনে হয় বেদ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে যে সময়, ধৈর্য্য, জ্ঞান, সংযম, শৃঙ্খলা এবং চিন্তার প্রয়োজন হইয়াছিল তৎকালীন জনসমাজের সেই সকল গুণাবলীর অভাব থাকায় স্রষ্টা বা রচয়িতা মার্গ সংগীতের ব্যবহৃত স্বরগুলি এবং প্রয়োগগুলি গোপন করিয়াছিলেন। মার্গ সংগীত অর্থাৎ সাত্ত্বিক বা শুদ্ধ প্রকৃতির এই সংগীতের যথেচ্ছা প্রকাশ বা প্রচারের আশঙ্কায় ইহা গোপন করা হইয়াছিল। এইরূপ রীতি অদ্যাপিও অপ্রচলিত নহে। যোগ্য এবং যোগ্যতর ব্যক্তিকে শিষ্য

বা ছাত্ররূপে না পাইলে আচার্য্যগণ কঠিন কঠিন প্রয়োগসম্পন্ন রাগ-রাগিণী, সকল ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া সংগীতের অমর্য্যাদা করিতে চাহেন নাই। এই কারণেই মনে হয় যে মার্গ সংগীত প্রবর্ত্তক হয়ত মনোমত কিংবা উপযুক্ত সংগীতাভিলাষী ছাত্র বা শিষ্য না পাইবার কারণেই কাহাকেও শিক্ষা দেন নাই। এরূপও হইতে পারে যে কতিপয় ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়া, যাহাতে তাহারা জনসমাজে ঐ রীতির গীতের প্রচার বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যে শুদ্ধ সংগীতের দ্বারা বেদাদি পঠিত, যাহার দ্বারা দেব আরাধনা প্রভৃতি মাঙ্গলিক শুভকর্ম্ম প্রভৃতি করা হইত, স্রষ্টা বা রচয়িতা সেই শুদ্ধ সংগীতের অমর্য্যাদা হইবার আশঙ্কায় প্রয়োগগুলি গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তন্ত্রে পুনঃ পুনঃ লিখিত আছে "গোপয়েৎ কূলবধূবৎ বা মাতৃজারবৎ।" যেই স্থলে বা যেই ক্ষেত্রে সাধনা বা সংযমের অভাবহেতু স্রষ্টার সৃষ্টির অমর্য্যাদা হইতে পারে সেইরূপ স্থলেই গোপন করিবার রীতি ধার্য্য করা হইয়াছে। মনে হয় স্রষ্টা এই কারণেই উদাত্তাদি স্বর তিনটি গোপন করিয়াছেন এবং পরিণামে প্রয়োগগুলিও স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং আমরা এই জন্যই কেবলমাত্র অলঙ্কারগুলির নামের সহিত এবং লক্ষণের সহিত পরিচিত কিন্তু প্রয়োগরীতির সম্বন্ধে কোনরূপ নির্দ্দেশ না পাওয়ায় সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ অসহায়।

সামবেদের উপবেদ গন্ধর্ব্ববেদ, এই সময়েই আমরা সাতটি স্বর পাইয়াছি। পণ্ডিত নন্দিকেশ্বর মূর্চ্ছনার সাহায্যে সাতটি স্বর হইতে বারটি স্বর রচনা করিয়াছেন। এই বারটি স্বরের মধ্য হইতে অর্থাৎ প্রকৃত স্বরগুলির অনুপাতের সাহায্যে 'স', 'গ' ও 'প' এই তিনটি স্বরের সাহায্যে মাতৃকা গঠন করিয়া নিয়মানুগ পদ্ধতিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংযম ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া রাগরাগিণীর প্রভেদ করিবার রীতি, রাগরাগিণীর শ্রেণীবিচার, রাগরাগিণীর

অলঙ্কার যোজনার রীতি, যেমন বাদী, সমবাদী, বিবাদী, অনুবাদী, বর্জ্জিত, জাতি, মূর্চ্ছনা, মীড়, তান, স্থান, রাগ বা রাগিণীর ভাব বা প্রকাশ, যাহা বৈদিক যুগে এবং অধুনা যুগের দশ লক্ষণ নামে কথিত, তাহার ধারাবাহিক প্রয়োগরীতির এবং কৌশলের সূত্রসহ ব্যাখ্যা এবং উদাহরণ দিয়াছি। রাগ বা রাগিণীর সংখ্যা কত, কত প্রকার জাতি ভারতীয় সংগীতের রাগরাগিণীর, তাহারও সংখ্যা মাতৃকার সাহায্যেই পাওয়া গিয়াছে। রাগরাগিণীর ভিন্ন ভিন্ন রূপের পার্থক্যও এই মাতৃকার সাহায্যে নিরূপিত করিয়াছি। শুদ্ধ প্রকৃতিরূপে নিরূপিত এবং কথিত বিচারগুলি মার্গ প্রকৃতির এবং অন্ত্যজপ্রকৃতিরূপে নিরূপিত এবং কথিত বিচারগুলি, দেশী প্রকৃতি ভাবাপন্ন রাগরাগিণীর। যদি শুদ্ধ প্রকৃতি সম্পন্ন রাগরাগিণী-গুলিকে মার্গ এবং অন্ত্যজপ্রকৃতিভাবাপন্ন রাগরাগিণীগুলিকে দেশী আখ্যায় অভিহিত করি, নিশ্চয়ই তাহা অযৌক্তিক হইবে না। এখন বলা যায় যে, ধ্বনি হইতে যে কৌশলে তিনটি স্বর এবং তিনটি হইতে সাতটি, যাহা প্রাচীন তথা বৈদিক যুগের মনীষীগণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমানের বারটি স্বর আমরা যে প্রকারে পাইয়াছি, সেই একইরূপ কৌশলে বারটি হইতে সাতটি এবং সাতটি হইতে তিনটি স্বর আমরা পাইয়াছি। এই প্রাপ্ত তিনটি স্বরসাহায্যে ভারতীয় সংগীতের গোপনীয় সমস্ত তথ্যের আলোচনা করিয়াছি। এই আলোচনা সম্পূর্ণ ধারাবাহিকতার এবং নিয়মশৃঙ্খলার অধীন। এই তিনটি স্বরসৃষ্ট মাতৃকাগুলির সাহায্যে সমস্ত প্রকার প্রচলিত রাগরাগিণী কিংবা অপ্রচলিত রাগরাগিণী যাহাই হউক না কেন, তাহাদের যাবতীয় ত্রুটি সংশোধন করা হইয়াছে। রাগরাগিণীর রূপের এবং রসের স্থায়িত্ব, পরিবেশিত রাগরাগিণীর মধ্যে কতটুকু পাওয়া যাইবে বা যাইতেছে তাহাও এই মাতৃকার সাহায্যেই জানা গিয়াছে।

প্রাচীন শাস্ত্রে গায়কের দোষগুণ, বাগ্‌গেয়কার এবং তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে। সংগীতপারিজাতেও এই বিষয়ের আলোচনা প্রাচীন পুস্তকগুলির মতের অনুসারে করা হইয়াছে। এই স্থলে পরিজাতকারকে অনুসরণ করা হইতেছে।

গীতরচনার শব্দকে 'মাতু' আর গীত স্বরসমূহকে 'ধাতু' বলা যায়। যিনি শব্দ অর্থাৎ বাক্, গেয় অর্থাৎ গীতি রচনা করিতে পারেন তিনিই বাগ্‌গেয়কার।

যিনি কবিত্ব বিষয়ে খ্যাতিসম্পন্ন, রাগাভিজ্ঞ, নির্দ্দোষ, রাগদ্বেষ-বর্জ্জিত, রসার্দ্রহৃদয়, মন্দ্র, মধ্য ও তার স্থানে গমক প্রয়োগে স্বর-সমূহকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিতে সক্ষম তিনিই উত্তম বাগ্‌গেয়কার।

যিনি রাগরচনায় পটু কিন্তু শব্দরচনায় অল্পজ্ঞানসম্পন্ন তাঁহাকে মধ্যম বাগ্‌গেয়কার বলা যায়।

যিনি রমণীয় শব্দ রচনায় কুশলী হইয়াও স্বল্পস্বরজ্ঞানসম্পন্ন তিনিই অধম বাগ্‌গেয়কার।

যিনি মার্গ এবং দেশী সংগীতে বিশেষ পারদর্শী তিনি "গান্ধর্ব্ব" নামে অভিহিত।

যিনি কেবল মাত্র মার্গ সংগীতে পারদর্শী তিনি "স্বরাদি" নামে কথিত।

যিনি কেবল মাত্র দেশী সংগীতে পারদর্শী তিনি "পদাদি" নামে আভিহিত।

গান্ধর্ব্ব জাতির গায়ক উত্তম, স্বরাদি জাতির গায়ক মধ্যম, পদাদি জাতির গায়কই অধম প্রকৃতির।

যিনি যতি এবং গীত বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁহাকেই গায়ক বলা হয়।

যিনি শ্রুতি ও তদীয় জাতি এবং স্বর বিষয়ে অভিজ্ঞ, রসজ্ঞ, জাতি, গান, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ প্রভৃতির বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন, যিনি

লয়জ্ঞানসম্পন্ন, তালজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, প্রবন্ধগান প্রয়োগে দক্ষ বিবিধ আলাপ বিষয়ে বিচক্ষণ, মন্দ্রাদি তিন স্থানেই গমক প্রয়োগে দক্ষ, গায়কদোষশূন্য, মধুর ধ্বনি দ্বারা মোহিতকারী, গীতির নিপুণ প্রয়োগে সক্ষম এবং সতর্ক, গান প্রয়োগকালে ক্লান্ত নহেন, শুদ্ধ ও সালগ গীতিতে অভিজ্ঞ, সর্ব্বদা অভ্যাসপরায়ণ, তিনিই উত্তম শ্রেণীর গায়ক।

যিনি উক্ত গুণসমূহের মধ্যে কতিপয় বিষয়ে অপারগ তিনিই মধ্যম শ্রেণীর গায়ক।

যিনি উক্ত প্রকার গুণাবলীর অধিকাংশই আয়ত্ত করিতে অক্ষম তিনিই অধম শ্রেণীর গায়ক।

গায়কের কোন্ কোন্ গুলি দোষ এবং কোন্ কোন্ গুলি গুণ তাহা নিম্নলিখিত আলোচনায় জানা যাইবে।

যাঁহার কফধাতু প্রধান তাঁহাকে 'ঋদগল', যাঁহার পিত্ত প্রধান তাঁহাকে 'নারাট' এবং যাঁহার বায়ু প্রধান তাঁহাকে 'বোবক' বলে। যাঁহার কফ, বায়ু ও পিত্ত প্রধান, মিশ্র ধাতু, তাঁহাকে মিশ্র গায়ক বলে। ঋদগল গায়কের স্বর মধুর। 'ওদিল্ল' নামে এক প্রকার গায়ক আছে যাহাদের স্বরও মধ্যম প্রকৃতির মধুরতা সম্পন্ন। পিত্তপ্রধান নারাটের স্বর মন্দ্র, মধ্য ও তার তিন স্থানেই সূক্ষ্ম এবং প্রগল্ভ। বোবকের স্বর রুক্ষ, কঠিন ও উচ্চতর। মিশ্রক গায়কের কণ্ঠধ্বনিতে সকল গুণই বিদ্যমান। গুণবাহুল্যহেতু 'মিশ্রক' ধাতুর গায়কই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অধম গায়কের ত্রিশ প্রকার দোষ পাওয়া যায়, যথা—সংদষ্ট, সীৎকৃতি, ভীত বা শঙ্কিত, কম্পিত, করালী, কপিল, কাকী, বিতাল, করভ, উদবড়, ঝোম্বক, তুম্বকী, বক্রী, ফুল্ল-গল্ল, প্রসারী, নিমীলক, হতস্থান, বিরস, অব্যক্ত, মিশ্রক, অনবধানক, স্থানভ্রষ্ট, আনুনাসিক, টাকী, বিমনা, চালক, দোল, একদৃষ্টি, ঊর্দ্ধগায়ী, পাদপ এবং শাবক। এখন ইহাদের লক্ষণগুলি বলা যাইতেছে।

যে গায়ক গীতের বাণীসমূহ চিবাইয়া উচ্চারণ করেন তিনি 'সংদষ্ট' এবং এই প্রকার গানে রাগ ও রসের হানি হয়।

পুনঃ পুনঃ শীষ টানিয়া অর্থাৎ মুখ দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া যিনি গান করেন তিনিই 'সীৎকৃতি'।

ভয় সহকারে যে গায়ক গান করেন তিনি 'ভীত' এবং বিচক্ষণ গায়কের আদেশে যিনি তাড়াতাড়ি গান করেন তিনিই 'শঙ্কিত'।

যিনি গাহিবার সময়ে গাত্র এবং কণ্ঠধ্বনি কম্পিত না করিয়া গাহিতে পারেন না তিনিই 'কম্পিত'।

যে গায়ক মাথা এবং মুখ উচ্চ করিয়া গান করেন তিনিই 'করালী'।

যিনি স্বরকে ন্যূন শ্রুতি কিংবা অধিক শ্রুতিতে যুক্ত করিয়া গান করেন তিনি 'কপিল' বা 'বিকল'।

যিনি কাকের ন্যায় কর্কশ স্বরে গান করেন তিনি 'কাকী'।

যে গায়কের লয়জ্ঞান নাই তিনি 'বিতাল'।

যে গায়ক কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া গান করেন তিনি 'করভ'।

যাঁহার কণ্ঠস্বর ছাগের ন্যায় তিনি 'উদবড়'।

গান করিবার সময় যাঁহার গলার শিরাসমূহ, ললাট এবং মুখের শিরাসমূহ স্ফীত এবং মুখ বিকৃত হয় তিনিই 'ঝোম্বক'।

যিনি লাউয়ের মত মুখ করিয়া গান করেন তিনিই 'তুম্বকী'।

গান করিবার সময় যাঁহার মুখ বিকৃত হয় তিনি 'বক্রী'।

গানের সময় যাঁহার গাল ফুলিয়া ওঠে তিনি 'ফুল্ল-গল্ল'।

যে গায়ক গান করিবার সময় বেশী করিয়া মুখ ব্যাদান করেন তিনি 'প্রসারী'।

চক্ষু বন্ধ করিয়া যিনি গান করেন তিনি 'নিমীলক'।

বর্জ্জ স্বরকে বর্জ্জন না করিয়া যে গায়ক গান করেন তিনি 'হতস্বর' বা হতস্থান।

যে গায়কের গান রক্তিহীন তিনি 'বিরস'।

গীতকালে বর্ণগুলি যাঁহার স্পষ্ট উচ্চারিত নহে তিনি 'অব্যক্ত'।

যে গায়ক পরিবেশিত রাগ, গীতকালে অপর রাগের সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলেন তিনি 'মিশ্রক'।

যিনি গান করিবার সময় স্থায়ী, অন্তরা, আরোহী, অবরোহী, অঙ্গপ্রাধান্য ইত্যাদি রাগলক্ষণ এবং প্রয়োগগুলি সাবধানে প্রয়োগ করিতে পারেন না তিনিই 'অনবধানক'।

যে গায়ক প্রারম্ভিক স্থানে অর্থাৎ যে স্থান হইতে গীত আরম্ভ হয় সেই স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অবস্থান করিতে পারেন না তিনিই 'স্থানভ্রষ্ট'।

যিনি নাকী স্বুরে গান করেন তিনি 'নাকী' বা 'আনুনাসিক' গায়ক।

যিনি আলজিহ্বার নীচ হইতে স্বর বাহির করিয়া গান করেন তিনি 'টাকী।

যিনি অন্যমনস্ক হইয়া গান করেন তিনি 'বিমনা' গায়ক।

যিনি হাত নাড়িয়া অর্থাৎ ছুড়িয়া গান করেন তিনি 'চালক'।

যিনি মাথা দোলাইয়া গান করেন তিনি 'দোল'।

যিনি একটি দিকেই তাকাইয়া গান করেন তিনি 'একদৃষ্টি'।

যিনি ঊর্দ্ধমুখী হইয়া গান করেন তিনি 'ঊর্দ্ধগায়ী'।

যিনি রাগ ও তাল না জানিয়া গান করেন তিনি 'পাদপ'।

যিনি গানের অর্থ না বুঝিয়া গান করেন তিনি 'শাবক'।

গায়কের দোষগুণ এবং বাগ্‌গেয়কার প্রভৃতির লক্ষণ পারিজাতের ৫৯৩ শ্লোক হইতে ৬২৬ শ্লোকের অনুবাদ। ইহা ব্যতিরেকেও আরও কয়েক প্রকার গুণাবলীও গায়ক সম্বন্ধে পাইয়াছি, কিন্তু কোথায় পাইয়াছি তাহা আমার সঠিক মনে নাই। সেইগুলি নীচে উল্লেখ করিতেছি।

যাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বর তিনি 'হৃদ্যাসক্ত'। যাঁহার কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিক ভাবেই রাগরূপ প্রকাশিত হয় তিনি 'সুশারীর'। বিভিন্ন তালাদি বিষয়ে যিনি বিশেষ পারদর্শী তিনি 'তালজয়ী'। যিনি ইচ্ছামত স্থানে কণ্ঠস্বর প্রয়োগ করিতে পারেন তিনি 'সাধ্য-কণ্ঠ'। যাঁহার আলঙ্কারিক প্রয়োগবিধি বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা তিনিই 'বিচক্ষণ'। যিনি অত্যন্ত একাগ্রচিত্তে গান করেন তিনি 'সাবধানী'। গান করিবার সময়ে যাঁহার কোনওরূপ পরিশ্রম বোধ হয় না তিনি 'শ্রমজয়ী'। যিনি সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত হইয়া শাস্ত্রানুযায়ী গান করেন তিনি 'নির্দ্দোষ'।

এই অধ্যায়ের তথা গ্রন্থের উপসংহারে, কয়েকটি বিষয়ের কিছু কিছু পুনরালোচনা করিয়া সমাপ্ত করিতেছি। প্রথমে সংগীত উপযোগী নাদ বা ধ্বনি, ধ্বনি হইতে শ্রুতি, শ্রুতি হইতে স্বর, স্বর হইতে মূর্চ্ছনা, মূর্চ্ছনা হইতে বিকৃত স্বর, বিকৃত ও প্রকৃত স্বরের যোগে সপ্তক, সপ্তকের সমষ্টি হইতে গ্রাম এবং গ্রামের সাহায্যেই পরিপূর্ণ গীতরূপ। এই বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াই উপসংহারের সমাপ্তি।

যে পরমাণু আকাশসৃষ্টির কারণ, তাহার কম্পনেই নাদের উৎপত্তি। নাদের ভেদ দুই প্রকার পাওয়া যায়—আহত এবং অনাহত। আহত নাদ আমাদের দেহের মধ্য হইতে উত্থিত হয়। অনাহত নাদ সাধারণ মানবশ্রুতিগ্রাহ্য নহে। আহত নাদের ভেদ দুই প্রকার—সুকৃতি এবং অকৃতি। সুকৃতি অর্থাৎ বর্ণাত্মক—কথা বলিলে বা অর্থবোধক শব্দ করিলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়। অকৃতি—ধ্বন্যাত্মক, যাহা হইতে কেবল মাত্র ধ্বনি বা স্বর উচ্চারিত হয়, যাহার কোনও প্রকার অর্থবোধ হয় না। অকৃতি ধ্বনির আবার ভেদ দুই প্রকার—কর্কশ এবং সুশ্রাব্য। যাহার কম্পন্-সংখ্যাগুলি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমকালস্থায়ী নহে তাহাই কর্কশ

ধ্বনি এবং যাহার কম্পনগুলি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমকালস্থায়ী তাহাই সুশ্রাব্য ধ্বনি। এই সুশ্রাব্যধ্বনি সংগীতে ব্যবহৃত হয়, সেই জন্যই ইহা সুর নামে অভিহিত। সুর এবং স্বর একই অর্থে সংগীতে ব্যবহৃত হয়। স্বর প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বেই আমরা শ্রুতি পাই। নাদ যেই আন্দোলিত হয়, সেই কম্পন হইতে শ্রুতির উৎপত্তি। নাদের বহু প্রকার রূপ আছে,—উত্থান, পতন, অনুলোম, বিলোম, কম্পন ইত্যাদি। এই কম্পন হইতে শ্রুতি এবং শ্রুতিসমষ্টি হইতে স্বর। ১টি স্বর হইতে আমরা কি প্রকারে ৭টি স্বর পাইয়াছি তাহা বলিয়াছি। ৭টি স্বর হইতে ১২টি স্বর-নির্ম্মাণ কি প্রকারে হইয়াছে তাহাও জানিয়াছি। যখন ৭টি স্বর প্রচলিত ছিল তখন প্রাচীনেরা ৭ স্বরে গ্রাম এবং ২১টি স্বরসাহায্যে তিন গ্রাম রচনা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে আমরা ১২ স্বরে সপ্তক বা গ্রাম এবং তিন গ্রাম ৩৬টি স্বরের সাহায্যে নির্ম্মাণ করিতেছি। সপ্তক বা গ্রামের স্বরসমূহে নানা প্রকার অলঙ্কারাদি যোজনা করিয়া ভারতীয় সংগীতের বহু রাগরাগিণী সৃষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন রাগরাগিণীর এবং অলঙ্কারের বিষয় আমরা যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংগীত সম্বন্ধে আমরা বিভিন্নরূপে সংগীতের রূপ, গুণ ও লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছি। বৈদিক যুগ হইতে অধুনা যুগ পর্য্যন্ত সংগীতের আলোচনা যথাসাধ্য সহজবোধ্য উপায়েই করিয়াছি। এই পুস্তক যদি সম্পূর্ণরূপে ধারাবাহিক রীতিতে পূর্ব্বকথিত ভারতীয় রাগরাগিণীর সম্পূর্ণ উদাহরণ, সূত্র ও ব্যাখ্যা সহ কখনও কাহারও দ্বারা রচনা করা বা সঙ্কলন করা সম্ভব হয় তবে তাহাই হইবে সুনির্দ্দিষ্ট, সুসংবদ্ধ বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের বিস্ময়সৃষ্টিকারী ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির তথা সংগীতের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যদি এই পুস্তকে সামিক জাতি উদ্ভূত রাগরাগিণী সন্নিবেশিত করা যায় তবে রাগরাগিণীর

সংখ্যা কথিত রাগরাগিণীর সংখ্যাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হইত। এই জন্যও বটে এবং তিন স্বর দ্বারা রচিত রাগরাগিণী আর প্রচলিত নহে জানিয়াই সামিক জাতির আরোহাবরোহ হইতে প্রাপ্ত রাগ-রাগিণীর সংখ্যা বা সূত্র নির্দ্দেশ করিলাম না। সামিক জাতির আরোহাবরোহ সাহায্যে বর্ত্তমানেও রাগরাগিণী প্রকাশ করা সম্ভব এবং তাহা শ্রুতিকটু হইবে বা হইতে পারে এরূপ আশঙ্কার কোনই কারণ নাই।

আমরা প্রকৃত স্বরের ঔড়ব, ষাড়ব, সম্পূর্ণ জাতির আরোহী অবরোহী ক্রম হইতে নিম্নলিখিত রাগরাগিণীর সংখ্যা পাইতেছি।

সরগমপ-৪০৪, সরগমধ-৪১৬, সরগমন-৩৮৪, সরগপধ-৪৩২, সরগপন-৪১৬, সরগধন-৪০৪, সরমপধ-৪২৪, সরমপন-৩৮৪, সরমধন-৩৯২, সরপধন-৪০৪, সগমপধ-৪৪৮, সগমপন-৪১২, সগমধন-৪৩৬, সগপধন-৪৩৬, সমপধন-৪১৬, সরগপধন-৪৮০, সরমপধন-৪৫৬, সরগমপধ-৪৭২, সরগমপন-৪৫৬, সরগমধন-৪৪৪, সগমপধন-৪৮৮, সরগমপধন-৫২৮; মোট রাগসংখ্যা ৯৫১২টি।

জানি না শার্ঙ্গদেব কেন তাঁহার ঐ ভারতবিখ্যাত পুস্তকে মাত্র ২৬৪টি মার্গ এবং দেশী প্রথার রাগের পরিচয় দিয়াছেন। বেঙ্কট-মুখীও তাঁহার চতুর্দ্দণ্ডীপ্রকাশিকায় ঔড়ব, ষাড়ব এবং সম্পূর্ণ জাতির আরোহাবরোহের মিশ্রণে ৪৮৪টি রাগসংখ্যা স্থির করিয়াছেন, যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি নিজেই ৭২টি ঠাটের রচয়িতা। {(৭২ × ৪৮৪ − ৪) ÷ ২} = {৩৪৮৪৪ ÷ ২ = ১৭,৪২২। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলেও তিনি ৭২টি ঠাটে মার্গ প্রথায় ১৭,৪২২টি এবং দেশী প্রথায় ১৭,৪২২টি রাগ (রাগিণী বলা তাহাদের প্রথা নয়) সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিতেন।

যদি আমার উপরোক্ত রাগরাগিণীর সংখ্যার সহিত আমারই আবিষ্কৃত ১০২৪টি ঠাটের সমন্বয়ে সংখ্যা ধার্য্য করিতে চাই তবে আমরা {(৯৫১২ × ১০২৪ − ৪) ÷ ২} = ৯৭,৪০,২৮৪টি অর্থাৎ মার্গ

প্রথায় ৪৮,৭০,১৪২টি এবং দেশী প্রথায় ৪৮,৭০,১৪২টি রাগরাগিণী পাইব। ভারতীয় সংগীতে উক্ত তিনটি জাতির সমন্বয়ে আর ১টিও অধিক রাগরাগিণী পাওয়া যাইবে না।

সংগীতরত্নাকর এবং চতুর্দ্দণ্ডীপ্রকাশিকাকে, উত্তর ভারতীয় এবং দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত তথা গায়কগণ প্রামাণ্য পুস্তকরূপে গ্রহণ করিবেন শার্ঙ্গদেব এবং বেঙ্কটমুখী তৎকালে নিশ্চয়ই এই প্রকার চিন্তার অবকাশ পান নাই। তাঁহাদের ধার্য্য বা স্থিরীকৃত রাগসংখ্যা হইতেই আমার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে এবং হইবে।

পরিশেষে বলিতেছি যে, ভারতীয় সংগীতে ব্যবহৃত স্বর-সাহায্যে আমরা মার্গ তথা শুদ্ধ প্রকৃতির ২৭,৮৩৬টি এবং অন্ত্যজ তথা দেশী প্রকৃতিরও ২৭,৮৩৬টি, অর্থাৎ ৫৫,৬৭২টি রাগরাগিণীর, নাম ও লক্ষণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া ১০২৪টি খণ্ডে ভারতীয় সংগীতের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করিতে পারি। ভারতীয় সংগীতে ব্যবহৃত ১২টি স্বরসাহায্যে ৫, ৭০, ০৮, ১২৮টি অপেক্ষা একটিও অধিক রাগ কিংবা রাগিণী রচনা করা যাইবে না। এই ইতিহাস পাঠ করিবার পরে ভারতীয় সংগীতের সমস্ত রাগরাগিণীগুলি পরিপূর্ণরূপে জানা যাইবে। কিরূপে উক্ত রাগরাগিণীকে সুসংযত-ভাবে প্রকাশ করা যাইবে সে সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে।

যদি ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার আকাঙ্ক্ষায় সুধী তথা ছাত্রসমাজ কিছুমাত্রও উপকৃত হইতে পারেন তাহাতেই আমার সুদীর্ঘ সাধনার পরমসিদ্ধি এবং পরম আনন্দ।

নির্ঘণ্ট

সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	১	অপধ্বাস্ত	অপধ্বাস্ত
৯৪	১	সজ্জ, (পদ)	সজ্জপ, (দ)